আমার জীবনকথা

শ্রীগৌরহরি ভট্টাচার্য্য
(ঠাকুরপাড়া, ভট্টপল্লী)

প্রাপ্তিস্থান :
৩৭ সি, কলেজ রো,
কলিকাতা—৯

প্রকাশক :
ডাঃ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম. ডি
৩৭ সি কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

আশ্বিন ১৩৬০

প্রিণ্টার :
শ্রীসুধেন্দু বাগচী
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

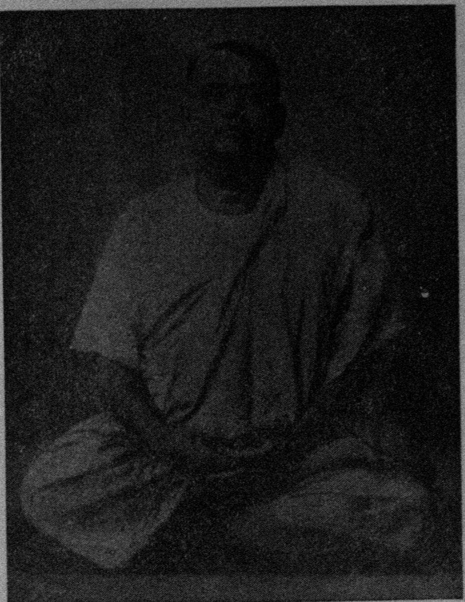
আমার স্নেহময়ী গর্ভধারিণী মা অন্নপূর্ণাদেবী ও পরমপূজ্যা গুরু মা সারদামণি দেবীর উপদেশে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যাঁদের সেবা করেছি সেই আর্ত শরণাপন্নগণকে, সেই রোগীগণকে আর সত্যানুসন্ধিৎসা ও ভগবৎ মুখিতার পরোক্ষ প্রেরণাদাতা—আমার সেই শত্রুবেশী পরম মিত্র—আত্মীয় স্বজনকে এই গ্রন্থ কৃতজ্ঞচিত্তে উৎসর্গ করলাম।

শ্রীগৌরহরি ভট্টাচার্য্য
ভট্টপল্লী ঠাকুরপাড়া

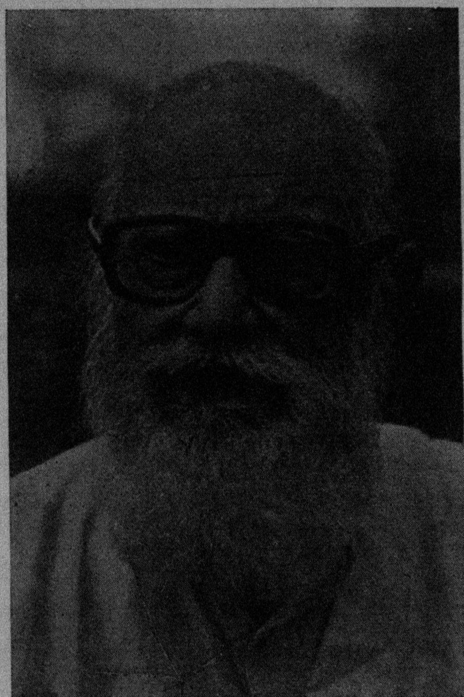
সূচীপত্র



শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী



শ্রদ্ধেয় রাখাল মহারাজ



শ্রীগৌরহরি ভট্টাচার্য্য

সূচনা

জীবন-আলেখ্য তখনই সার্থক হয় যখন জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু থাকে। জীবনী মহৎপ্রাণের আনন্দ-বেদনা, আবেগ-অনুভূতি বাস্তব ঘটনার আবর্তে পরিস্ফুট হয়ে সরস, শিক্ষণীয় ও মঙ্গলপথ-প্রদর্শক হয়। যে জীবন অতি ক্ষুদ্র, প্রাণধারণের কাজেই যার পরিসমাপ্তি, সে জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করে জীবনী রচনা করা চলে না, আর জীবনী-সাহিত্যে তার স্থানও হয় না।

যাঁর জীবনে আত্মবিকাশের একটি সুস্পষ্ট ধারা আছে—আনুষঙ্গিক প্রযত্ন-উদ্যম, দুঃখ-বেদনা, ব্যর্থতা-সাফল্য-সার্থকতার মধ্য দিয়ে মহত্তর সিদ্ধির গৌরব আছে, তাঁরই জীবনী লেখা সমীচীন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মূল্যবান এবং এসবের মধ্যে লোকশিক্ষাপ্রদ অনেক কিছু আছে। নতুবা নিজের সুখ-দুঃখের কথা অন্যকে জানিয়ে লাভ কী? তা কেবল অগৌরবই বহন করে।

পাশ্চাত্য বৈদিক গোষ্ঠী

চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত ভট্টপল্লী আমার পিতৃভূমি। ভাটপাড়া ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির জন্য বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ। আমরা কান্য-কুব্জ হতে আগত ব্রাহ্মণ—বঙ্গে পাশ্চাত্য বৈদিক। বঙ্গে বহিরাগত রাঢ়ী, বারেন্দ্র, দাক্ষিণাত্য ও ভিন্নশ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণের পশ্চাতে সবশেষে পশ্চিম হতে এসেছিলাম বলে আমরা পাশ্চাত্য বৈদিক। ন্যূনাধিক তিনশত বৎসর পূর্বে আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা পদব্রজে বঙ্গদেশে এসে উপনীত হন। বসবাসের সুবিধা দেখে এবং পথশ্রম অপনোদনের সুযোগ পেয়ে তাঁরা প্রথমে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 'কোটালীপাড়া' নামক সমৃদ্ধিশালী গ্রামে অবস্থান করেন। পিতামহের কাছে শুনেছি, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা প্রায় তিন-পুরুষ ধরে কোটালীপাড়াতেই বসতি করেছিলেন। তারপর চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতী ভাটপাড়া গ্রামের জমিদার 'হালদার'-বাবুদের বদান্যতায় ভূমি-সম্পত্তির ব্যবস্থা হওয়ায় পূর্বাগত বশিষ্ঠ-গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক-অধ্যুষিত এই গ্রামে তাঁরা চলে আসেন। কিছুকাল পরে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত ভূস্বামী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় আমাদিগকে প্রভূত ব্রহ্মোত্তর ভূ-সম্পত্তি অর্পণ করেন।

আমরা সামবেদী সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আমাদের কৌলিক বৃত্তি। যজন যাজন ইত্যাদি আমাদের কুলাচারবিরোধী। আমাদের পূর্বপুরুষেরা শাস্ত্রনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ্য আচাব-আচরণ নিষ্ঠার সহিত পালন করতেন। পূর্বেই বলেছি, আমরা তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ আর্যব্রাহ্মণ। আমাদের উন্নততর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ত্যাগপূত মহত্তর জীবনের প্রভাবে বঙ্গদেশের শিক্ষাদীক্ষা ধর্মজীবন শাস্ত্রচর্চা ও সাধনা সমুজ্জ্বল মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। অবশ্য কালক্রমে বঙ্গদেশের প্রাক্তন অবৈদিক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে আমরা বৈদিক জীবনচর্যা পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ রাখতে পারিনি। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রভাব কথঞ্চিৎ আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করেছে। যা হোক, আমাব পিতৃপুরুষেরা ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যানুরাগী, সরল-জীবন, আদর্শবান্, নির্লোভ ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিলাস, বাহ্যাড়ম্বর, দাম্ভ ও স্বার্থপরতাকে তাঁরা অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। তাঁরা নিজের বাটীতে টোল, চতুষ্পাঠী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে প্রণামী না নিয়ে সরকারী সাহায্য মাত্র না পেয়ে দেশী-বিদেশী ছেলেদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। সমাজের মঙ্গলকামনা অন্তরে নিয়েই তাঁবা শিক্ষা বিকিরণ করতেন, পেশাদারী মেজাজ বা ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাঁদের ছিল না। শুনেছি, আমার প্রপিতামহের নিজ ভবনে কাশীনাথ ঠাকুবের একটি চতুষ্পাঠী ছিল। মহাপ্রাণ ও মানবদরদী তাঁরা দুঃস্থ বিপন্ন আর্ত মানুষকে যথাশক্তি সাহায্য করতেন দয়ার্দ্র হৃদয়ে।

পিতৃপিতামহ

পিতামহ রামানুজ বিদ্যার্ণব ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত। তিনি হুগলী মহসীন কলেজে ও তদন্তর্গত উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদে বৃত হয়েছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। পরে হিন্দু-স্কুলের প্রধান শিক্ষক—তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু রসময় মিত্রের উৎসাহে ও চেষ্টায় তিনি হিন্দুস্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদ নিয়ে কলিকাতায় বদলি হয়ে আসেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কিছুটা কবিত্বশক্তিও তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি কতিপয় কবিতা লিখে রেখেও গেছেন। পিতামহদেব বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি গ্রাম্য দলাদলির ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকতেন না। গ্রামের সকলেই তাঁকে সমদর্শিতা ও উদার মনোভাবের জন্য শ্রদ্ধা-সম্মান করতেন ও ভালবাসতেন। পিতামহ ছিলেন ভাটপাড়ার অন্যান্য

শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মতো প্রাচীনপন্থী নৈষ্ঠিকব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন বিশেষভাবে দেশভক্ত, কাজেই জ্ঞাতি ও স্বগ্রামবাসী গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের চেয়েও বিদেশী-দ্রব্য বর্জনে অনেক বেশী আগ্রহী। বিদেশের আমদানি সকল বিষয়েই তাঁর স্বাদেশিকতা উগ্ররূপ ধারণ করেছিল। সকালে ফুল-বাগানটি দেখাশোনা করতে করতে আত্মীয়-স্বজন অপরিচিত সকলকেই প্রয়োজনবোধে বিনামূল্যে তিনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেন। সারল্য, স্নেহশীলতা ও শিক্ষাদানে বিশেষ দক্ষতা ইত্যাদি গুণের জন্য তিনি তাঁর ছাত্রদের পরম শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। ছাত্রেরা তাঁকে পিতার মতো ভক্তি করত। সরল সংযমী জীবন যাপন করে তিনি দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন। রামানুজ বিদ্যার্ণব মহাশয় তাঁর ছাত্রদের কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন তা প্রমাণিত হয় তাঁর পারলৌকিক অনুষ্ঠানের সময়। বাংলার মাননীয় মন্ত্রী কুমার বিজয়কুমার সিংহ রায়, মদনমোহন বর্মন ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাগ্রহে তাঁর উপযুক্ত শ্রাদ্ধের জন্য বড় রকম ব্যয় বহন করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা শ্রাদ্ধ-বাসরে নিজেরা উপস্থিত থেকে মান্যগণ্য আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সুন্দররূপে আদর-আপ্যায়ন সম্পন্ন করে সকলের ভোজন-পর্ব শেষ হলে সন্ধ্যার দিকে গৃহে ফিরেছিলেন।

পৈতৃক ভূসম্পত্তি কিছু উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করায় পিতামহের অবস্থা মোটের উপর স্বচ্ছলই ছিল। চব্বিশ পরগনা জেলার দুয়েকটি গ্রামে তাঁর অন্তত তিন-চারটি নারিকেল-কুল, নোড়, কালোজাম, পেয়ারা, কলা, পেঁপে, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি ফলের বাগান ছিল। নদীয়া জেলার অন্তর্গত হরিণঘাটাতে বিঘাদশেক জমির তিনি মালিক ছিলেন। এ ছাড়া বর্ধমান জেলার গোলডুবিতে পঁচাত্তর বিঘা ও মেদিনীপুর জেলায় তমলুকের রানীচকে ও সুতাহাটায় বেশকিছু জমির স্বত্ব তাঁর ছিল। বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা হতে পৌষমাসে ফসল তোলার সময় প্রজারা নানা রকম উৎকৃষ্ট ধান্য খাজনা হিসাবে আমাদের ভাটপাড়ার বাড়িতে এনে দিত। পিতামহের গোলা ছিল, ঢেঁকিঘর ছিল, গোয়ালে গোরুও তিনি পুষতেন। এজন্য বাড়িতে ধান, চাল ও দুধের প্রাচুর্য ছিল, বাইরে থেকে আয়াসে এসব কিছু সংগ্রহ করতে হত না। তাঁর ছোট বাগানে বিভিন্ন প্রকার সুন্দর ফুলেরও গাছ ছিল। অবসর সময়ে প্রায়ই তিনি এই ফুলবাগানে গিয়ে নিজের হাতে গাছগুলির যত্ন করতেন। গৃহদেবতার পূজার ফুল এখান থেকেই পাওয়া যেত।

আমার পিতা ও পিতৃব্যেরা তিন ভাই ছিলেন। পূজ্যপাদ পিতা অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য সকলের জ্যেষ্ঠ। হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ও হুগলী কলেজে অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেখাপড়া করে তিনি 'স্নাতক' উপাধি পেয়েছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁর খুব পারদর্শিতা ছিল। প্রথম জীবনে তিনি কানুনগো হয়েছিলেন। তারপর ভারত সরকারের 'কন্ট্রোলার অব্ কারেন্সি'তে কাজ করেন। শেষে ওল্ড রেকর্ড সেকশনের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হয়েছিলেন এবং ঐ পদ থেকেই অবসর গ্রহণ করেছিলেন। পিতামহের মতো পিতৃদেবও বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। নির্বিলাস অনাড়ম্বর সরলজীবন তিনি যাপন করে গেছেন। তাঁর শৃঙ্খলাবোধ ছিল অপূর্ব, আর সর্বোপরি তাঁর হৃদয়টি ছিল স্নেহে পরিপূর্ণ। অতিথি-অভ্যাগত, পরিচিত পরিজন—সকলেই তাঁর কোমল মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হতেন। ভালবাসবার শক্তি অপরিমেয় ছিল বলেই পিতা জীবনে বহু অন্তরঙ্গ বন্ধু লাভ করেছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে জীবনে বহু উপকারও পেয়েছিলেন। তাঁর প্রাণ-মাতানো স্নেহে আমরা মাতৃবিয়োগ-বেদনা কিছুমাত্র অনুভব করিনি।

কেবল পিতার আমলেই তাঁর নিজের অর্জিত অর্থেই প্রতিবৎসর দোল, দুর্গোৎসব, সরস্বতীপূজা ও হিন্দুর অন্যান্য প্রধান পূজা-উৎসব আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হত। যে বৎসর তাঁর বেতন পঞ্চাশ টাকায় ওঠে, সেই বৎসর তিনি খুব ঘটা করে প্রথম দুর্গোৎসব সম্পন্ন করেছিলেন। পিতা কর্মঠ, সদাশয়, মিতব্যয়ী ও দূরদর্শী ছিলেন। নিজস্ব অর্থব্যয়ে কাশীতে হরিশ্চন্দ্রঘাট রোড ও অসিঘাট রোডের মিলনস্থানের কাছে 'বড়গম্ভীর সিঙে' নাতিবৃহৎ একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। আর কাশীর কেদারের মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে ভক্তদের হিতার্থে উৎসর্গ করেন। এ ছাড়া প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে 'জল-সত্র' খুলে তৃষ্ণার্ত পথিককে সামান্য আহার্য সহ জলদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পিতা বাল্যকাল থেকেই খুব সাহসী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। ঠাকুরমার কাছে শোনা একটি ছোট ঘটনায় তা সপ্রমাণ হয়। পরিবারে বড়ছেলে ছিলেন বলে পিতার বালক বয়সে হাটবাজার করতে হত। কাঁচা বাজারের জন্য তখন প্রতিবারে দু-আনা (আট পয়সা) তিনি হাতে পেতেন। প্রয়োজনীয় আহার্য সামগ্রীর হ্রাস না ঘটিয়ে আট পয়সা থেকে আধপয়সা করে প্রতিদিনের বাজার-খরচ হতে জমিয়ে সাতভরি গিনি-সোনার এক-জোড়া 'অনন্ত' গড়িয়ে ঠাকুরমাকে উপহার দিয়েছিলেন। ছাব্বিশ কুঠরি-যুক্ত একখানা ব্যারাক্ বাড়িও পিতা নিজগ্রামে তৈরি করেছিলেন এবং

ঐ বাড়ির সন্নিকটে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিলেন। এই জমির উপর যে বাড়ি আছে, তাতে প্রজার বাস। 'দেউলপাড়া' গ্রামে বারো বিঘা জমির উপর ইটখোলা ও পুষ্করিণী তিনি ক্রয় করেছিলেন। এতদধিক, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের একটি পৌনে তিন বিঘা আমকাঁঠালের বাগানও কিনেছিলেন।

পিতা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—তরুলতা ফল ফুল খুব ভালবাসতেন। শখ করে দূরদেশ হতে বিভিন্ন রকম গাছের চারা আনিয়ে তিনি বঙ্কিমস্মৃতিজড়িত বাগানখানি নিজের পছন্দমত সুন্দর রূপে সাজিয়েছিলেন। প্রত্যহ সকালে গিয়ে তিনি বাগানের মনোরম শোভা দেখে প্রফুল্ল মনে ফিরে আসতেন। পিতা মার্জিত-রুচিসম্পন্ন, প্রাণখোলা, সামাজিক ও মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন; তিনি বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে প্রচুর হাসিখুশি, আমোদ-প্রমোদ করতেন। এ উপলক্ষে টাকাকড়িও কম খরচ করতেন না। দুঃখের বিষয়, উক্ত ফলের বাগানটি একদিন রাত্রে অগ্নিদাহে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তাই দেখে খুব মর্মাহত হয়েছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ এ বাগানের সঙ্গে সব সংস্রব ছেড়ে দিয়ে সমাপ্তির রেখা টেনে দিয়েছিলেন। পিতৃদেব পিতামহের মতো দীর্ঘজীবী হন নি। বংশগত ধারায় পিতা ও পিতামহের বহু গুণাবলী আমাতে বর্তেছে।

আমার মাতামহ-কুল

আমাব প্র-মাতামহের নিবাস ছিল হাওড়া জেলার ডোমজুড় ব্লকের অন্তর্গত 'ঝাঁপড়দা' গ্রামে, কলিকাতা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে। প্র-মাতামহ তাঁর পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। তিনি ভিটেবাড়ি ও স্থাবর সম্পত্তির ভাগ সহোদরদের চেয়ে কিছু কম পেয়েছিলেন, কিন্তু পিতার আশীর্বাদ পেয়েছিলেন বড় রকমের। আর এই আশীর্বাদের জোরেই তিনি জীবনে প্রভূত উন্নতি করতে পেরেছিলেন। তাঁর পিতা লোকান্তরিত হলে প্র-মাতামহ পঞ্চানন চূড়ামণি প্রথম যৌবনে কলিকাতায় চলে আসেন। পটলডাঙার বিখ্যাত জমিদার ঘোষাল মহাশয় তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ঘোষালবাড়ির আশ্রয়ে থেকে তিনি প্রথমে যজন-যাজন আরম্ভ করেন, পরে অবস্থার কিছু উন্নতি হলে পটলডাঙাতেই ঘোষালবাবু-প্রদত্ত জমির উপর একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। প্র-মাতামহ ক্রমশঃ উন্নতির উচ্চশিখরে উঠতে থাকেন। যজন-যাজন ব্যাপারে পরামর্শ দানের আয়ে ও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে রাজা-

জমিদারদের প্রদত্ত প্রণামীর অর্থে তিনি যথেষ্ট বিত্তবান হয়েছিলেন। হ্যারিসন রোড তখন সবেমাত্র তৈরি হতে চলেছে। পটুয়াটোলা লেন ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মাঝখানের ঐ নূতন রাস্তার দক্ষিণ দিকে ছোট একফালি জমি কিনে বাড়ি তৈরি করেছিলেন। সেই বাড়িতে তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে এসেছিলেন। পরে রাধানাথ মল্লিক লেনে আর-একখানি ছোট বাড়ি তৈরি করেন। প্র-মাতামহ পঞ্চানন চূড়ামণি আশ্রিতবৎসল, মুক্তহস্ত দাতা ও অতিথিপরায়ণ পুরুষ ছিলেন। হিন্দুর সকল দেবদেবীর প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর আলয়ে দুর্গোৎসব, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্রীপঞ্চমীর সরস্বতীপূজা, ঝুলন, রথযাত্রা—এক কথায় হিন্দুর সকল দেবদেবীর পূজা নিষ্ঠা ও সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হত। আর ঐ সকল পূজা-অর্চনার দিনে বহুলোকে সমাদরে প্রসাদ পেয়ে পরিতুষ্ট হত।

সহৃদয়তাবশে তাঁর গ্রামের ও সন্নিহিত অঞ্চলের বহু লোককে প্র-মাতামহ তাঁর কলিকাতার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন আহার ও বাসস্থান সমেত। তাঁর আনুকূল্যে বহু লোকের ভাগ্য ফিরেছিল—লক্ষ্মীলাভও হয়েছিল। তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হয়ে নানাজনে নানারকম কাজ করত আর অল্পবিস্তর রোজগার করত। এই সুযোগেই অনেকে নিজের অবস্থার উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্য সাধন করতে পেরেছিল। দুঃস্থ, অসহায় প্রার্থীকে প্র-মাতামহ কখনো রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দিতেন না। পশ্চিমবঙ্গের পাশ্চাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি 'বড় ধনী' বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লোকহিতসাধন ও দানাদি পুণ্য-কর্মের জন্য তাঁর সুযশ আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। চূড়ামণি মহাশয় নির্লোভ ও সঞ্চয়বিরোধী ছিলেন। কাজেই সোনাদানা হস্তগত হলেই তিনি বিলিয়ে দেবার উপায় খুঁজতেন। ধর্মের প্রেরণায় তিনি চারবার তুলা-পুরুষ দান করেছিলেন। তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় দাতা নিজে বসে অন্য পাল্লায় সমান ওজনের সোনা, রুপা, তাম্র ইত্যাদি অষ্টধাতু রেখে বিহিত দেবপূজাদি সমাপনান্তে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে দান করার নাম তুলা-পুরুষ-দান। তুলা-পুরুষ-দান অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। খুব অল্পলোকেই এই পুণ্যকর্ম সম্পাদনে সক্ষম হয়। প্র-মাতামহ অতি দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন, প্রচুর সম্পত্তিও রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিধিলিপি অমোঘ, অখণ্ডনীয়। কেউই জীবনে সর্বতঃ সুখী হয় না, চূড়ামণি মহাশয়ও হন নি। শোক-তাপ, মনোবেদনা তিনি পেয়েই ছিলেন।

আমার মাতামহ কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য তাঁর পিতার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন।

তিনিও জীবনে পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। তিনিও পণ্ডিত ছিলেন। তবে যৌবনকাল থেকেই বহুমূত্ররোগে তিনি পীড়িত জীর্ণ, কাজেই কঠোর শ্রমে অসমর্থ ছিলেন। তাঁর পিতার চতুষ্পাঠীতে তিনি মাঝে মাঝে কিছু সময় অধ্যাপনা করতেন। আর নিজের যজমানদের বাড়িতে তাঁর নিযুক্ত পুরোহিতেরা বিশুদ্ধভাবে পূজা-অর্চনাদি করছেন কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতেন। এতে প্রণামী মিলত প্রচুর। মোটের উপর তাঁর আয় ভালই ছিল। তাঁর পিতা পঞ্চানন চূড়ামণির মতো তিনি তেমন কীর্তিমান ছিলেন না। তবে তিনিও নিজস্ব অর্থে দুখানা বাড়ি কলিকাতায় তৈরি করেছিলেন। এ ছাড়া নিজ গ্রামে পুষ্করিণী খনন ও প্রতিষ্ঠা করে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করে দিয়ে তিনি প্রতিবেশীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন।

কয়েকটি সন্তান অল্প বয়সে মারা যাবার পর তাঁর দুটি কন্যা ও একটি পুত্র জীবিত ছিলেন। আমার মা তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা, মাতুল মধ্যম সন্তান ও মাসীমা কনিষ্ঠা তনয়া। মাতামহও বংশের ধারায় প্র-মাতামহের অনেক গুণ পেয়েছিলেন। তিনিও সদাশয়, দানশীল, আশ্রিতবৎসল ও আতিথ্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁর সময়ও বহুলোক অন্ন ও বাসস্থান সুদ্ধ তাঁর বাড়িতে আশ্রয় পেত। আমার বিশ্বাস, উপচিকীর্ষা, দানশীলতা, দুঃস্থ-অসহায়ের প্রতি সমবেদনা ইত্যাদি সদ্‌গুণ মাতুল-কুল থেকেই আমাতে বর্তেছে "নরানাং মাতুলঃ ক্রমঃ"—সূত্রানুসারে।

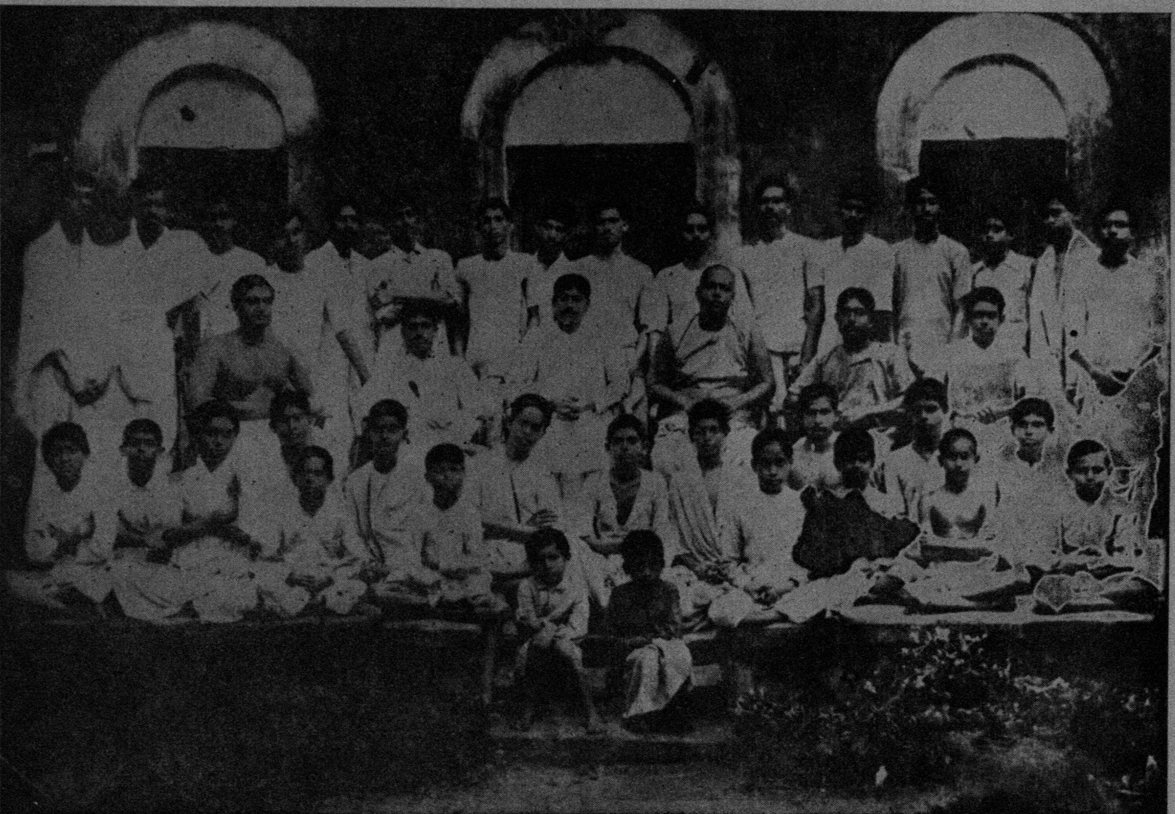
আমি কৈশোরে ও যৌবনে মাতুলালয়ে থেকে পড়াশুনা করেছি। এসব কথা যথাস্থানে বিবৃত হবে। বাংলার ১৩০৭ সালের ১৬ই মাঘ (ইং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি) ঝাঁপড়দহে মঙ্গলবার ভোররাত্রে মামার বাড়িতে আমার জন্ম হয়। পিতামাতার আমি প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠপুত্র। ছোট-বয়সে মামার বাড়িতে আমার খুবই যাতায়াত ছিল। যখন শিশু ছিলাম, তখন মায়ের সঙ্গে গিয়ে মামাদের গ্রামের বাড়িতে মাঝে মাঝে চার-ছ মাস থেকেছি; কেবল মামার সঙ্গ ধরেও সেখানে গিয়েছি অনেকবার। আর, একটু বড় হয়ে কলিকাতার রাধানাথ মল্লিক লেনে মাতুলালয়ে তো নিত্যই গিয়েছি। মামা শ্রদ্ধেয় রামপদ ভট্টাচার্য খুব স্নেহশীল ছিলেন। তিনি আমাকে প্রাণঢেলে ভালবাসতেন, আর কত যে কোলেপিঠে নিয়ে বেড়িয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না। শিশুসুলভ চাপল্যে যখনই কোনরকম বিপদে বা দুর্ঘটনায় পড়েছি, তখনই মাতুল নিজের কষ্ট-যন্ত্রণা তুচ্ছ করে আমাকে বাঁচিয়েছেন—আমার দুঃখ প্রাণপণে দূর করতে চেয়েছেন। তাঁর স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য।

আমার বাল্যকাল ও যৌবনকাল—
স্বদেশপ্রীতির উন্মেষ ও সন্ন্যাসী হবার আকাঙ্ক্ষা

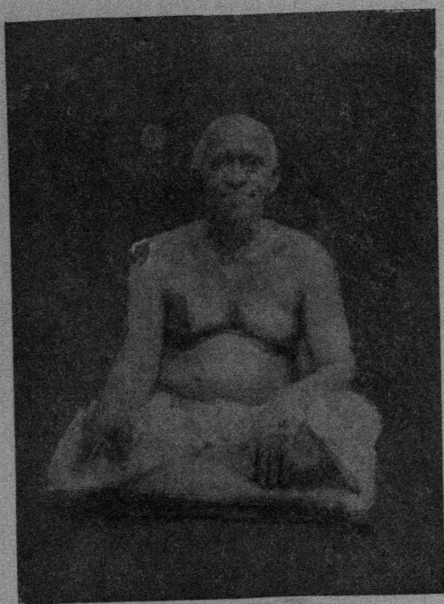
ছোটবয়সে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' গল্প শুনতে বড় ভালো লাগত। মাতুল আমাকে এ গল্প শোনাতেন। যতবার কলিকাতায় মাতুলের কাছে এসেছি ততবারই তাঁর মুখে 'আনন্দমঠের' গল্প শুনেছি। প্রথমদিন শোনার পর থেকেই দেশভক্ত সন্তানদের প্রতি তাঁদের অতিমানবিক মহত্বের জন্য অন্তরে আমি এক অনির্দেশ্য আকুল আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁদের কার্যকলাপের সম্যক ধারণা করার ইচ্ছা ও তাঁদের আদর্শের অনুসরণ করার আগ্রহ মনে জাগে। কালক্রমে এ আকর্ষণ শ্রদ্ধা-মিশ্রিত অনুরাগে পরিণত হয়। আর, এই অনুরাগের প্রভাবে প্রাণে গভীর সাড়া জাগে, তাঁদের মতো দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মবিসর্জন করি—এমন এক ঝোঁক আমাকে পেয়ে বসে। কিন্তু এ কাজে হাত দেবার প্রতিকূল পরিবেশ ও অসুবিধা খুবই বেশী থাকায় নিজগ্রামের প্রতি আমার মন বিরূপ হয়ে ওঠে; ভাটপাড়া গ্রাম সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ি। এগার বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন হয়; এই অনুষ্ঠানে মাতুল আমার আচার্য হয়েছিলেন। তাতে আমি খুব আহ্লাদিত হয়েছিলাম। উপনয়নব্রতে 'ব্রহ্মচারী' অবস্থায় আমার কেবলই মনে হত—আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের মতো আমি যদি কোনও মঠের অধিকারী হতাম, তাহলে সেখানে আমিও তাঁদের মতো ত্যাগপূত নির্মল সন্ন্যাসী-জীবন যাপন করতাম। কিন্তু ব্রহ্মচর্যান্তে তিনদিন পর আমার মন থেকে এ চিন্তা অপসৃত হয়। আবার যথারীতি দৈনন্দিন পড়াশুনা ইত্যাদি নীরস অরুচিকর কাজে মনোনিবেশ করতে হয়। তথাপি সন্তানদের মহৎ উদ্যম-আয়াসের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ছোটখাটো কাজের মধ্য দিয়ে সোৎসাহে দেশের মঙ্গল সাধনের যথাসাধ্য প্রয়াস পেতে থাকি। তখন আমি ভিন্ন-অঞ্চল হতে আগত কিংবা স্বগ্রামবাসী ভিখারী, অনাথ-আতুর, ব্যাধিগ্রস্ত, অসহায়ের সেবার কাজ করতে থাকি।

ডাক্তারি পড়ার ঝোঁক ও হোমিওপ্যাথি শেখার আগ্রহ

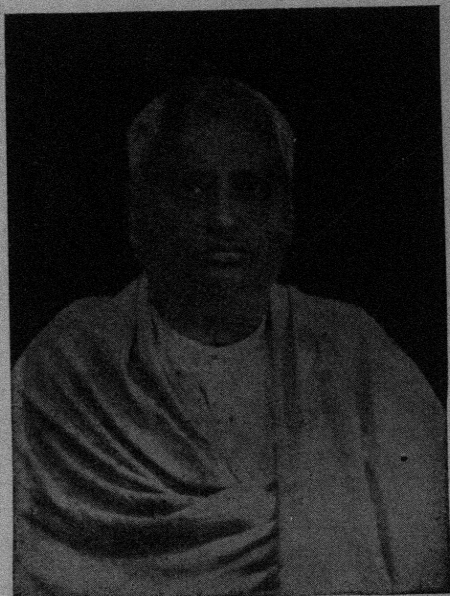
একদিনের কথা বলছি। আমাদের গ্রামে এসে দুই বিদেশী ভিখারী—পিতা ও পুত্র হঠাৎ একই সময়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়। আমি দু-তিনদিন ধরে ঐ দুঃস্থ লোকগুলির সেবা-শুশ্রূষা করি। ঐ ভিক্ষুকের চিকিৎসা ডাক্তার



কর্মীসমাজ ও ছাত্রসমাজের কতিপয় শিক্ষক, সভ্য ও শিক্ষার্থীসহ প্রতিষ্ঠাতা—বাঁদিকে প্রথম



পিতা স্বর্গত অরবিন্দ ভট্টাচার্য



৺বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়

ব্রজরাজ ঘোষ করছিলেন। তিনি রোগীর সেবার কাজে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। কিন্তু ওদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখে যখন তাঁকে তাড়াতাড়ি দ্বিতীয়বার ডাকতে গেলাম, তখন তিনি আমাকে 'এইমাত্র দেখে এলাম, আমার নাওয়া খাওয়া নেই ?' এই বিরূপ জবাব দিয়ে নিরাশ করে দিলেন। এতে মনে বড় ব্যথা লাগল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টিও খুলে গেল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম—আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে দীন-দুঃখী-আর্তের সেবা করতে কখনো সমর্থ হব না। তাই ফেরার পথে আসার সময় অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম যে, হোমিওপ্যাথিক শিখব। এখানে ছোটখাটো একটা অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা আবশ্যক। ডাক্তার ঘোষের ঔষধে ভিখারী দুটি কোনমতে একটু ভাল হতে চলছিল। তৃতীয় দিনে ডাক্তার ঘোষকে না পাওয়াতে ভিখারী পিতার কাকুতি-মিনতিতে অনুকম্পাবশতঃ এবং কিছুটা বিরক্ত হয়েও তাকে গাঁজা তৈবী করে খেতে দিলাম। পুত্রটিও পিতার দৃষ্টান্ত অনুকরণে গাঁজায় দম দেয়। আশ্চর্যের বিষয়, গাঁজায় টান দেওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই যেন কোনও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে পিতাপুত্র উভয়ে রোগমুক্ত—সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। দেখে আমি খুব বিস্মিত হই।

ভিখারীদের সুস্থ করার সমকালীন একটি ঘটনা আমাকে বিস্মিত করেছিল। এইখানে সংক্ষেপে সেই কথা বলছি ঃ—একদিন গঙ্গাতীরের পথ ধরে হাঁটছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম—নজরে পড়ল একটা বেজি তীরবেগে ছুটে এসে আমার দক্ষিণ পাশে একজনের বেড়ায় উঠে একটি ছোট গাছের ডাল ভেঙে মুখে করে নিয়ে যেমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছিল, তেমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আমার পায়ের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে পাতাশুদ্ধ ডালটি নিয়ে আমার বামধারে গঙ্গার পাড়ে ঝোপের মধ্যে একটি গর্তের ভিতরে ঢুকে পড়ল। আমি কৌতূহলবশতঃ বেজির গতিবিধি লক্ষ্য করি। কতকগুলি চিতের পাতা বেজির গতিপথে ছড়িয়ে পড়ে। যে গর্তে বেজিটি ঢুকেছিল সেই গর্তের প্রবেশদ্বার ও ভিতর পর্যন্ত আমি সেই পাতা ছড়ানো রয়েছে দেখি। তখন আমা মনে হল সেই পাতা বা সেই গাছের ডালের রস বা আঠা সাপের বা অন্য কোন জীব-জন্তুর বিষাক্ত দংশনের প্রতিষেধক হতে পারে। আমি অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কারও নিকট হতে কোন সদুত্তর পাইনি।

শিক্ষা ও ধর্মানুরাগ

কিশোর বয়স হতেই জপধ্যানাদিতে আমার আন্তরিক আগ্রহ; কিন্তু গুরুজনদের ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে লুকিয়ে আমাকে একাজ করতে হত। ভয় হত বিজ্ঞ প্রবীণেরা পাছে আমাকে অকালপক্ক বলে উপহাস করেন আর গ্রামের অন্যান্যরা আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। তাই নিথর শেষরাত্রে বা নির্জন শান্ত সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি মন্দির বা উদ্যানাদির ভিতরে ঢুকে ধ্যানজপাদিতে মনোনিবেশ করতাম। ভাটপাড়ার মান্যগণ্য বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণেরা ভোর-রাত্রে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে আমাদের গঙ্গার বাঁধানো 'বলরাম সরকার' ঘাটে গিয়ে স্নান পূজা জপ আহ্নিক আরম্ভ করে দিতেন। সূর্যোদয়ের কিছু পরে তাঁরা বাড়িমুখে ফিরতেন। কাজেই আমি রাত্রির নিঝুম শেষ প্রহরে চুপিসাড়ে গঙ্গার ঐ ঘাটে চলে যেতাম। কোন দিন সুবিধামত ফুলবাগানের গাছের আড়ালে বসে, কোনদিন বা শ্মশানের নিকটবর্তী গঙ্গার আঘাটায় আর্দ্র-মাটির উপর আসনে বসে একমনে জপ-ধ্যান চালিয়ে যেতাম। ঐ সময় অতিপ্রাকৃত উৎপাত সামান্য কিছু লক্ষ্য করেছি। মনে হত—কেউ যেন আমার জপধ্যানের জন্য বিরক্ত হয়েছে—জপধ্যান ভাঙাতে পারলে যেন খুব আমোদ হয়। তাই, এদিকে ওদিকে ধুপধাপ শব্দ হত, কখনো ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ হত, কখনো বা উপর থেকে ছুঁড়ে মারা পাথরখণ্ড পড়ার শব্দ শুনতে পেতাম। কিছু ভয় হত, কিন্তু আসন ছেড়ে উঠে পড়ার মতো ত্রাসকর অবস্থা কখনো হয় নি। তা ছাড়া আদ্যাশক্তি শ্যামামার গান গেয়ে গেয়ে তন্ময় হয়ে পথ চলাও আমার বাল্যকালের আর-একটি অভ্যাস। ঐ সময় অসাবধানতাবশতঃ অনেক বিপদাপদের মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু দয়াময়ী পরমেশ্বরীর কৃপায় সব সময় উদ্ধার হয়েছি—ত্রাণ পেয়েছি। ভাটপাড়া, কলিকাতা, গিরিধি—সর্বত্রই তাঁর মঙ্গলহস্ত আমাকে রক্ষা করেছে।

বালকবয়সে যা কিছু মনোহর বলে আমার চোখে সুন্দর ও বিস্ময়কর বোধ হত, তাকেই আনন্দময়ী অনন্তরূপা মহাশক্তি জগন্মাতার দিব্য-রূপের বিকাশ বলে কল্পনা করতাম। এটি আমার ধ্যানের খুব অনুকূল ও সহায় হয়েছিল। এই উপায়ে ধ্যান অনুশীলন করে সযত্নে নিজের মনকে সংযত রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলাম; আর ফলও যথেষ্ট পেয়েছিলাম। চণ্ডীতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা আদ্যাশক্তি মহামায়া ব্রহ্মময়ী জগদীশ্বরীকে "সুধাত্বমক্ষরে-নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকাস্থিতা" বলে স্তব করেছেন। ভুবনেশ্বরী মা আমার

অমৃতসিন্ধু। তাঁর হৃদয়প্রাণবিহ্বলকারী রূপের ছটায় ভক্তসাধক বিমুগ্ধ তন্ময় হয়ে পড়েন। তখন তিনি ব্যাকুল আগ্রহে প্রার্থনা করেন,—

"আমায় দে মা পাগল করে (ব্রহ্মময়ী)।
আমার কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।
তোমার প্রেমের সুরাপানে করো মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে।"

অন্তরে বাইরে সৌম্যাতিসৌম্যা অতিমনোহরা সুধানির্ঝরিণী জগন্মাতার দিব্য রূপমাধুরী অনুভূতি করবার অতি প্রবল আকুতি আমার প্রাণে ঐ সময় বিপুল আলোড়ন জাগিয়েছিল।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকালে অতিপ্রাকৃত দৃশ্যাদি দর্শন

কিশোর বয়স হতেই আমি স্বভাবে অত্যন্ত দুরন্ত হয়ে উঠি। আর আমার শরীরেও অমানুষিক বল ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই আমি দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে, সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দেই—এই কথা পবে বলব। এ কারণে আমাকে নিশাচর-বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। তখন আমার বয়স ১৪।১৫ বৎসর হবে। ছুটিছাটাতে বাড়ি এসে প্রায় দিনই মধ্যরাত্রে চুপি-সাড়ে বিছানা ছেড়ে বাড়ির বাহির হয়ে যেতাম সন্ত্রাসবাসী গুপ্ত সমিতির নির্দেশিত কোন কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। ভাটপাড়া হতে শ্যামনগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ছিল আমাদের কর্মক্ষেত্র। ঐ সময় বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না—এমন সব দৃশ্য ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। বহু রাত্রেই আমি ভূত-প্রেতাদি ছায়ামূর্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি। একদিন রাত্রের প্রথমার্ধেই ঘুম ভেঙে যায়। রাত্রি শেষ প্রহরের দিকে এগিয়ে এসেছে ভেবে নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করে চুপি-চুপি ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে উদ্যত হয়েছি এবং সদর দরজার ছিটকিনি বন্ধ করতে করতে বাড়ির দক্ষিণ দিকস্থ অদূরবর্তী পুকুরের দিকে তাকিয়ে দেখছি—এমন সময় একটি অঘটন ঘটে। দেখলাম পুকুরের ধারে একটি মেয়েলোক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে আমার মনে হল হয়তো আমাদের ঝি কোন কাজে পুকুরে এসেছে। আমি আপন মনে আমার পথে এগিয়ে চললাম। উত্তরমুখে এগিয়ে জোড়ামন্দিরের কাছে এসে যথারীতি দেবতাকে প্রণাম করে মুহূর্তমধ্যে উত্তরদিকে তাকিয়ে দেখলাম সেই স্ত্রীলোকটিই ৬।৭ হাত দূরে আমার সামনে দক্ষিণমুখে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তাকে

দেখে আমার সন্দেহ হল, কোন নষ্টচরিত্রা রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চলেছে উপপতির সঙ্গে মিলিত হবার মানসে। তারপর আমার মনে একটু ভয়ও হল, আর সন্দেহও হল ভূতপ্রেতের কথা মনে পড়ায়। ছায়া-মূর্তিটি প্রতিক্ষণ সমান দূরত্ব বজায় রেখে আমার সঙ্গে সঙ্গে পিছু হেঁটে চলছিল; তাই এটা আমার নিজেরই ছায়া কিনা—এ বিষয় গা নাড়িয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ভালরকম পরীক্ষা ক'রে দেখলাম—না! এই ছায়ামূর্তি অতি-প্রাকৃত কোনকিছু—আমার ছায়া মোটেই নয়। আমি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললাম, ছায়ামূর্তিটি একইভাবে আমার আগে আগে চলতে থাকল। জোড়া-মন্দির থেকে ৭।৮ হাত দূরে পাঁচিলঘেরা একটি পোড়ো বাড়ি ও তৎসংলগ্ন বাগান ছিল। কিছুদূর এগিয়ে দেখি এই ছায়া-নারী চোখের পলকে উক্ত পোড়ো বাড়ির বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কখন কিভাবে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে সে আচমকা বাগানে চলে গেল পাঁচিলটি পর্যন্ত না ডিঙিয়ে—তার কিছু হদিস পেলাম না। তখন আমি কিছুটা হতভম্ব হলাম। দেখতে পেলাম পাঁচিলের ওপারের পথ ধরে তবুও প্রেত-নারীটি আমার সান্নিধ্য বজায় রেখে চলেছেই। তখন আমি পাঁচিলের পার্শ্ববর্তী পূর্ব-পশ্চিমে বিলম্বিত রাস্তায় পড়ে ৪।৫ হাত পূর্বমুখে এগিয়ে পাঁচিলের এক প্রান্তে পৌঁছে পাঁচিলের পাশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা ধরে ২।৩ হাত এগুতেই একটি সজনে গাছ পড়ে। গাছটি খুব বড় নয়, তবুও গাছটির একটু আড়াল হতেই সেই ছায়ামূর্তি সহসা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়। তখন ভয়ে আমার গা ছম্‌ছম্‌ ক'রে উঠল। এই আতঙ্কজনক অবস্থায় মনে সাহস নিয়ে এসে নিজেকে স্থির রাখলাম—কোনমতে নিজেকে সামলে নিলাম। সেদিন রাত্রে বন্ধুর সঙ্গে আর দেখা হল না। সুতরাং বাড়ি ফিরে আস্তে আস্তে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম; কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না, খোলা জানালা দিয়ে ঐ পোড়োবাড়ির বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তবে ঝাপসা অন্ধকারে ভূত-প্রেত বা ঐরূপ কিছু আর দেখতে পেলাম না। এইরকম ছায়া-মূর্তি বা অতিপ্রাকৃত দৃশ্যাদি কৈশোরে বা যৌবনে আমি অনেকবার কখনও দিনে—বেশীর ভাগ রাত্রেই—স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করেছি। অনেকে ভূতপ্রেত বিশ্বাস করেন, অনেকে আবার ঘোর বাস্তববাদী,—কাজেই অতিপ্রাকৃত কোনকিছুর কথা শুনলেই হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। অতএব এ নিয়ে তত্ত্ববিচার করে লাভ নাই। ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি;

যার যা ইচ্ছা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করুন—আমি এখানে কেবল আমার অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করলাম মাত্র।

এর পর আমি আর-একদিনের একটি অনধিগম্য অঘটনের উল্লেখ করে এ-বিষয়ের ইতি করছি। এই দিন রাত্রেও আমি বিছানা ছেড়ে বাড়ি হতে বেরিয়েছিলাম সন্ত্রাসবাদী দলের আমার সেই বন্ধুটির সঙ্গে কোন কাজে দেখা করতে। এই দিনও কৃষ্ণপক্ষ ছিল এবং রাত্রিও মধ্যপ্রহর অতিক্রম করে বড় বেশী বাড়েনি। বন্ধুকে তার বাড়ি গিয়ে ডাকলাম, সে বলল যে, একটু পরে আসছে; সুতরাং আমাদের পাঁচ-মন্দিরের পূর্বধারের মন্দিরের রোয়াকে সিঁড়ির দক্ষিণ পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুর জন্য অপেক্ষায় রইলাম। রোয়াক থেকে ৫।৬ হাত দূরে মাঝারি আকারের একটা সাদা বিড়াল বসে ছিল, বোধহয় সে শিকার ধরার মতলবে ছিল। আমি একটু তামাসা দেখবার জন্য ছোট একটা ইঁটের টুকরো তার গায়ে ছুঁড়ে মারলাম। আর অমনি সে তড়াক ক'রে ২।৩ হাত উঁচুতে সোজা লাফিয়ে উঠল। এর পর ঝপ ক'রে মাটিতে নেমে বিড়ালটি কোন দিকে কোথায় চ'লে গেল,—তা তত নজর করতে পারিনি। আজও সুস্পষ্ট মনে আছে এই দিনের 'অঘটনের' কথা। আহত বিড়ালটি যেই মুহূর্তে লাফিয়ে উঠেছে ঠিক সেই মুহূর্তেই শুভ্র আলোর প্লাবনে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঝলকিত—উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেই স্নিগ্ধ অথচ অতি উজ্জ্বল আলোকে পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল; জালমারা খোলা জানলার ফোকর দিয়ে লোকের বাড়ির ভিতরভাগ, বদ্ধ গলিখুঁজি রান্নাঘরের দ্রব্যাদি, বিছানার উপর ঘুমন্ত মানুষের মুখ ইত্যাদি সব দেখা যাচ্ছিল। তাকিয়ে দেখি মাথার উপর আকাশে বৃত্তাংশের আকারে এই অভাবনীয় আলোর উৎপত্তি। এই আলোকদৃশ্য অন্ততঃ ১৫ মিনিট কাল স্থায়ী হয়েছিল। এই বিস্ময়কর আলোটি কোথা হতে এল তা জানবার জন্য তাকাতে তাকাতে আমার নজরে পড়ল আমার মেজ ভগ্নিপতিদের আকাশপ্রদীপের বাঁশের মাথার উপর থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে কে যেন আকাশে একটা আঁচড় কেটে দিয়েছে। যখন আমার নজরে এল তখন আলোকটি নিম্নপ্রান্ত থেকে ক্রমশঃ ম্লান হতে চলেছে। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ নিভে গিয়েছে ততক্ষণ সেই আলোকের দীপ্তি সামান্য মাত্রও ম্লান হয় নি। সেই আলোকরেখাটি অন্ততঃ হাত বার-চৌদ্দ লম্বা এবং একটি পেন্সিলের দাগের মত চওড়া ছিল। দেখতে অতি সামান্য নীলচে হলেও ঔজ্জ্বল্যে সেটি লক্ষাধিক ওয়াটের টিউবলাইটকেও হার মানিয়ে

দেয়। এই বিহ্বলকারী 'হঠাৎ-আলোর' দৃশ্যটি প্রাকৃতিক কি দৈবশক্তি-সঞ্জাত—তা বলতে পারি না। তবে ঐ রাত্রে আকাশে ধূমকেতু ওঠে নাই; উল্কাপাতের সময়ও এমন স্নিগ্ধ কমনীয় অত্যুজ্জ্বল আলোর এরূপ আবির্ভাব ঘটে না। ধূমকেতুর বা উল্কার আলো হলে রাত্রির অন্ধকার সত্ত্বেও গ্রামের অপর দু-একজনের নজরে পড়ত। জিজ্ঞাসা করে—অনুসন্ধান করে যতদূর জেনেছি, তা হতে এটা নিশ্চিত যে, আমি ছাড়া গ্রামের আর কেউ এ অপূর্ব আলোক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন নি। আমি এই আলোর আবির্ভাবের একমাত্র সাক্ষী। বহু পণ্ডিতই এ অঘটনের ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। এটা শেষ পর্যন্ত প্রহেলিকাচ্ছন্নই রয়ে গেল।

সাপ-বাঘের উৎপাত ও আশ্চর্য উপায়ে অব্যাহতি

যে সময়ে অলৌকিক ও অপ্রাকৃতিক দৃশ্যাদি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল তার কিছুকাল পূর্ব থেকে, বেশ কয়েক বৎসর পর পর্যন্ত বিষধর সর্পের সান্নিধ্যে আমাকে আসতে হয়েছে। দুই-একবার হিংস্র বাঘের সম্মুখেও ঐ সময় পড়েছি।

আমাব উপনয়নের আগে সম্মোহনবিদ্যায় পারদর্শী পরিচিত কোন ভদ্রলোকের নিকট থেকে আমি শুনেছিলাম যে, কোন নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি বা কোন রঙীন চিহ্ন বা ফুটকির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার অভ্যাসে ক্রমশঃ চিত্তের স্থিরতা বা মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। একে বলে ত্রাটক্‌যোগ। পুরাকালে মুনিঋষিরা ঐ যোগের সহায়ে অসীম ইচ্ছাশক্তি ও মনোবলের অধিকারী হতেন। এই বিশেষ যোগের কথা শোনা অবধি আমি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর নির্দেশিত পন্থায় এর অনুশীলনে সচেষ্ট হই। উপনয়ন না হওয়ার জন্য এই ব্যাপারে প্রতিপদে বাধা সৃষ্টি হত। তখন আমি শীঘ্র উপনয়ন দেবার জন্য আমার ঠাকুরমাকে জোর করে ধরে বসি। তিনি আমার উৎপাতে বিব্রত হয়ে একদিন ঠাকুরঘরে বসে বলে বসেন আমাকে ছোটকাকার সঙ্গে পৈতা দেবেন। আমি একাদশ বর্ষে পদার্পণ করলে ঐ সালের চৈত্র মাসে ছোট-কাকার একসঙ্গে আমাকেও পৈতা দেওয়া হয়।

আমি দ্বিজ হয়ে জনসমক্ষে বসে নিত্যকার সন্ধ্যাহ্নিক করতে দ্বিধাবোধ করতাম না। কিন্তু বয়ঃক্রম অল্প থাকা হেতু সর্বসমক্ষে ধ্যানে বসতে সংকোচ হত। এই জন্য ইষ্টচিন্তার অনুকূল পরিবেশ পাবার আশায় নিভৃত স্থান খুঁজে

বেড়াতাম। স্থায়িভাবে কলিকাতায় চলে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি প্রত্যহ ভোরের অন্ধকারে বলরাম সরকারের ঘাটের আশেপাশে বসে ধ্যান জপ ও প্রাতঃসন্ধ্যায় নিরত হতাম। ঐ সময়ে একমাত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরাই তাঁদের প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতে আসতেন। তাঁদের কারো নজরে আমি পড়তাম না। তাই অসংকোচে যেতে পারতাম। সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা যাঁরাই সান্ধ্যভ্রমণের সময় পেতেন তাঁরা প্রায় সকলেই ভ্রমণান্তে উক্ত ঘাটে এসে উপস্থিত হতেন। ব্রাহ্মণেরা সায়ংসন্ধ্যা গঙ্গাতীরে বসে করে নিতেন। আহ্নিক সমাপনান্তে কেউ কেউ বাড়ি ফিরতেন। আর কেউবা উপরের ধাপে বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করতেন; সেই কারণে আমি প্রায় প্রতিদিন বৈকালের দিকে গঙ্গাতীরে না গিয়ে সুযোগ ও সুবিধামত কোনদিন পোড়োমন্দিরে প্রবেশ করে আর কোনদিন বাগানে ঢুকে বা মাঠের ধারে গিয়ে পছন্দমত স্থানে আসনে উপবিষ্ট হতাম। আমার পছন্দমত স্থানে বসে লোকলজ্জার ভয় থেকে মুক্তি পেতাম বটে কিন্তু ভূত-প্রেত এবং সাপের উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি কোনদিনই গা-ঢাকা অন্ধকার অবস্থায় পাওয়া যেত না। তবুও তখনকার দিনে জনাকীর্ণ স্থান অপেক্ষা নির্জন বিপদসঙ্কুল স্থানে বসে মনঃসংযোগে তৃপ্তি আমার বেশী হত।

মাঠঘাটের কথা ছাড়াও আমায় আরও অনেকবার সাপের উৎপাত সহ্য করতে হয়েছে। সেসব কথা ছেড়ে দিলাম। এখন কেবল রাজধানী কলিকাতায় গৃহের ভিতর, ভাটপাড়ায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তার উপর এবং আম্বালা ক্যানটনমেন্টে সরকারী বাংলোর শয়নকক্ষে খাটিয়ার উপর আমি সাপের নিকট থেকে এবং বার দুয়েক নরখাদক বাঘের গ্রাস থেকে কিভাবে আশ্চর্য উপায়ে রক্ষা পেয়েছি সেই কথাই বলছি।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল ইংরাজ আমলে কলিকাতায় ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক-উৎসবের দিনে। উৎসব দেখাতে বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে এসেছিলেন। বর্তমান এ. জি. বেঙ্গল অফিসের দক্ষিণের মাঠে, এখন বিধানসভাগৃহ যে স্থানে অবস্থিত, সেইখানে অভিষেক-উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। বাবার উপরিওয়ালা সাহেবের নির্দেশমত আমাকে তিনতলার বারান্দায় বসে দেখার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। ঐ দিন বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় বাবা আমাকে দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন নি। রাধানাথ মল্লিক লেনে মামার বাড়িতে আমি সেই রাত্রে থেকে যাই। আমি জামা কাপড় ছেড়ে সদরে চতুষ্পাঠী-ঘরের সংলগ্ন

অন্দরমহলে এসে বসি। রাস্তার ধারের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে উবু হয়ে বসে আমি দুহাত দিয়ে দুটি পা জড়িয়ে ধরে রেখেছিলাম। চিবুকটি দু-হাঁটুর মাঝে রেখে অভিষেক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কৌতূহলী বাড়ির সকলের প্রশ্নের আমি উত্তর দিচ্ছিলাম। যে দেওয়ালে আমি ঠেসান দিয়ে বসে-ছিলাম, সেই দেওয়ালে সংযুক্ত ছিল চতুষ্পাঠী-ঘরে যাবার দরজা। সেই দরজার উপরের কাঠে হাত দুটি লাগিয়ে তলার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে সারা দেহটি হেলিয়ে দুলিয়ে আমার মামা উৎসব সম্বন্ধে গল্প শুনছিলেন। হঠাৎ দৌড়ে এসে আমার দুই হাতের উপরদিকটা আচমকা চেপে ধরে টেনে মামা আমাকে ঘরের ভিতর দিকে সরিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেওয়ালে দাঁড়করানো কাঠের পিঁড়ের গাদা থেকে একখানা পিঁড়ে টেনে তুলে নিয়ে আমি যেখানে বসেছিলাম সেই স্থানের দেওয়ালের গা ঘেঁসে, বার কয়েক সজোরে ঘা মারলেন। একটু পরে আমরা বুঝতে পারলাম, তিনি ত্রস্ত হয়ে একটি সাপকে মেরে ফেলেছেন। তখনই বাড়ির সকলে হৈচৈ করে ওঠেন। গোলমাল শুনে পাড়ার দু-পাঁচজনও এসে জড় হলেন। সাপটিকে দেখে তাঁরা সবাই অবাক হয়ে যান। কীভাবে সাপটি দেওয়ালের বাইরে সিমেণ্ট-ধরানো পোতা উঁচু ঘরে ঢুকতে পেরেছিল তা নির্ণয় করতে পারলেন না। সাপটি যে গক্ষুরা সাপ এ বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। সাপটিকে অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে ফেলার পর সমাগত সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। মামার সতর্কতায় আমার প্রাণ বাঁচল। ভগবৎ-কৃপার এটিও এক অপূর্ব নিদর্শন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আমার শিশু কনিষ্ঠা ভগ্নীর সান্নিপাতিক জ্বরের সময় ঘটেছিল। তার জন্য বরফ আনতে আমি একদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নৈহাটি যাচ্ছিলাম আর অভ্যাসমত "কালীকল্পতরু মূলে বসে রই যখন যে-ফল বাঞ্ছা সে ফল প্রাপ্ত হই।"—এই গানটি আপন মনে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আস্তে আস্তে পথ চলছিলাম। ঘোষপাড়া রোডের ধারে অবস্থিত আমাদের ব্যারাক বাড়ি পার হতেই মনে হল যেন আমার ডান পায়ের জুতার ছেঁড়া হাফসোলের মধ্যে একটা মোটা দড়ি আটকেছে। তখন আমি সেটি খোলার চেষ্টায় খানিকটা দূর পা ঘেঁসটে গেলাম। তখনও সেটি খুলল না বুঝে, আমি কুলী-ডিপোর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁ-পা দিয়ে কোন রকমে আটকানো দড়িটিকে চেপে রেখে ডান পা সজোরে উপর দিকে টেনে তুলে নিলাম। তখনও আমি গান গেয়েই চলেছিলাম; কিন্তু যখন দড়িটি আলগা হয়ে পড়ল

আমি ঐ সঙ্গে ডান-পা মাটিতে নামিয়ে দিলাম। তখুনি আমি নীচু দিকে তাকিয়ে দেখি, সেই দড়িটি উঁচু হয়ে নড়ে উঠল। সেই সঙ্গে আমার ভুল ভাঙল,—দড়ির বদলে জ্যান্ত সাপ নজরে পড়ল। তখন নৈহাটির দিকে না গিয়ে বাড়িমুখো ছুট দিলাম। পিছন দিকে মধ্যে মধ্যে যতবার তাকিয়েছি ততবারই ঘাড়ভাঙা সাপটিকে আমার দিকে হেলতে-দুলতে ছুটে আসতে দেখেছি। পিছন দিকে তাকাতে গিয়ে আমি টাল্ সামলাতে না-পেরে রাস্তার এধারে একবার ওধারে একবার টলে টলে পড়ছিলাম। এমন সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ি সেখানে এসে পড়ায় আমি পাশ কাটিয়ে দৌড়াতে থাকি। আরও সামান্য কিছুটা যেতে না যেতেই একদল কলের-কুলি গান-বাজনা করতে করতে সামনে এসে পড়ে। তখন আমি 'সাপ-সাপ' বলে চীৎকার করে উঠি। কুলিরা চঞ্চল হয়ে উঠল, এবং হৈচৈ করে 'কাঁহা সাপ বাবু' বলে দেখিয়ে দিতে বলল। আমি সংক্ষেপে তাদের কথার উত্তর দিয়ে সবেগে পাশ কাটিয়ে চলে আসি। এইভাবে প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ভাটপাড়া স্কুল পার হয়ে 'সরকারের ঘাটের' শেষ সীমানায় এসে খুব হাঁপিয়ে উঠি। তখন দৌড়ানোর ক্ষমতা একেবারেই চলে যায়। এবারে সভয়ে জোরে জোরে পা-চালিয়ে বাড়ি হাজির হই। গিয়ে দেখি, বোনটিকে কোলে নিয়ে মা ঘরের ভিতর পায়চারি করছেন। মা-র কাছে শুনলাম, রোগীকে বিছানায় শোয়ালেই কেঁদে উঠে এবং কোলে তুলে নিয়ে ঘুরলেই চুপ থাকে। সাপের ব্যাপারের সঙ্গে ভগ্নির অবস্থা খারাপের দিকে যাওয়ার কোন যোগসূত্র আছে ভেবে আমার মনে ভয়ের সঙ্গে তখন ভাবনা এসে জুটল। আমি তাড়াতাড়ি মাকে সাহায্য করার মতলবে ছোট কাকার সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত হই। সাপেরা প্রতিহিংসাপরায়ণ শোনা থাকায় সে রাত্রে সতর্ক থাকার উপায়স্বরূপ আমি বোনের সেবার ভার নিয়ে থাকি। আমি এইভাবে সেই রাত্রে মাকে পূর্ণ বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছিলাম। রাত্রে আহত সাপের দ্বারা কোন উপদ্রব হয় নি। ভোরে ঘর পরিষ্কার করার জন্য জুতো সরিয়ে রাখার সময় ডান-পাটি জুতোর সামনের উপরিভাগে ভিজা দাগ ও তার মধ্যে সুস্পষ্ট দাঁতের আঘাতচিহ্ন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

প্রসঙ্গত বলছি যে, জুতো-জোড়াটি এই ঘটনার বৎসর দুই পূর্বে পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজের কাছ থেকে স্নেহের দান হিসাবে আমি পেয়েছিলাম। জগদ্ধাত্রীপূজার ছুটি কাটাতে ঐ বৎসর আমি মামার বাড়িতে আসি। ঐ দিন-ই বৈকালে পূজনীয় রাখাল মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে বলরামমন্দিরে

যাই। পরদিন তিনি ইন্টালিতে কোন ভক্তের বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজা দেখতে যাবার সময় আমাকে গোলদীঘির ধার থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যান। পূজাবাড়ির দোতলার বৈঠকখানায় আমন্ত্রিতদের বসাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। মায়ের গান ও বাজনা শোনার কালে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। সকলে এমন তন্ময় ছিলেন যে, ঘরে যে জল ঢুকছে সেদিকে কারো হুঁশ ছিল না। শ্রোতাদের জুতো, জামা-কাপড় সব ভিজে গিয়েছিল। প্রসাদ খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে স্থানে স্থানে তখনও জল জমে থাকতে দেখেছিলাম। রাধানাথ মল্লিক লেনের কোমরভোর জল ভেঙে আমি মামার বাড়িতে ঢুকেছিলাম। পরদিন আমি ভাটপাড়া যাবার আগে শ্রদ্ধেয় মহারাজকে প্রণাম করতে পুনরায় বলরাম-মন্দিরে যাই। তাঁর ঘরে শাম্বর হরিণের একজোড়া জুতোর দিকে আমার কৌতুহলী দৃষ্টি পড়ে। আমার মনের ভাব বুঝে স্নেহশীল রাখাল মহারাজ ঐ জুতোজোড়া আমাকে নিয়ে আসতে বলেন। আমি খুশী মনে ওনার স্নেহের দান গ্রহণ করি।

তৃতীয় বারের ঘটনাটি ঘটেছিল আম্বালা ক্যান্টনমেণ্টে পিসিমার কাছে বেড়াতে গেলে। আমার পিসেমশাই ছিলেন উচ্চপদস্থ রেলওয়ে কর্মচারী। তাঁর বাসভবনটি ছিল একটি সাহেবী বাংলো। আমি বাগানের দিকের ঘরটিতে থাকতাম। সেই ঘরটিতে বাগানমুখো একটি বড় জানালা ছিল। কাস্ট আয়রনের জাল তাতে লাগানো ছিল। বিশুদ্ধ বাতাস পাবার জন্য ঐ জানালা খুলে রেখে নির্ভয়ে রাত্রে ঘুমোতাম। একদিন বৈকালে বৃষ্টি হওয়ায় রাত্রে কিছুটা ঠাণ্ডা পড়েছিল। সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি একখানি তুলোর মোটা কম্বলে আপাদমস্তক ভালভাবে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। কেবল মাত্র নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য নাকটি বাইরে ছিল। পিতামহের কাছ থেকে শেখা মন্ত্র 'শয়নে পদ্মনাভঃ, নন্দিকেশ্বরায় নমঃ' জপ করতে করতে অল্পক্ষণের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে দুই হাতের পাতা একত্র মিলিয়ে বুকের উপরে আবরণের নীচে রাখা ছিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বুঝতে পারি কী যেন একটা ভারী জিনিস আমার হাতের জোড়াপাতার উপর এসে বসে ক্রমশঃ ভারী চাপ দিচ্ছে। ক্রমশঃ সেই চাপ বৃদ্ধি পেয়ে বুকের উপর এসে পড়ে, তখন নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট অনুভব করি আর তন্দ্রাঘোর কেটে যায়। তৎক্ষণাৎ জোড়াহাতের পাতা সজোরে উপরে উঠিয়ে পাশের দিকে মেঝেতে সেই ভারি বস্তুটি ছুঁড়ে ফেলে দিই। ভেজা বালির বস্তা পড়লে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি শব্দ করে ভারী

বস্তুটি মেঝের উপরে ছিটকে পড়ে। আওয়াজ শুনেই আমি ভীত হয়ে চীৎকার দিয়ে ট্রলিচালকদের কোন একজনকে শীঘ্র আলো নিয়ে আসতে ডাকি। আমার ঐ চীৎকার শুনে একজন বাগানে গোরু ঢুকেছে ভেবে হারিকেন নিয়ে বাগানের দিকে ছুটে যায়। 'কিধার গাই, গাই কিধার' বলে আলো হাতে নিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে সে সমস্ত বাগানটি তোলপাড় করে ফেলে ; কিন্তু গাই বা অন্য কোন প্রাণী তার নজরে পড়ে না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটু আলোর ক্ষীণ রশ্মি নালার ভিতর দিয়ে আমার চোখে এলে আমার দৃষ্টি নালার উপর গিয়ে পড়ে। সেই আলো ক্রমশঃ পর্যায়ক্রমে কমতে কমতে আর বাড়তে বাড়তে বেশ কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ নালা ফাঁকা হয়ে আলো জোরাল হয়ে পড়ে।

এইভাবে একটি সরীসৃপের শরীরের ক্রমশঃ সরু পশ্চাদ্ভাগটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়। সেটি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের ভয় কেটে যায়, আমি তৎক্ষণাৎ খাটিয়া থেকে নেমে তাড়াতাড়ি জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। একটি তলদা বাঁশের থেকেও মোটা আর লম্বা সাপ খুব ধীর গতিতে ঘাসের উপর দিয়ে হেলতে তুলতে সিধে চলেছে দেখতে পাই। ট্রলি-চালক কিছুদূরে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কী একটা লক্ষ্য করছিল। আমার গলার আওয়াজ পেয়ে সে থতমত খেয়ে আলোটা নামিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকাতেই সাপটা তার নজরে পড়ে। ভীষণ ভয় পেয়ে সে 'অজগর' বলে চীৎকার দিয়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটে পালায়। যে ব্যক্তির উপর নালার মুখ বন্ধ করার ভার ছিল তার গাফিলতির জন্য এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এবারও দারুণ বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে শ্রীশ্রীমা জগদম্বাকে মনে মনে সহস্র প্রণাম জানালাম। এরপর পিসিমার বাড়িতে যতদিন ছিলাম বেশ সুখেই আমার দিনগুলি কেটে ছিল।

গিরিধি থাকাকালীন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে ক্রিশ্চান হিলের এক পাশের ছোট গুহার মধ্যে বসে প্রত্যহ ধ্যান জপ করতাম, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই সময়ে ঘটনাচক্রে একদিন সন্ধ্যাকালে বাঘের ভয়ে খাণ্ডুলী পাহাড়ের উপত্যকা থেকে নেমে দৌড়াতে দৌড়াতে শুষ্ক উশ্রী নদী পার হয়ে ঐ ক্রিশ্চান হিলের পশ্চাদ্ভাগে এসে আমাকে দাঁড়াতে হয়েছিল। আমার সঙ্গীদের হৈচৈ চীৎকারে ঐ পাহাড়-সংলগ্ন ছোট ডোবা থেকে জলপানে রত দুটি ব্যাঘ্রশাবক জলপান বন্ধ রেখে লাফাতে লাফাতে উঠে এসে আমার বামপদ ঘেঁসে দৌড়ে স্থানীয় ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাদের একটিকে

হিলের উপরে উঠতে দেখি। তাদের মা বাপ আমাদের নজরে পড়ে নি। আগের দিন খাণ্ডুলী পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এসে এরাই নববিবাহিত বরটিকে পালকি থেকে তার বধূর পাশ হতে টেনে নিয়ে এসেছিল। সেকথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আঁতকে উঠে প্রাণপণে যে যেদিকে পেরেছি সে সেইদিক দিয়ে দৌড়ে লোকালয় অভিমুখে ছুটেছি। শেষে ঘরমুখো পথ ধরে বাড়ি এসে পৌঁছেছিলাম।

ওই ঘটনার বেশ কিছুকাল বাদে বাঘের দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে অজন্তা ইলোরা দেখতে যাবার সময়। আমরা নাসিক থেকে মোটরগাড়িতে বেরিয়েছিলাম। মনমদের পথে ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলার সময় চাঁদের আলো দেখা দেওয়ার সঙ্গে রাস্তার তুধারের সাজানো ফলে ভরা বাদামখেতের মনোরম শোভা ক্রমশঃ পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠে অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করে। গাড়ি থামিয়ে আলো নিভিয়ে আমরা সেই দৃশ্য দেখতে থাকি। ঐ সময় আমাকে রাস্তার ধারে নামতে হয়। এমন সময় একটি বাঘ চিনেবাদামখেতের মধ্য থেকে সোজাসুজি রাস্তা ধরে গাড়ির দিকে আসছিল। চালকের নজরে পডতেই সে হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বাঘটির চোখে আচমকা জোরাল আলো পডতেই সে গাডির দিকে মুখ তুলে রেখে সামনের পা তুখানি উঁচু করে মাটিতে রেখে পাছাব উপর ভর দিয়ে বসে পড়ে। সহযাত্রীদের ইঙ্গিত পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির ভিতর উঠে আসি। গাড়ির চালক প্রথমে আস্তে আস্তে গাডি চালিয়ে নিয়ে এসে শেষে সবেগে গাড়ি চালিয়ে দেয়। ধাবমান গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে বাঘটি মারা যায়। আমরা গাড়ি থেকে নেমে এসে বাঘটির লেজ গাড়ির পিছন দিকে বেঁধে দিই। এই অবস্থায় মনমদ বাজারে গিয়ে বাঘটিকে ফেলে রেখে আমরা গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাত্রা করি। এইরূপে দ্বিতীয়বার আমি ভগবানের কৃপায় বাঘের গ্রাস থেকে রক্ষা পাই।

বেলুড় মঠ ও সন্ন্যাসগ্রহণে আগ্রহ

বাল্যকালে বা কৈশোরে তখনকার দিনে দেশের বাড়ি থেকে কলিকাতায় মামার বাড়িতে প্রায়ই আমাকে যাতায়াত করতে হত। হঠাৎ একদিন ট্রেনে শ্রদ্ধেয় কালীদার সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছ থেকে কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম ও বেলুড় মঠের কথা, কিন্তু এ বিষয়ে বিশদ

বিবরণ সংগ্রহের জন্য তিনি এমন একজনের নাম করলেন, যাঁর কাছে গেলে আমার বাড়িতে জানাজানি হতে পারে ও আমার উদ্দেশ্য পণ্ড হতে পারে—এই আশঙ্কা আমার মনে উদয় হয়। কাজেই আমি গোপনে কার্যসিদ্ধির অন্য উপায় খুঁজতে থাকি। এরূপে দিনের পর দিন মনে মনে কল্পনার জাল বুনতে লাগলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই করতে পারলাম না। আমি তখন গ্রামের স্কুলে পড়ি। এমন সময় পূজার কিছুদিন আগে আমার কনিষ্ঠ ভাইয়ের টাইফয়েড জ্বরে হঠাৎ মৃত্যু হয়। এই কারণে সে বৎসর আমাদের গ্রামের বাড়িতে দুর্গোৎসব হয়নি, বাবা কাশীধামে গিয়ে পূজা সম্পন্ন করেছিলেন। আমি যেতে পারিনি, সেবার আমি ডোমজুড়ে মামাদের দেশের বাড়ির পূজাতে যাই। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, 'যে খায় চিনি চিন্তামণি তাকে জোগান চিনি'। সেখানকার তন্ত্রধারক মহাশয়ের সহিত সৌভাগ্যক্রমে আমার হৃদ্যতা জন্মে। কথাপ্রসঙ্গে তাঁর নিকট থেকে বেলুড়মঠের অবস্থান ও মঠ-সংক্রান্ত নানা বিষয় অবগত হয়ে খুব উৎসাহী হয়ে পড়ি।

কালীপূজার পর মামাদের কলিকাতার বাড়িতে ফিরে আসি। নিজ বাড়িতে ফেরবার পূর্বেই বেলুড় মঠ দেখে আসব এবং সাধু হবার ব্যবস্থাও করব—এইরূপ চিন্তা মনে উদয় হয়। এই ভেবে কালীপদ ওঝা নামে মামাদের এক প্রজার কাছ থেকে শিশুসুলভ ভয়ের দরুন সাপের মাদুলি ও ভূততাড়ানো কবচ সংগ্রহ করে এনেছিলাম। তারপর একদিন বিকালে কাউকেও কিছু না বলে দিদিমার কাছ থেকে কিছু পয়সাকড়ি নিয়ে বেলুড় মঠের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরলাম এবং বেলুড় স্টেশনে নেমে সোজাসুজি চলতে শুরু করলাম।

আমি শুনেছিলাম যে, বেলুড় মঠ গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত। ভ্রান্তি-বশতঃ পশ্চিমমুখী হয়ে চলতে থাকি। কিন্তু অনেকক্ষণ হেঁটে অগ্রসর হওয়ার পর মঠ দেখতে না পেয়ে আমার হুঁশ হল যে, পথ ভুল করে উল্টো দিকে চলেছি। যখন ধানের খেতের মাঝখানে এসে পড়ি, তার খানিকক্ষণ পরে এক বৃদ্ধাকে দেখতে পাই। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করে আমার ভ্রম সংশোধন হল এবং তিনি আমাকে বেলুড়ের দিকে অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়ে আমার মঠে পৌঁছানো সহজ করে দিলেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে—এমন সময় আমি বেলুড় মঠে গিয়ে উপস্থিত হই এবং কিছুটা স্বস্তিবোধ করি। বেলুড় মঠের চৌহদ্দির ভিতর ঢুকে দেখি মঠ চালাঘর নয়—যা আমার পূর্বের ধারণা ছিল—কোঠা বাড়ি। অজানা অচেনা জায়গায় প্রথম এসে হঠাৎ

ভিতরে ঢুকতে আমার সঙ্কোচ এবং ভয় হল। মঠের আশেপাশে কাউকেও দেখতে পেলাম না। এদিক ওদিক করতে করতে গা-ঢাকা অন্ধকার নেমে এল। অন্ধকারে কোথায় যাব কী করব ঠিক করতে পারলাম না। তখন গঙ্গার ঘাট নজরে পড়ায় ঘাটের রানায় গিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম। মাদুলি দুটি হাতে থাকায় মনেও বেশ সাহস ছিল। কিছুক্ষণ এইভাবে আছি এমন সময় কে একজন আমার গা-ছুঁয়ে মৃদু ঝাঁকুনি দিল। আমি চকিতে চোখ মেলে দেখি আমার সামনে সৌম্যমূর্তি একজন পূর্ণযৌবন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সস্নেহে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকা', তুমি এখানে কেন ? তোমার নাম কী ? কিজন্য এখানে এসেছ ?' উত্তরে আমি তাঁকে বললাম আমি সাধু হব বলে এখানে এসেছি ; এবং আমার নাম ও পিতার নাম এবং গ্রামের নাম উল্লেখ করে আমার বিস্তৃত পরিচয় দিলাম। সব শুনে উদার-চেতা এই সাধু আমাকে খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ ঠিক ঠিক ! তোমাদের মতো ছেলে সন্ন্যাসী হবে না তো কে হবে ? তবে এখানে তো কিছু হবে না, তুমি শ্রদ্ধেয় বড় মহারাজ—রাখাল মহারাজের কাছে যাও—বাগবাজারে ১নং মুখার্জী লেনে। সেখানে তোমার সাধু হবার সব ব্যবস্থা হবে। কিন্তু সাধু হবার কথা যাকে তাকে বোলো না, এতে লোকে হাসাহাসি করবে।'—এই বলে তিনি হঠাৎ চলে গেলেন এবং 'জামাই'—সম্বোধন করে তিনি এক ব্যক্তিকে ডেকে এনে আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ছেলেটিকে তোমার ঘোড়ার গাড়িতে করে কলিকাতায় পৌঁছে দিও। কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির সামনে ছেড়ে দিলেই এ বাড়ি চলে যেতে পারবে।" জামাই ভদ্রলোকটি রাজী হলেন। আমাকে কিছু ঠাকুরের প্রসাদ এনে দেওয়ার পর আমরা কলিকাতার দিকে রওনা হলাম এবং রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ রাধানাথ মল্লিক লেনে মামার বাড়িতে আবার ফিরে এলাম। আমাকে দেখে দিদিমা খুব আশ্চর্য হলেন। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ করে বাগবাজারের দিকে ছুটলাম, কিন্তু মুখার্জী লেনে শ্রদ্ধেয় রাখাল মহারাজ তখন ছিলেন না। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি বাগবাজারের অন্য অঞ্চলে অবস্থিত বলরামবাবুর বাড়িতে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম বলরাম-মন্দিরে। সদর দরজা পার হয়ে ডানদিকের ঘরে স্বামী তুরীয়ানন্দ শ্রদ্ধেয় হরি মহারাজ অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। সামনের একটা সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'ঐ সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যাও, উঠেই দেখবে ডানদিকের ঘরে মহারাজ আছেন।' আমি তাঁর

কথামত উপরে গিয়ে হাজির হলাম। প্রথমেই মহারাজের সঙ্গে দেখা হল না। তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন বলে একটু বাধাও ঘটল। তাঁর অনুমতি পাওয়ার পর তবে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতে পারলাম। তিনি আমাকে বসতে বলে সস্নেহে কথাবার্তা বলতে লাগলেন আর তাঁর কাছে আগমনের উদ্দেশ্য কী, তাও জানতে চাইলেন। আমি সাধু হতে চাই শুনে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং আমাকে মিষ্টবাক্যে উৎসাহ এবং নানারূপ মূল্যবান উপদেশ দিলেন। প্রথম বারের সাক্ষাতেই আমি তাঁর স্নেহলাভ করতে পেরে কৃতার্থ হতে পেরেছিলাম।

শ্রদ্ধেয় মহারাজের সহিত সাক্ষাতের পর সেইদিনই ভাটপাড়ায় দেশের বাড়িতে আমি চলে এলাম। তখন মা-বাবাও কাশী থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। স্কুলের পড়াশুনার কাজও আবার যথারীতি শুরু হয়েছে। কাজেই আমাকেও বাধ্য হয়ে স্কুলে হাজিরা দিতে হল। কিন্তু মনটা সব সময়ই মহারাজের কাছে যাবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকত। সুযোগ পেলেই বেলুড়ে বা বাগবাজারে যেখানেই থাকুন, আমি শ্রদ্ধেয় রাখাল মহারাজের কাছে গিয়ে হাজির হতাম। কিছুদিন ঘন ঘন যাতায়াতের পর শ্রদ্ধেয় হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, কালীকৃষ্ণ মহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের পার্ষদ ও ভক্তমণ্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং সৌভাগ্যবশতঃ তাঁদের সকলের কাছ থেকে অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসা পেয়েছিলাম। সর্বোপরি আমি পূজনীয় রাখাল মহারাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলাম; প্রাণ খুলে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও চলত। তাঁর সান্নিধ্যে আমোদ-আহ্লাদ-আনন্দ-উদ্দীপনার কথা ভাষায় প্রকাশ করে বলা যায় না। বলরামবাবুর বাড়িতে একদিন শ্রদ্ধেয় নির্মল মহারাজ, বিমল মহারাজ ও সীতাপতি মহারাজের সঙ্গে আমাকে একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে বড়মহারাজ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'তোরা যেন সব সহোদর ভাই রে।' এতে আমরা তাঁর প্রশান্ত স্নেহের প্রকাশ অনুভব করেছিলাম।

এই সময় একদিন বিকালে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে শুনলাম যে, আমার মাতুলের অকালমৃত্যু ঘটেছে। তিনি মা-বাবার একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন। এই কারণে দাদামশাই, দিদিমা, অল্পবয়স্কা মামীমা ও বৃদ্ধ প্র-মাতামহ আমি কাছে থাকলে সান্ত্বনা পাবেন এই ভেবে তাঁদের দেখাশুনা করার উদ্দেশ্যে আমাকে দেশের বাড়ি ছেড়ে তখন থেকে কলিকাতায় এসে থাকতে হয়।

কাজেই তখন আমি নৈহাটি মহেন্দ্র স্কুল ছেড়ে কলিকাতায় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। তখন থেকে ছুটির দিন ভিন্ন দেশের বাড়িতে থাকার পাট একেবারে চুকে যায়। এই সময় প্রতি একাদশীতে 'নির্জলা' উপবাস করতাম, স্কুলে যেতাম না। কলিকাতায় থাকাকালীন প্রতি একাদশীর দিন ভোরে সালখিয়ার ভিতর দিয়ে হাঁটাপথে বেলুড় মঠে যেতাম এবং সেখানে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় আবার হাঁটাপথে মামার বাড়িতে ফিরে আসতাম।

সমাজসেবার উদ্যম

রাধানাথ মল্লিক লেনে ছিল আমার মামার বাড়ি। এই সময় স্কুলে যাওয়ার পথে সরস্বতী লাইব্রেরির শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী কিরণ মুখোপাধ্যায়ের কথা আমার এক বন্ধু অলোক চক্রবর্তীর কাছে শুনতাম। এইরূপে বিপ্লবী যুগান্তর দলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগে এবং কিছুটা যোগাযোগও ঘটে। ফলে দলের ছোটখাট কাজও আমাকে কিছু কিছু করতে হয়। এই সময় ভাটপাড়ার অনাথ-ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাতা বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনাথ-ভাণ্ডার অচল হয়ে পড়ে। আমি উদ্যোগী হয়ে সম্পাদক মহাশয় ও সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের অনুমতি নিয়ে একাই পুনরায় প্রতিষ্ঠান চালনার ভার নিই। কিন্তু আমার কোনও সহকর্মী একাজে জোটে নি। প্রতি সপ্তাহে স্কুলের ছুটিতে যখন যেতাম সকালে ভিক্ষার-চাল সংগ্রহ করে বিকালে একাই অসহায় সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির মধ্যে তা বিতরণ করতাম। দু-চার মাস পরে অবশ্য তারাপদ ভট্টাচার্য ও যতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী নামে দুটি অল্পবয়স্ক ছেলে আমাকে এই কাজে কিছুটা সাহায্য করেছিল।

এই সামান্য 'সমাজসেবার' কাজ হতে আমি গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম যে, বয়োবৃদ্ধ গুরুজনদের সম্পাদক বা সভাপতি করে নৈবেদ্যের নাড়ুর মতো মাথায় না রেখে বা তাঁদের না নিয়ে তরুণ কর্মীরা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো যদি জনহিতকর কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে তাতেই অধিকতর সাফল্য ও সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকে। অনাথ-ভাণ্ডারের চাল এইভাবে বেশ কিছুকাল ধরে স্বহস্তে বহন করে বহু কষ্টে কাজ চালানোর পর আমাদের গ্রামের কয়েকজন যুবক বিরোধিতা করার মতলবে পাশের গ্রামের একজন স্ত্রীলোককে চাল দিতে বলে। কিন্তু নিয়মবিরুদ্ধ বলে

আমি তাদের কথা অগ্রাহ্য করি ও প্রার্থী স্ত্রীলোকটিকে চাল দিয়ে সাহায্য করি নি। এরপর থেকে তারা আমার প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াল। এদের মধ্যে একজন অত্যুৎসাহী ব্যক্তি আমার দুর্নাম রটাতে শুরু করে। তাতে আমি মনে খুব ব্যথা পাই।

একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। তা এই—একদিন চাল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমার সহকর্মী ছেলেদুটি একপ্রকার বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এসে বলল,—'অনেকে আজ চাল দেন নি, আমাদের বিমুখ করে দিয়েছেন।' কারণ বুঝতে না পেরে নিজেই অনুসন্ধানের জন্য বেরিয়ে পড়ি। আমাকেও সেদিন হঠাৎ অনেকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন বুঝতে বাকি রইল না পিছনে দুষ্টলোকের চক্রান্ত রয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রমাণও মিলল। কোন এক বাড়িতে গিয়ে চাল চাইলে বৃদ্ধা স্থানপতি-গৃহিণী চুপিচুপি আমাকে বললেন, 'বাবা একটু ঘুরে এসো, তোমাকে চাল দেব ; যে ছেলেটি বারণ করছে সে আমাদের বাড়িতেই যে রয়েছে !' বৃদ্ধার কথা ছেলেটি আড়াল থেকে শুনতে পেয়ে চকিতে বেরিয়ে এসে বলে, 'একে আবার চাল দেবেন বলছেন ! না, না, চাল দেবেন না ! এরকম কু-চরিত্র নেশাখোর ছেলেকে প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এতে সমাজের কল্যাণ কিছু হতে পারে না। খালি হাতে একে বিদায় করে দিন।' এই বিকৃতবুদ্ধি যুবকের কথা শুনে ক্রোধে ক্ষোভে আমি একেবারে সম্বিৎ-হারা হয়েপড়ি এবং প্রহার করে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার মতলবে বৃদ্ধার বাড়ির সামনের দরজায় গিয়ে তার জন্য অপেক্ষায় থাকি। ছেলেটির ফিরতে বিলম্ব হয় এবং আমার রাগ ক্রমশঃ কমে আসে। যুবকটি নিষ্কৃতি পেল বটে, কিন্তু এর পরদিন থেকে অনাথ ভাণ্ডারের কাজ বন্ধ করে দিই এই ভেবে যে, পুনরায় যদি কোন জনহিতকর কাজ করি তবে পূর্বে দল গঠন করে নিয়েই তা করব।

এর পর থেকে ভাটপাড়াতে যাওয়া কমে এল ; ঐ দিনগুলিতে তখন হয় বিপ্লবী দলের কাজে না হয় মঠে যাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। এই সময় আমি যে বিপ্লবী যুগান্তর দলের একজন—একথা রাখাল মহারাজ বুঝেছিলেন। তিনি মনে করতেন—সন্ত্রাসবাদে দেশের প্রকৃত কোন উপকার হবে না। স্বামীজি-নির্দেশিত পথে গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হওয়া সম্ভব। রাখাল মহারাজের সস্নেহ সান্নিধ্য লাভের ফলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদ ও ভক্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার

সুযোগ হয়েছিল, আর স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার ঔৎসুক্যও বেড়েছিল। তাই সুবিধা পেয়ে তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু জানবার তা বিশদ ভাবে জেনে নিয়েছিলাম, খুঁটিনাটিগুলি পরে রাখাল মহারাজের কাছ থেকে পরিষ্কার করে বুঝে নিয়েছিলাম। স্বামীজি-প্রচারিত যুগোপযোগী ভারতীয় আদর্শ ও তার নিগূঢ় তাৎপর্য আমাকে প্রবুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে তখনও আনন্দমঠের সহিংস কর্মপদ্ধতির প্রতি নিবিড় অনুরাগ আমার অন্তরকে মথিত করে চলছিল। তাই আমার কাঁচা মন গঠনমূলক কাজের দিকে ঝুঁকে পড়তে চাইল না। মনে হতে লাগল সন্ত্রাসবাদীদের অবলম্বিত ধ্বংসমূলক কার্যের দ্বারা ইংরাজের কবল থেকে দেশের উদ্ধার ত্বরান্বিত হতে পারবে। ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে তখন তোষণ-নীতি প্রবল, তাহলেও আমি মধুরভাষী পরোক্ষ শত্রু ইংরাজদের উচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিলাম—আঘাত দিয়ে। শাসন শোষণ ছাড়াও তারা ভারতীয় জনগণকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য অর্থনৈতিক দাসে পরিণত করতে সাগ্রহে সচেষ্ট ছিল। নিত্য নূতন ধরনের অভাব সৃষ্টি করে পাশ্চাত্য বণিকেরা চাহিদা মেটাতে নিত্য-নূতন বিলাতী পণ্যসম্ভারে ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছিল। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো তখন নিজের আত্মবল হারিয়ে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। এটা দেশ ও জাতির পক্ষে চরম দুর্ভাগ্য। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজ সরকারের আনুকূল্যে খ্রীষ্টান মিশনারিরা সারা ভারতের হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরে এবং পাহাড়ী জাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের অবাধ সুযোগ পেয়েছিলেন। সামান্য কিছু সুবিধা ও সহায়তার প্রলোভন দেখিয়ে ত্রাণকর্তা যিশুর ধর্মের দিকে এই অবোধ অশিক্ষিত সরলবিশ্বাসীদের তাঁরা আকর্ষণ করতেন। এতে হিন্দুজাতির অধোগতির পথ সুগম হতে চলেছিল। তৃতীয়তঃ, ইংরাজী শিক্ষার কুফলও ভারতীয় জাতির মর্মমূলে আঘাত হানছিল। আমরা আমাদের জাতীয় ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাচ্ছিল্য করতে শিখেছিলাম পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধমোহে। এমন সময়ে বীর সন্ন্যাসীর বিজয়শঙ্খনাদে কলম্বো হতে আলমোড়া পর্যন্ত সারা দাক্ষিণাত্য ও আর্যাবর্ত প্রকম্পিত হয়ে উঠল। আর্যঋষির অনাদি গম্ভীর বেদমন্ত্রে ভারতবাসী আবার আস্থাবান হল। ঋষিবাক্যে তার শ্রদ্ধা পুনর্জাগ্রত হল। স্বামীজি ঘটালেন অলৌকিক প্রতিভাবলে ভারত আত্মার পুনর্জাগরণ। তাঁরই উদার মহান আদর্শের মধ্যে আমি খুঁজে পেলাম ইংরাজ রাজশক্তির দুষ্ট মতলবকে প্রতিহত করার অনুপ্রেরণা ও

উত্তম কৌশল। ইংরেজ শাসনে ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর নিজেদের প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে ইংরাজী শিক্ষার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে দুর্বার বেগে আত্মশক্তি ও আত্মগৌরব হারাতে বসেছিল। স্বামীজির মহৎ আদর্শের মধ্যে আমি এই আত্মগ্লানি ও অধঃপাত প্রতিরোধের সুনিশ্চিত পথ পেলাম।

মহাযোগী রাখাল মহারাজের অলৌকিক শক্তিতে বিস্ময়

আমি রাখাল মহারাজের গঠনমূলক কাজের কথা বিশেষ মান্য করতাম না, তিনিও সন্ত্রাসবাদী দল ত্যাগের জন্য কোনরূপ পীড়াপীড়ি করতেন না; শুধু বার বার বুঝাতোচাইতেন যে, কাজটা খুব হিতকর নয়। এইভাবে দিন চলছিল, আমি সন্ত্রাসবাদী দলের কাজ করে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একটি ঘটনা ঘটে :—

দমদম ডাকাতির পরের দিন আমার উপর তের প্যাকেট কার্তুজ লুকিয়ে রাখার ভার পড়েছিল। আমি কার্তুজের প্যাকেটগুলি নিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে ভাটপাড়ায় চলে যাই; কিন্তু সেদিন অন্যান্য দিনের মতো শ্যামনগরের কাছাকাছি মাঠে একটি জালার ভিতর ঐগুলি লুকিয়ে রাখার কাজ করে উঠতে পারিনি। কারণ বাড়ি পৌঁছবার পরই আমাদের কোন এক সহকর্মী এসে খবর দিল, 'আজ ভোর রাত্রিতে খানাতল্লাসি হবেই; সাবধান!' লোকটির কথা শুনে আমি এক নিভৃত স্থানে কার্তুজগুলো অবিলম্বে সরিয়ে রাখি। সেদিন শেষরাত্রিতেই পুলিশ এসে বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং আমি গ্রেপ্তার হই। প্রায় ভোরবেলা খানাতল্লাসি শেষ হয়। পুলিশ আমাকে কলিকাতার এক জনবিরল স্থানে ইলিসিয়ম রোতে কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশের বিখ্যাত আড্ডায় নিয়ে যায়। ইলিসিয়ম রো বর্তমানে লর্ড সিংহ রো নামে পরিচিত।

গোয়েন্দা-পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এইস্থানে পৌঁছানোর পর আমাকে একথা সেকথা বলে পাঁচরকম জেরা শুরু করে দিলেন আমার সহকর্মী বিপ্লবীদের সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার মতলবে। কিন্তু আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু কথা বের করতে সক্ষম হলেন না। আমি কেবল রাজ-সাক্ষী বিজয়ের উপর রোষভরে কিছু মিথ্যা দোষারোপ করেছিলাম; বলে-ছিলাম যে বিজয়ই আমাকে কল্পনা-রঙিন উৎসাহ দিয়ে ভুলিয়ে সন্ত্রাস-

বাদের পথে টেনে এনেছে। আমি খুব ভেবেচিন্তে কাজটা করার সময় ও সুযোগ পাই নি। এই কারণে এবং দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বুঝে পুলিশের বড় বাবুরা আমার প্রতি কিছুটা নরম হয়ে অন্য সন্ত্রাসবাদীদের চেয়ে আমাকে একটু কম পীড়ন করেছিলেন। আমার ওপর খুশী হওয়ার আর একটি কারণও ছিল। তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন বিজয় যে পুঁটলিটি দিয়েছিল, সেটি কোথায়। আমি তখন সরাসরি উত্তর দিয়েছিলাম যে, ঐটি আমাদের ঠাকুরঘরের কাঠের সিঁড়ির পাশে একটি ভাঙা তোরঙ্গের মধ্যে রয়েছে, খানাতল্লাসির সময় অনবধানতাবশতঃ ওটির উপর পুলিশের নজর পড়েনি। তখনই একটি পুলিশের লোক ছুটল ভাটপাড়ার দিকে ঐ পুঁটলি খুঁজে নিয়ে আসতে। লোকটি যখন ফিরে এল তখন দেখা গেল পুঁটলিতে বিপজ্জনক কিছু নেই; সন্ত্রাসবাদীদের একটি কোড-মেশিন—সাঙ্কেতিক আওয়াজ তোলার যন্ত্র—এর ভিতরে রয়েছে। পুলিশ অফিসাররা এতেও আমার ওপর আরও সন্তুষ্ট হলেন, ভাবলেন—আমি আনাড়ি, মোটেই ততটা দুর্দান্ত নই। এজন্য সন্ত্রাসবাদী কয়েদি হিসাবে পুলিশের হাতে আমার যন্ত্রণার অনেকখানি লাঘব হয়েছিল। যা হোক, আমাকে দীর্ঘদিন বন্দী-জীবন কাটাতে হয় নি। অবশ্য যতদিন পর্যন্ত আমাদের দলের বাকি এগার জনের সকলে ধরা না পড়েছে ততদিন হাজত বাস করতে হয়েছে। যখন পুলিশের কর্তারা বুঝলেন যে, বিজয় আর আমি ধরা পড়েছি এবং অবশিষ্ট এগারজনকে গ্রেপ্তার করায় আমাদের সমগ্র দলটিকে গ্রেফতার করা হল, তখন তাঁরা নিশ্চিত হলেন।

এমন সময় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। এর ফলে আমার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। একদিন পুলিশের অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার নলিনী মজুমদার মশায় তাঁর খাসকামরায় আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হলে আমার দিকে সদয়-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ওহে ছোকরা, তুমি তো সন্ত্রাসবাদীদের দলে মিশে ভুল করেছ। তোমাকে দেখে তো মনে হয় না—হিংসাত্মক কাজের প্রবণতা তোমার মধ্যে আছে, তুমি ধ্বংস করবার ছেলে তো নও। আমার কথা শোনো, তুমি স্বামীজি-নির্দেশিত গঠন-মূলক কাজে লেগে যাও। তিনি যে গ্রাউণ্ড প্রিপারেশনের কথা বলেছেন তা অতিশয় মূল্যবান ও দূরদর্শিতামূলক; যদি একাজ কর তাহলে তুমি দেশের মঙ্গলজনক অনেক কাজ করতে পারবে। হিংসায় এবং সন্ত্রাসে দেশের স্বাধীনতা লাভ হবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়! আমার বিশ্বাস

গঠনমূলক কাজ ও সেবাব্রতের মধ্য দিয়ে যথার্থ স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর হবে।' আমি তাঁর মুখ হতে একথা শুনে মুগ্ধ হই ; কারণ শ্রদ্ধেয় রাখাল মহারাজও আমাকে অনুরূপ বাক্যে উপদেশ দিতেন। নলিনীবাবু প্রসঙ্গত আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, যদি আমি সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতে স্বীকৃত হই, তবে তিনি আমাকে ছেড়ে দেবেন। কোনোরূপ হিংসাত্মক কাজ করব না কিন্তু বিপ্লবী দলের সহকর্মীদের সহিত মেলা-মেশা করব এবং হৃদ্যতা বজায় রাখব, এরূপ শর্তে নলিনীবাবু রাজী হলেন আর আমি ছাড়া পেলাম। নলিনীবাবুর ঔদার্যে সত্যই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। রাজ-রোষ-মুক্ত হয়ে পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর আমি দেশে ভাটপাড়ায় চলে এলাম।

ভাটপাড়ায় এই সময় তিন-চার মাস অবস্থান করি এবং আমার পিতার মাতুল শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করি। তারপর বেলুড় মঠে সাধু হবার সংকল্প নিয়ে চলে যাই।

বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী জীবন ও দীক্ষা গ্রহণ

মাস দুই-তিন সন্ন্যাসেচ্ছু হয়ে বেলুড়ে বাস করার পর কাশী অদ্বৈতাশ্রমে আমাকে প্রেরণ করা হয়। দুই-চার মাস অদ্বৈতাশ্রমে থেকে আবার বেলুড়ে ফিরে আসি। অদ্বৈতাশ্রম থেকে ফিরে এসে দেখলাম অনঙ্গ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাস নিয়েছেন আর হারু ব্রহ্মচারীই রয়ে গেছেন। এর কিছু দিন পরে পশুপতি ব্রহ্মচারী হবার ইচ্ছায় চিরদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করে মঠে চলে এলেন। মাতার জীবিতাবস্থায় তিনি অসহায়া মাকে একা ফেলে চলে আসতে পারেন নি। এখন মাতার পরলোকগমনে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বনের পথে তাঁর আর বাধা রইল না। স্বর্গতা জননীর শ্রাদ্ধ শান্তি ইত্যাদি পারলৌকিক কর্ম সম্পাদনান্তে এবং নগদ এক লক্ষ টাকা যা মায়ের ছিল তার সদ্ব্যয়ের ভাল ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত মনে তিনি মঠে আশ্রয় নিতে এলেন। এঁরা আমার সঙ্গী হলেন। আমরা নবাগত ছিলাম। সকল নবাগতদের নিয়ে অনঙ্গ মহারাজ শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা করতেন। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ স্থায়ী ভাবেই তখন বেলুড়ে থাকেন। আর শ্রদ্ধেয় বড় মহারাজ (রাখাল মহারাজ) বাগবাজার বলরাম মন্দিরে এবং পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ মায়ের বাড়িতে মুখার্জী লেনে লীলাপ্রসঙ্গ লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এ কারণে পূজনীয়

মহাপুরুষ মহারাজের সান্নিধ্যে এসে মাতৃসুলভ কোমল স্নেহের পরশ লাভের পরম সৌভাগ্য আমার প্রতিদিনই হত। শ্রদ্ধেয় স্বামী শুদ্ধানন্দ (সুধীর মহারাজ), জ্ঞান মহারাজ ও কৃষ্ণলাল মহারাজের স্নেহেও ধন্য কম হইনি। প্রভু মহারাজ, দেবেন, মহারাজ, সনৎ মহারাজ—এঁরাও আমাকে খুবই ভালবাসতেন। শ্রদ্ধেয় গোঁসাই মহারাজের ঋণ অপরিশোধ্য, তিনি অনুক্ষণ আমার উপর সস্নেহ দৃষ্টি দিতেন এবং সকল কাজে সহায়তা করতেন, আমার সুখ-সুবিধার প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ নজরও রাখতেন।

এই সময়ে বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের বাসস্থানের জন্য ঘরের খুব অভাব ছিল। তাই গঙ্গাতীরের অতি নিকটবর্তী পুরাতন পাকাবাড়ির অনেকটা দূরে পশ্চিমদিকে বাগানের এক অংশে সংসারত্যাগী মঠবাসীদের জন্য দশ-বার জনের বাসোপযোগী একখানি টিনের চালাঘর তৈরি করা হয়। গোঁসাই মহারাজের সান্নিধ্য লাভের আশায় আমি ঐ ঘরে থাকতে ইচ্ছুক হই। আমার আশা পূর্ণ হল, গোঁসাই মহারাজের শয্যার পাশেই একটি চৌকির উপর আমার বিছানা পাতলাম।

তখন বেলুড় মঠে একমাত্র রান্না করার ঠাকুর ছাড়া কাজকর্ম করার লোক বড় একটা ছিল না। সুতরাং সাধু, ব্রহ্মচারী—সকলকেই কিছুটা কাজের দায়িত্ব বহন করতে হত। ঠাকুর-প্রণাম, জপ-ধ্যান ইত্যাদি নিত্যকরণীয় ধর্মকর্ম যথানির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করে আমরা বেশ খানিকটা অবসর পেতাম, ঐ অবসরে আমাদের উপব অর্পিত কর্তব্যটুকু সানন্দে সেরে নিতাম। লেখা পড়ার চর্চা অনঙ্গ মহাবাজের খুব প্রিয় ছিল। তিনি প্রত্যহ আমাদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করতেন, এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন রকম শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। একে আমরা নাম দিয়েছিলাম 'অনঙ্গ মহারাজের ক্লাস।' অনঙ্গ মহারাজের প্রাত্যহিক ক্লাশে শাস্ত্রেব যেসব কথা ঠিকঠিক বুঝতে পারতাম না, রাত্রে শোবার আগে গোঁসাই মহারাজের সঙ্গে পুনরালোচনা করে সেগুলির মর্মার্থ যথেষ্ট পরিষ্কার করে বুঝে নিতাম। এই ভাবে শাস্ত্রপাঠ শুনে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরণের ফলে আমার ধর্মপিপাসা আরও তীব্র হয়ে উঠে। এখন আমার মনে হল যে সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশের আমি অধিকারী হয়েছি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস অপরাবিদ্যাব অথবা পরা-বিদ্যার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য একজন সুদক্ষ পথপ্রদর্শক, শক্তিমান গুরুর প্রয়োজন। এজন্য আমি ব্যাকুল ভাবে গুরুকরণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। একমাত্র গোঁসাই মহারাজই দীক্ষার জন্য আমার মনের আকুতি ও ব্যাকুলতা

বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরই আন্তরিক ও সহৃদয়তাপূর্ণ চেষ্টায় ও উদ্যমে আমার দীক্ষা গ্রহণের সুন্দর সুযোগ লাভ হয়। এই সময় এক অভাবনীয় সুযোগ ঘটে। শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য দেশ থেকে বাগবাজারে ১নং মুখার্জি লেনে নিজ বাটীতে আসেন। অসুস্থতার দরুন এই সময়ে তিনি কাউকেও দীক্ষা দিতে চাইতেন না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গোস্বামী মহারাজের সহায়তায় আমি তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হই। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র দানীবাবুই মাত্র ঐদিনে আমার দীক্ষার পর দীক্ষা পেয়েছিলেন। দীক্ষা নেবার পর আমি কিছুকাল বেলুড় মঠেই থাকি। তখনও আমাদের যথানিয়মে অনঙ্গ মহারাজ শাস্ত্রের পাঠ দিয়ে চলছিলেন।

যুগাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

গীতায় আছে, ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হলে শ্রীশ্রীভগবান মর্তালোকে নরদেহে আবির্ভূত হন। অবতারবাদ সনাতন হিন্দুধর্মে, সুপরিচিত। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ মহাপুরুষেরা যুগে যুগে পূর্ণব্রহ্মের অবতার-রূপে পূজিত হয়ে আসছেন। অবতার পুরুষেরা নূতন আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ভূমণ্ডল প্লাবিত ও আলোকিত করে পাপ গ্লানি দূর করে দিয়ে নবধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন, নীতি ও সত্যে সমুন্নত নবজীবনের উদ্বোধনে।

মহামনীষী বিবেকানন্দের মনে এই ধারণা ছিল যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং পরমেশ্বর পূর্ণ-ব্রহ্মের অবতার। 'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থে তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় নিজ গুরুর মহিমা বর্ণনা করেছেন। ভক্তবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একটি গানে লিখেছেন,—"ভূতলে অতুলমণি, কে এলিরে যাদুমণি, তাপিত হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে"।

স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান প্রধান ভক্ত ও শিষ্যদের এই বিশ্বাস ছিল যে, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব যুগাবতার—পরমপুরুষ, তিনি মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও অন্যবিধ মহৎ কল্যাণব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে মঠ ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তার কেন্দ্রীয় প্রাণপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সেবাব্রত কর্মযোগ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর চোখে নিষ্ফল, অর্থহীন।

আমি সন্ন্যাসী হবার আগ্রহ নিয়ে বেলুড় মঠে ঢুকেছিলাম। সাধারণ দেশসেবকগণের মতো কেবল দেশের মঙ্গলচিন্তায় ও মঙ্গলকর্মে আমার প্রযত্ন

প্রয়াস পর্যবসিত হবার কথা নয়। কর্মযোগের মাধ্যমে আত্মাকে লাভ করা; আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করাই আমার মূল উদ্দেশ্য। এই জন্যই স্বামীজির মহৎ সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত হলেও তাঁর উপদেশ ও আদর্শের সারবস্তুটি অন্তরে গ্রহণ করেছিলাম।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে নিয়ে ধর্মকর্মের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছিলাম। বেলুড় মঠ ও কাশী অদ্বৈতাশ্রমে ব্রহ্মচারী জীবন যাপনকালে প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্তে যথারীতি ও শুচিশুদ্ধ হয়ে পরমারাধ্য ঠাকুরকে স্মরণ মনন করতাম, তাঁকে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে প্রণাম করতাম আমরা ব্রহ্মচারীদল মিলে। সুতরাং স্বামীজির আদর্শে জীবন গড়ে তুলবার স্পৃহা ও আগ্রহ নিয়ে বেলুড় মঠে প্রবেশ যদিও করেছিলাম এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে আমার কোনও প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, তথাপি তাঁর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমার ধর্মজীবনের কথা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

বেলুড় মঠ ত্যাগ ও গৃহে প্রত্যাবর্তন

তখন বৈরাগ্য-জীবনের সবেমাত্র শুরু হয়েছে, এমন সময় একদিন নগেন মহারাজ (বড়) শ্রদ্ধেয়া মাতাঠাকুরানীর কথা আমার পিতাকে জানান এবং আমাকে ঘরে ফিরবার উপায় বলে দেন। বড় নগেন মহারাজ কোন কার্যোপলক্ষে পিতার অফিসে গিয়েছিলেন, সেখানে প্রসঙ্গক্রমে আমার কথা ওঠে। পিতার এবং মাতার মোটেই ইচ্ছা ছিল না যে, আমি গৃহছাড়া হয়ে চলে যাই। আমার সন্ন্যাসী হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের কিছুমাত্র অনুমোদন ছিল না। পিতা নগেন মহারাজের সঙ্গে এই নিয়ে কিছু আলোচনা করেন। তারপর নগেন মহারাজের পরামর্শ অনুসারে পিতা পূজনীয়া মাতাঠাকুরানীর কাছে মুখার্জী লেনে চলে যান। শ্রদ্ধেয়া মাতাঠাকুরানী আমার দীক্ষাদাত্রী গুরু, তিনিই কেবল আমাকে সংসারে ফিরিয়ে দিতে পারেন—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই পিতা পূজনীয়া মাতাঠাকুরানীর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। পিতা তাঁকে বলেছিলেন, আমি গৌরকে সংসারে ফিরিয়ে নিতে চাই। ডাক্তারি পড়ার দিকে ওর ঝোঁক, তার এই আশা ভঙ্গ হওয়াতেই, বোধ হয়, সে ক্ষোভে সংসার ছেড়ে চলে এসেছে। আমি যে প্রকারে হোক তাকে ডাক্তারি পড়াবই; যদি সে আমার সঙ্গে চলে আসে তার আশা অপূর্ণ থাকবে না। আর তার মাও কেঁদে কেটে অস্থির হচ্ছেন এবং অত্যন্ত কাহিল

হয়েও পড়েছেন; তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ারও প্রয়োজন। আপনি আদেশ করুন—'গৌর ঘরে ফিরে যাক।' পিতার আবেদন মাতাঠাকুরানীর নিকট খুব সমীচীন বোধ হল। তিনি পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আমাকে সংসারে ফিরিয়ে দেবেন। তাই একদিন মাতাঠাকুরানী বেলুড় থেকে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি মুখার্জী লেনে তাঁর সমীপে উপনীত হলে তিনি আমাকে সংসারে ফিরে যাওয়ার কথা বোঝালেন। বললেন, 'দেখো বাবা, তোমার সংসারে ফিরে যাওয়া উচিত। তোমার বাবা বলেছেন তোমাকে ডাক্তারি পড়াবেন। এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে? তুমি এখানে থেকে আমার সেবা করতে চাইছ; কিন্তু বাবা, কতকাল আর আমি তোমার সেবা নিতে পারব—বল তো? শরীর তো আমার ভেঙে পড়েছে। আমার সন্তানদের সেবা করলেই আমার সেবা করা হল। এবং সেই সেবা তুমি যতকাল ইচ্ছা করে যেতে পারবে ডাক্তার হয়ে ঘরে বসে। ঠাকুর বলতেন, সংসার কেল্লা; সেখানে থেকে নির্বিঘ্নে যুদ্ধ করা যায়। আর তুমি এখানে শাস্ত্রচর্চা করে যে জ্ঞান লাভ করতে চাইছ, সংসারে থেকে এর চেয়েও অনেক বেশি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পাববে। এ ছাড়া তোমার গর্ভধারিণী মাও তোমার জন্য বড় বেশি অস্থির হয়ে পড়েছেন; আহা! নাড়ীছেঁড়া টান তো! গর্ভধারিণীকে সুখী এবং প্রসন্ন করাও তোমার একান্ত কর্তব্য। তুমি সংসারে ফিরে যাও, দেখবে সব দিকে তোমার মঙ্গল হবে।'

তাঁর উপদেশমত আমি কাজ করি। আমি বেলুড়ে গিয়ে যথারীতি কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ জানাই, এবং শ্রদ্ধেয় রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রমুখ বরেণ্য স্বামীজিদের আশীর্বাদ নিয়ে এবং সঙ্গী সাধুদের, বিশেষ করে গোঁসাই মহারাজের, শুভেচ্ছা পেয়ে মঠ ত্যাগ করে দেশে চলে আসি। বেলুড় মঠ থেকে যখন বাড়ি চলে আসি তখন অভিভাবকেরা আমাকে সাধারণ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে চেয়েছিলেন। বিখ্যাত সার্জন ও স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয় আমার পিতামহের ছাত্র ও আমার পিতার সহপাঠী ছিলেন। বেলুড় মঠেও তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ছিল। ঠাকুরদা চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য আমাকে একদিন শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে ডাক্তার কাঞ্জিলাল মহাশয় অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। তিনি আমার

সামান্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শেখার বিরোধী হয়ে বলেছিলেন, 'আমি একে কোয়াক তৈরি করতে চাইনে। এ আগে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যায় বিজ্ঞ ও নিপুণ হয়ে উঠুক, তারপর আমি একে বিশদভাবে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা দিয়ে যথার্থ কৃতী ও পারদর্শী করে গড়ে তুলব।' প্রকৃতপক্ষে কাঞ্জিলাল মহাশয়ের সুপরামর্শে ও প্রেরণাতেই আমি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা শিখতে আগ্রহী হয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীমা ভবতারিণী

আমাদের অখণ্ড বঙ্গদেশ শক্তিসাধনার আদিপীঠ। বড় বড় শক্তি-সাধকেরা এদেশে জন্মেছেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের নাম আজও বাঙালীর ঘরে ঘরে শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করা হয়। কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের কাল থেকে এদেশে বিশেষভাবে শ্যামাপূজার প্রচলন হয়। দেশ জুড়ে বহু শাক্ত-তীর্থ ও শক্তি-পীঠ বিদ্যমান। কালীঘাট প্রভৃতি পীঠস্থানে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মন্দিরে মহাদেবী কালীর নিত্য পূজা হয়। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ তিথিতে, বিশেষতঃ মহালয়া ও দীপান্বিতার দিনে প্রতি অমাবস্যায় দেবী আরাধিতা হন। বাঙালীর কাছে মহাদেবী কালী মাতৃরূপে সমাদৃতা। তিনি অভয়া, ভক্তবৎসলা এবং সকল-অভীষ্টদায়িনী। আদরিনী শ্যামা-মা বাঙালীর হৃদয়ধন। এই জাতির প্রতি তাঁর যে বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ও করুণা রয়েছে, এর বহু প্রমাণ বহু সাধকের জীবনীতে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথীতীরে শ্যামা মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, পুণ্যশ্লোকা রানী রাসমণি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই সুরম্য মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন— ১২৬২ সালের ভাদ্রমাসী পূর্ণিমা তিথিতে মহাসমারোহে মহাদেবী শ্যামা-শুভঙ্করী-ভবতারিণী-মা ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার ভট্টাচার্য মহাদেবীর প্রথম পূজক ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। চতুর্ভুজা মহেশ্বরী ভবতারিণী দেবীর পাষাণময়ী প্রতিমা রৌপ্যগঠিত প্রস্ফুটিত সহস্রদল পদ্মের উপর শয়ান পাষাণময় মহাদেবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা, তাঁর দক্ষিণ পদ অগ্রে প্রসারিত। মা ভবতারিণী চতুর্ভুজা শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালী. তাঁর বাম-দিকের দুইহাতে অসি ও নরমুণ্ড রয়েছে আর দক্ষিণ দিকের দুইহাতে বরাভয় মুদ্রা। এই দেবীপ্রতিমা স্বর্ণ-রৌপ্যের নানা অলঙ্কারে ভূষিতা। শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'কলৌ কালী প্রসীদতি।" দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে এই বচনটি আশ্চর্য-

রূপে সার্থক হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন ভবতারিণী মায়ের পরম ভক্ত শ্রেষ্ঠ উপাসক। শিশুসুলভ সারল্যে, বিশ্বাসে ও তন্ময় ভক্তিশ্রদ্ধায় জগদম্বাকে তিনি একান্ত আপন করে তুলেছিলেন।

নবযুগের মাতৃসাধনার মহিমময় উদ্বোধন হয় গদাধর ঠাকুরের মাতৃ-ভাব-বিহ্বল সাধনার মাধ্যমে। মা ভবতারিণী সচ্চিদানন্দময়ী আদ্যাশক্তি মহামায়া জগদ্ধাত্রী ভুবনেশ্বরী। তিনি সর্বমঙ্গলা-শরণ্যা-শুভা, ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী। তাঁর কৃপায় তাঁর ভক্ত সন্তান ঐহিক সুখভোগ এবং পরমার্থ সিদ্ধি উভয়ই লাভে ধন্য হয়। মহাদেবী ভগবতী ভবতারিণী অতিশয় জাগ্রতা এবং একান্ত দয়ার্দ্র চিত্তা। তাঁর অপার্থিব মহিমা ও বিচিত্র ঐশ্বরিক লীলা দক্ষিণেশ্বরে প্রকট হয়ে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বাস করতেন যে, আমার পরমশ্রদ্ধেয়া গুরুমা সারদামণির মধ্যে করুণাময়ী জগদম্বা ভবতারিণী দেবীর বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে। ভক্তমণ্ডলীও তাঁকে ভগবতীর অবতাররূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। তিনি আমাকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা না দিলেও ভবতারিণী মায়ের পরম ভক্তিমতী উপাসিকা হিসাবেও তিনি আমার পূজ্যা। সর্বমঙ্গলা পরাশক্তি ভবতারিণী মাকে ছেড়ে দিয়ে পারমার্থিক কোন মঙ্গলই সাধিত হবে না বলে আমার বিশ্বাস। এই কারণে আমি এখানে এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম।

মা সারদামণি

শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর সকলেই পরমপূজনীয়া মাতাঠাকুরানীকে ভগবতীর অবতার বলে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কবেন। তিনি যে সাধারণ সাধিকা ছিলেন, এ কথা চিন্তা করাই মহাভ্রম। আমারও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস—বিদ্যালয়ের শিক্ষাদীক্ষা না পেয়েও তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায়, উদার বিচারবিবেচনা-শক্তিতে এবং অতুলনীয় মাতৃকরুণায় মহীয়সী বরেণ্যা। শ্রীশ্রীসারদামণি ছিলেন অন্তর্যামিনী, ভিক্ষার প্রার্থীকে চোখের পলকে একবার দেখে নিয়ে বুঝতে পারতেন তার অন্তরের যথার্থ রূপটি। এইজন্য তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে কেউ কেউ সন্ন্যাসের দীক্ষা পেয়েছেন, আবার কাউকেও সংসারে থেকে ধর্মকর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন।

যজুর্বেদমতে সন্ন্যাসী হবার উন্নত পরিশুদ্ধ মানসিক অবস্থা ও ঈশ্বর-ব্যাকুলতা এবং সুতীব্র বৈরাগ্যই সন্ন্যাসী হবার উপযুক্ত লক্ষণ।

সুযোগ্যা দীক্ষাদাত্রী মাতাঠাকুরানী বুঝেছিলেন যে, আমার অন্তরে বিষয়তৃষ্ণা এবং সংসারধর্মের প্রতি আকর্ষণ সুপ্ত রয়েছে, আমি সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরলাভের জন্য সর্বত্যাগী হতে প্রস্তুত ছিলাম না, সন্ন্যাসের প্রতি ভাবোচ্ছ্বাস-জনিত বাহ্য মোহ আমাকে যতটা আচ্ছন্ন করেছিল গভীর অন্তরের তাগিদ সেইরূপ অকপট ও একাগ্রধর্মী ছিল না। সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভের পর ভোগদশার সম্পূর্ণ খণ্ডন হয়ে গেলে শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় এবং বৈরাগ্যদীপ্ত আত্মচৈতন্যের জাগরণ হয়। আমার এইসব গুণ ছিল না বলেই কৃপাময়ী দেবী আমাকে সংসারে পাঠিযেছিলেন। তাঁর অশেষ করুণার কথা ভেবে আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

পড়াশুনার নূতন উদ্যম ও গিরিধি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ

রাজনৈতিক কারণে গিরিধিতে দশম শ্রেণীতে পড়া অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। পিতা গিরিধিতে আমার পডাশোনার ব্যবস্থা করেন। আমি সেখানে মেজকাকার বাসায় থাকি। মেজকাকা গিরিধিতে এক উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে আমি গিরিধি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ফার্স্ট ক্লাস বা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হই। কাকাই তখন অভিভাবকরূপে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। গিরিধিতে আমি এক বৎসরকাল মাত্র দশম শ্রেণীতেই লেখাপডা করি। মেজকাকার স্নেহ ও যত্নে গিরিধিতে আমার পডাশুনা ভালই চলতে থাকে। গিরিধির বারগাণ্ডা অঞ্চলে কাকার বাসা ছিল, এইখানেই ব্রাহ্ম কলোনির অবস্থান। এই অঞ্চলের আশেপাশে বড় রকমের অভ্র ব্যবসায় চলত। গিরিধির শেষ প্রান্ত দিয়ে ছোট স্রোতস্বিনী উশ্রীনদী বয়ে চলেছে। এই নদীব এপারে খ্রীষ্টান হিল আর ওপারে ঝোপঝাড়ে ভরা কিছু দূরবর্তী খাণ্ডুলী পাহাড়ের দৃশ্য কিছুটা মনোহরণ করত। ভ্রমণবিলাসীরা গিরিধির এইসব নির্জন অঞ্চলে বেড়ানোর শখ চরিতার্থ করতেন। কাকার বাসা থেকে অনতিদূরে বাঙালী ব্রাহ্মদের নববিধান উপাসনা মন্দির ও তার বিপরীত দিকে হিন্দুদের কালীমন্দির, মাঝখান দিয়ে বড় রাস্তা উশ্রীনদী পর্যন্ত সোজাসুজি চলে গিয়েছে। বারগাণ্ডা পল্লীর কিছু দূরে অন্য এক পল্লীতে বাবার সহপাঠী ডাক্তার গোপীবাবু থাকতেন। তিনি বিপদে আপদে দুঃখে দুর্দিনে আমাদের পরম হিতৈষী ও সহায় ছিলেন। তাঁর ওপর ভরসা করেই

পিতা আমাকে গিরিধিতে পাঠাতে সাহসী হয়েছিলেন। এই শহরে সকল দিকে মহুয়া গাছের ছড়াছড়ি। আমগাছ, কুলগাছও দেখা যায়। আর বিত্তবান বড়লোকেরা সখ করে ঝাউ, ইউক্যালিপটস ও পাইন গাছ নিজেদের উদ্যানে রোপণ করতেন। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে মহুয়া ফুলের মোদো গন্ধে সমস্ত সহর ভরপুর হয়ে ওঠে। উশ্রীনদীর পারে ঝোপেঝাড়ে ও পাহাড়ে কখনও কখনও বাঘ দেখা যায়। হায়না প্রায়ই দেখা যায়। তাই শ্বাপদের ভয়টাই এখানে বেশি।

যা হোক, গিরিধিতে থাকার সময় আমার মনের ভাব সাধারণ দশটি তরুণের মতো ছিল না। পড়াশোনা ও ধর্মকর্ম-জপধ্যানের দিকেই আমার বিশেষ ঝোঁক ছিল। আমোদ-প্রমোদ, বিলাসিতা ও হাসি-তামাসা একেবারেই বর্জন করেছিলাম। উশ্রীনদীর তীরে কোনও নির্জন স্থানে কিংবা খ্রীষ্টান হিলের নিঃশব্দ গুহায় বসে প্রত্যূষে ও প্রদোষে জপধ্যান করতাম। সহপাঠী ও অন্যান্য তরুণেরা আমাকে স্বামীজি বলে ডাকত, অনেকে আমার নামও জানত না। আমি সকলের সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা পছন্দ করতাম না। তবুও শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সমাজ-হিতৈষণার কাজে যোগ দিতাম। বারগাণ্ডা পল্লীতে আমাদের একজন শিক্ষকের প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর লাইব্রেরি গড়ে ওঠে। মনে আছে, আমার সহপাঠীরা এবং আমিও এর জন্য অনেক খেটেছিলাম। এ ছাড়া সপ্তাহে সপ্তাহে প্রত্যেক বুধবারে 'আমাদের বর্তমান কর্তব্য কী'—এই নিয়ে উশ্রী নদীর তীরে নিভৃতে আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিতর্কসভা বসত। আমার বন্ধু হেমেন্দ্র রাহা আমাকে জোর ক'রে ঐ বৈঠকে টেনে নিয়ে যেত। তবুও জনকল্যাণের চেয়ে আধ্যাত্মিক চিন্তাই গিরিধির জীবনে আমাকে অনেক বেশি পেয়ে বসেছিল। বেলুড় মঠ ছেড়ে চলে আসার বেদনাও আমাকে গভীরভাবে নৈরাশ্যপীড়িত করেছিল।

গিরিধিতে গ্রীষ্মাবকাশের সময় এক বিচিত্র অনুভূতি আমার মনকে অভিভূত করে ফেলে। গিরিধির বিদ্যালয়ের ছুটি হলে কাকা ভাটপাড়ায় দেশের বাড়িতে প্রতিবারই চলে আসতেন। এইবার গরমের ছুটিতে আমি তাঁর সঙ্গে আসব ঠিক হল। আর বিধিবশাৎ আমার বিদ্যালয়ের ছুটি তাঁর বিদ্যালয়ের ছুটির একদিন পূর্বে হয়ে যায়। কিন্তু আমার প্রাণ দেশের প্রতি মমতায় এত ব্যাকুল হয়ে পড়ল যে, আমি একেবারে ধৈর্যহারা ও অস্থির হয়ে গেলাম। একদিনও গিরিধিতে অপেক্ষা করতে মন মানল না। কাকাকে ধরে বসলাম

ছুটির প্রারম্ভ-দিনেই আমি দেশের দিকে রওনা হব। তিনি অসম্মত হওয়ায় আমি আমার পড়ার ঘরে ঢুকে আবেগে উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগলাম। দেশে থাকতে দেশের প্রতি মমতার প্রগাঢ়ত্ব যে এতখানি তীব্র, তা উপলব্ধি করতে পারিনি। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল—

দেশ!
বাঃ তুমি তো বেশ।
যখন থাকি
তখন ভাবি না,
যত কি ভাবনা এলেই বিদেশ!
তুমি ভালো বাস? না আমি বাসি?
বলো না আমারে
—বলো ভাল ক'রে!
বুঝি গুপ্ত ভালবাসা?
কাছে নিয়ে আসার
তাই এত টান?
না, আছে অন্য কিছু;
যায় পিছু পিছু ছাড়লে?
গোদেশ!

এই প্রথম বোধ হল দেশকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি; বিদেশ বিদেশী, কখনো স্বদেশের মতো আত্মীয় আপন হয়ে উঠতে পারে না।

এর ফলে আমার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে। দেশের প্রতি আমার যে পীড়াদায়ক ক্ষোভ, অভিমান মনে ছিল, তা মুহূর্তমধ্যে অপসৃত হল। মনে মনে ব্রত গ্রহণ করলাম, দেশের সেবা ও মঙ্গলসাধনেই আমি জীবন উৎসর্গ করব। এই প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে আমি আমার কর্মস্থল ভাটপাড়ায় নির্দিষ্ট করলাম। গিরিধি থেকে ছুটিতে এসে যে কয়দিন ভাট-পাড়ার বাড়িতে ছিলাম, সে কয়দিন সংগঠনমূলক কাজের বিষয় নিয়ে বন্ধুবান্ধব ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে কিছুটা আলোচনা করি। অনেকেই আমার কথা শুনে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলেন—অপ্রসন্নচিত্তে সরে পড়লেন। কেউই আন্তরিকতা নিয়ে আমার সহযোগী হতে চাইলেন না। তবুও আমি হাল ছেড়ে দিলাম না। মনে একটু হতাশা এসেছিল বটে, কিন্তু তা এমন কিছু নয়।

তারপর আমার শিক্ষাজীবনের এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়। ছুটি কাটিয়ে গিরিধিতে ফিরে এসে প্রাণপণ আগ্রহে আগামী পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। ঐরকম হাড়ভাঙা খাটুনি ছাত্রজীবনে আর খাটিনি। গিরিধিতে পড়া শেষ করে আমি ডাক্তারি কলেজে পড়ার ঝোঁকে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ি ও পাশ করি।

ঐ সময়ে বিহারে ডাক্তারি পড়ার জন্য কোনো কলেজ ছিল না। তাই পাটনা টেম্পল মেডিকেল স্কুলের ভর্তি-প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার সুযোগ ছাড়িনি। প্রশ্নপত্র অতিরিক্ত কঠিন হওয়ার কারণে যতগুলি ছাত্রকে ভর্তি করে নেবার কথা ছিল, তার অর্ধেক ছাত্রও পাশ করতে পারে নি। ভগবৎকৃপায় আমি আশাতীত বেশি নম্বর রাখতে পেরেছিলাম। সেই কারণে কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি লাভ করে, ডোমিসাইল্ড প্রশ্নে আটকে না পড়ে, ভর্তি হতে পেরেছিলাম।

পাটনা টেম্পল মেডিকেল স্কুল বর্জন ও কলিকাতা ন্যাশন্যাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটে প্রবেশ

টেম্পল মেডিকেল স্কুলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এখন আমি রামনায় পিতার এক বন্ধুর ভগ্নির বাসায় গিয়ে অবস্থান করি। তাঁরা আমার সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মতো মধুর ব্যবহার করতেন। তাঁদের আদরযত্নের কথা আমার স্মৃতিপটে আজও সমুজ্জ্বল রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে আমি পাটনার টেম্পল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হই। কিন্তু বেশিকাল আমাকে পাটনায় চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে হয় নি। ঐ সময় ডিউক অব কনটের আগমন উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের তাড়নায় সমস্ত দেশ জুড়ে উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল ; এর ফলে সহরে নগরে স্কুল-কলেজ বর্জনের মস্ত তাড়া পড়ে যায়। এ কারণে আমিও পাটনার টেম্পল মেডিকেল স্কুল থেকে পড়ার মাঝখানে ইস্তফা দিয়ে চলে আসতে বাধ্য হই।

কাশী অদ্বৈতাশ্রমের প্রধান শ্রদ্ধেয় চন্দ্র মহারাজ ঐ সময় আমার খুব উপকার করেছিলেন। তিনি আমার পাটনা ছেড়ে চলে আসার যৌক্তিকতা ও সুন্দর সুযোগের বিষয় বিবৃত করে বাবাকে একখানা পত্র দিয়েছিলেন। এতে আমার প্রতি পিতার মনোভাব অনুকূল হয়েছিল। তিনি প্রসন্নচিত্তে আমার দেশে ফিরে আসা অনুমোদন করেছিলেন।

দেশে ফিরে আবার আমাকে নূতন করে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে হয়। তখন সবেমাত্র ন্যাশন্যাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটের সূত্রপাত হয়েছে। ডাক্তার সুন্দরী-মোহন দাস, ডাঃ এস. সি. সেনগুপ্ত, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, ডাঃ এস. কে. বোস, ডাঃ এ. সি. উকিল, ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, ডাঃ সতীনাথ বাগচী, ডাঃ বি. সি. ঘোষ, ডাঃ এন. সি. চন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকদের আন্তরিক সহযোগিতায় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের অদম্য আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের মেডিকেল কলেজ থেকে আগত এবং কলিকাতার চিকিৎসাবিদ্যালয় পরিত্যাগী ছাত্র সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচশত ছাত্রকে নিয়ে এই ন্যাশন্যাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটের শিক্ষাকার্য শুরু হয়। ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফিফ্‌থ ইয়ার ক্লাস পর্যন্ত একসঙ্গে খোলা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের অন্যতম নেতা ডাঃ চারু সান্যাল তখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ৫ম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনিও ঐ কলেজ ছেড়ে দিয়ে আমাদের কলেজে এসে ফিফ্‌থ ইয়ার ক্লাসে ভর্তি হন। নিয়মিত পড়াশোনা আরম্ভ হতে বেশ কিছু সময় কেটে যায়—কাবণ তখন প্রচুব ধরপাকড চলছিল।

শ্রদ্ধেয় রাখাল মহারাজের উপদেশে স্বামীজীর আদর্শ সম্বলিত নাগরিক গঠনে সুযোগ ও উদ্যম

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অসহযোগ আন্দোলন চরমে পৌঁছলে ঐ আন্দোলন দমনে তৎপর হয়ে শাসকগোষ্ঠী চরম উৎপীড়ন শুরু করে। ঐ সময় অভিভাবকদের কথামত আমি ভাটপাড়ার বাড়িতে থাকি। সেই সময় আমার ভগ্নীপতি পঞ্চানন ভট্টাচার্য ভাটপাড়া মাইনর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমি তাঁকে অনুরোধ জানাই যে, স্কুলের ছুটির পর কোনও একদিন বিকালে ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছেলেরা যদি স্কুল-বাড়িতে অল্প কিছু সময় অপেক্ষা করে তবে খুব ভাল হয়। তিনি তাঁর দুইজন সহশিক্ষক মহাদেব পাণ্ডে ও নলিনীকান্ত ভট্টাচার্যের সহায়তায় সহৃদয়তাবশতঃ একদিন ছুটির পর ওই দুই শ্রেণীর ছেলেদের আটকে রেখেছিলেন। আমি ঐ ছেলেদের কাছে আবেদন জানিয়ে বললাম—“ভাইগণ! তোমরাও যেমন ছাত্র আমি তেমনই একজন ছাত্র। তোমাদের মঙ্গলকামনা অন্তরে নিয়েই আমি এখানে এসেছি। আমি দেখছি আমাদের অভিভাবকেরা প্রাণপাত পরিশ্রম করেও আমাদের ভরণ

পোষণের ব্যবস্থাই করে উঠতে পারছেন না। আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা দেবার মতো আর্থিক সামর্থ্য ও সময়—এই দুই-ই তাঁদের নিজেদের নেই। এইজন্য প্রকৃত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাদীক্ষার অভাবে আমাদের ক্রমশঃই অধোগতি ঘটছে। পুরুষানুক্রমে এই ভাবে চলতে দিলে শেষ পর্যন্ত আমাদের বংশধরেরা কোন্ অবস্থায় গিয়ে পৌঁছাবে—পরিচয় দেবার মতো অবশিষ্ট কিছু তাদের থাকবে কি? শুধু ভাত-কাপড়ে মানুষ, মানুষ হয়ে উঠতে পারে না, চাই সুদৃঢ় নৈতিক বল ও আত্মশক্তির উদ্দীপনা। এই শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়েই আমি তোমাদের সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করছি তোমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলার উদ্দেশ্যে। নিজেদের শক্তিতে নিজেদের পায়েই আমাদের দাঁড়াতে হবে। অন্য দিকে আমাদের পূর্বপুরুষদের গৌরব ও খ্যাতি অত্যন্ত ম্লান হয়ে এসেছে। এটা ভয়ানক আক্ষেপ ও দুর্ভাবনার বিষয়। এর যথোচিত প্রতিকার আমাদের পৌরুষ ও আত্মত্যাগের দ্বারা করতেই হবে। উঠ, জাগ, এবং সিদ্ধিলাভ না হওয়া অবধি অধ্যবসায় হতে বিরত হয়ো না।

"স্বামীজির এই অমূল্য বাণী স্মরণে রেখে আমাদিগকে আন্তরিক আগ্রহে এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হতে হবে। আমার বিশ্বাস মহৎ বীর্যসহায়ে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তোমাদের মধ্যে যাদের এই ব্যাপারে আগ্রহ ও উৎসাহ আছে, এগিয়ে এসো। আমাদের ভুলভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে সত্যের অন্বেষণ করতেই হবে। ভুলত্রুটির সংশোধন করা অসাধ্য নয়; সত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকলে আমরা অবশ্যই একসময় জয়ী হব। সত্যানুরাগ ও আত্মশক্তির উদ্বোধনই আমাদিগকে প্রকৃত মানুষ করে তুলতে পারে।" আমার কথা প্রায় ৫০-৬০ জন ছেলের অনেকেরই প্রাণে সাড়া জাগাতে পারল না। বক্তৃতার শেষে দেখলাম ১২-১৩টি ছেলে ছাড়া অন্য সকলে সটকে পড়েছে। ঐ বার-তেরটি ছেলে নিয়ে প্রথমে ভাটপাড়ায় আমার প্রতিষ্ঠান রচনার সূত্রপাত। প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয়েছিল 'ছাত্র-সমাজ'।

স্বামীজির দৃষ্টিতে ভারতীয় ভাবধারা ও কর্মাদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মহাবৈদান্তিক। অদ্বৈত বেদান্তের তুঙ্গভূমি থেকে তিনি ভারতীয় সকল শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। এবং তাঁর মহৎ

প্রতিভাবলে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মযোগের অনুপম সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে। বেদ, তন্ত্র, পুরাণ - সমস্ত কিছুর ভাবধারা এক মহৎ উদার সামঞ্জস্যে তাঁর চিন্তায় মিলিত হয়েছে। তিনি এক মহৎ ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ ধর্মমত তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নি। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত— সকল ধর্মমতকে তিনি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন ও মর্যাদা দিয়েছেন। যোগ-সাধনা, ভক্তির পথ, জ্ঞানমার্গ সমভাবে তাঁর কাছে সমাদৃত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মই জীবরূপে প্রকাশ পেয়েছেন। মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্য ব্রহ্মানুভূতি লাভ। এ জন্য ত্যাগ, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সংযম, তিতিক্ষা – সমস্ত কিছু প্রয়োজন। অধিকারী-ভেদে মানুষের সাধনপন্থা বিভিন্ন হয। কিন্তু পরিশেষে সকলেই অখণ্ড নিত্যানন্দ ব্রহ্মচৈতন্যে মিলিত হয়। তিনি ক্লৈব্য ও তামসিকতাকে অতিশয় ঘৃণা করতেন। কর্মোদ্যম, ধৈর্য ও বীর্যবত্তার সহিত সত্যের পথে অগ্রসর হওয়াকে তিনি যথার্থ পুরুষকার মনে কবতেন। তেজস্বিতা, আত্মসংযম এবং জীবে প্রেম সাধকের জীবনে চরম মহত্ত্ব এনে দেয়। তাই তিনি বলেছেন

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু
সর্বভূতে সেই প্রেমময় ॥
বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ॥
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥

কর্মযোগ সম্বন্ধে স্বামীজি বলেছেন, "পরোপকারমূলক প্রতিটি কার্য, সহানুভূতি-সূচক প্রতিটি চিন্তা, অপরকে যে আমরা সাহায্য করি এইরূপ প্রতিটি সৎকার্য, আমাদের ক্ষুদ্র 'আমি'র গরিমা কমাইতেছে এবং ভাবিতে শিখাইতেছে আমরা অতি সামান্য, সুতরাং এগুলি সৎকার্য। এইখানে দেখি জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম একটি ভাবে মিলিত হইয়াছে। সর্বোচ্চ আদর্শ অনন্ত-কালের জন্য পূর্ণ আত্মত্যাগ যেখানে কোন আমি নাই, সবই তুমি (ঈশ্বর)।"

স্বামীজির বাণী থেকে আমরা কর্মযোগের উচ্চতম আদর্শ পাই। ঐহিক সুখভোগ অথবা দেহান্তে স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে পুণ্য কর্মে লোককে তিনি উৎসাহিত করেন নি। নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা তাঁর প্রচারিত কর্মযোগের মূলভিত্তি। বর্তমান ভারতকে নিষ্কামকর্মের অনুপ্রেরণায় তিনি প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম ও দেশের কল্যাণে

আত্মত্যাগের কথা তাঁর কর্মযোগের বাণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে। তিনি আমাদের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হতে শিখিয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এতে ভারতীয় জাতির বিশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।

চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠা

ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটে নিয়মিত পডাশোনার কাজ আরম্ভ হওয়ার পরও আমাকে ভাটপাড়ার দেশের বাড়ি থেকে পুরো একমাস দৈনিক যাতায়াত করতে হয়। এই যাতায়াতকালের একমাসের মধ্যে রামমোহন ভট্টাচার্য নামে প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন-পড়ুয়া যে এক ছাত্র ছিল, আমার অনুপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের ভার ও দায়িত্ব তার উপর দিয়েছিলাম। বার-বাড়ির যে ঘরখানি ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারেব জন্য ছেড়ে দিয়ে-ছিলাম, সে ঘব নিয়মিত খোলা, বন্ধ করা এবং ছাত্রগণের আচরণ, উন্নতি ও অবনতি এবং সুবিধা-অসুবিধার কথা দৈনন্দিন বোজনামচায় লিখে রেখে সপ্তাহের শেষে সে আমাকে দেখাবে—এবকম নিয়মও করেছিলাম। তাই একমাস পরে আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় মাতুলালয়ে এসে অবস্থান করতে পারি। তখন দাদামহাশয় পরলোকগমন করায় বাড়ি শূন্য ছিল, দিদিমা ও মাতুলানী শিশুপুত্রসহ ডোমজুড়ে মামাদের দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। বাড়িতে আমি একা থাকতাম এবং প্রায় পাঁচ বৎসর আমি নিজে হাতে রেঁধে খেতে বাধ্য হয়েছিলাম। অবশ্য ভাড়াটে বলাইয়ের মা মাঝে মাঝে তরকারি দিয়ে আমার তৃপ্তিবিধানের চেষ্টা করতেন। তা ছাড়া পিতাও আমার জন্য ভাটপাড়া থেকে দুধ, ছানা, সন্দেশ, ফল ইত্যাদি অফিসে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে এসে ১নং হ্যারিসন রোডে (মহাত্মা গান্ধী রোড) ডাঃ বিপিন চাটুজ্জের ঔষধালয়ে রেখে দিতেন। রাত্রে রান্নার সময় নষ্ট না করে আমি মায়ের পাঠানো ঐ খাবারগুলি খেয়ে রাত্রের আহার সেরে নিতাম। বরাবর পরীক্ষার সময় কিছুদিনের জন্য হোস্টেলে গিয়ে থাকতাম।

চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নকালেও আমি প্রতি সপ্তাহের শেষে ভাটপাড়া চলে যেতাম। ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হতে দেখে ছাত্রদের বয়স অনুপাতে শ্রেণীবিভাগ করে দিয়েছিলাম। ইনফ্যাণ্ট ব্যাচ বা শিশুদল, জুনিয়র ব্যাচ বা কিশোরদল ও সিনিয়র ব্যাচ বা তরুণদল। ছয় বৎসর থেকে দশ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত 'শিশু বিভাগে', এগার থেকে তের

বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত 'কিশোর বিভাগে' এবং চোদ্দ থেকে যোল বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত 'তরুণ বিভাগে' বা দলে রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম।

যে-সকল স্কুলের ছেলেরা আমার ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল, গ্রামের সর্বসাধারণের তারা প্রিয়পাত্র ছিল না, অকারণে লোকে তাদের টিটকিরি বিদ্রূপ করত; এমন কি স্কুলের শিক্ষক মহাশয়েরাও ছুতো পেলেই তাদের ছাত্রসমাজের নাম করে আহত পীড়িত করতেন। প্রথম প্রথম গ্রামবাসীরা এবং বুদ্ধিমান শিক্ষকেরাও আমার উদ্দেশ্য এবং প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্য উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি। সকলেই ছাত্রসমাজের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেছেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে এড়িয়ে চলেছেন।

এর প্রতিকারের জন্য একটি উপায় উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়েছিল; আমার ছাত্র-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছেলেরা স্কুলের পাঠ যদি ভালরূপে আয়ত্ত করে পরীক্ষায় উত্তম ফল লাভ করে, তবে নিন্দা বিদ্রূপ ক্ষান্ত হতে পারে। এইজন্য আমি তাদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করতাম। কিন্তু কেবল মুখের কথায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, সুতরাং আমি উদ্দীপনা বৃদ্ধির মানসে, যে যে ছেলে প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে শ্রেষ্ঠ ও স্কুলের ক্লাশে সর্বাপেক্ষা কৃতী তাদের স্পেশাল স্টুডেণ্ট আখ্যা দিয়ে তাদের মধ্য থেকে মনিটর বা ছাত্র-প্রধান পদে নিযুক্ত করতাম। শিশুশ্রেণী, নিম্নকিশোর শ্রেণী ও উচ্চকিশোর শ্রেণীতে নিরত ছেলেদের প্রত্যেক দশজনের মধ্য থেকে একজন উত্তম ছেলেকে মনিটর পদ দেওয়া হত। আর প্রত্যেক মনিটর কিছু কর্তৃত্বের অধিকার পেয়ে তার অধীন নয়জন সহকর্মীদের উপরে ন্যস্ত কাজগুলি পরিচালনায় নির্দেশ দান ও সাহায্য করত।

এই নূতন ব্যবস্থায় দেখা গেল ছেলেদের উন্নত হবার ঝোঁক খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্পকালের মধ্যে পড়াশুনা থেকে শুরু করে সবদিকেই তারা বেশ কিছু উন্নতিও করেছে। ক্লাসের প্রাত্যহিক পাঠ তারা নিত্য নিয়মিত ভালভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া ইতিমধ্যে শিষ্ট ও বিনিত ব্যবহার এবং নিয়মানুবর্তিতা খুবই চমৎকার অভ্যাস করে ফেলেছে। সবচেয়ে বেশি আনন্দের বিষয় এই যে, ছেলেদের গুণপনার স্বীকৃতিস্বরূপ ভাটপাড়া মাইনর স্কুলের শিক্ষকেরা প্রতি ক্লাসের প্রথম বেঞ্চিখানি 'ছাত্র-সমাজের বেঞ্চি' নামকরণ করে দিয়েছিলেন। এত অল্পকালের মধ্যে এইভাবে শিক্ষক মহাশয়দের স্নেহধন্য হতে পেরে ছেলেরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল আর স্বামীজির এই সত্যবাণীটি অন্তরে উপলব্ধি করে নিতে



অমরকৃষ্ণ পাঠশালার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যোক্তাগণের সঙ্গে সভাপতি

পেয়েছিল, 'শুভকর্মে শুভ, মন্দে মন্দফল / এ নিয়ম রোধে নাহি কারো বল।' আমার প্রতিষ্ঠানের ছেলেরা তাই তাদের সেই প্রচেষ্টায় নিরলস হয়ে প্রতি ষান্মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রশংসনীয় উত্তম ফল করে চলেছিল। এটা ছাত্রসমাজের ছেলেদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। তাদের এই সব বিষয়ে উন্নত হবার আগ্রহ ও উদ্যম স্কুলের শিক্ষক, গ্রামবাসী, এমনকি অভিভাবকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ছাত্রসমাজের ছেলেদের এই অদম্য উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কার্যকলাপে ভাটপাড়াবাসী সকলেই অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন।

গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁরা প্রথম থেকে ছাত্র-সমাজ সম্বন্ধে উৎকট বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এসেছিলেন তাঁরাও এখন নিজেদের ভুল সংশোধন করে নেন। আর নিয়মানুযায়ী চলার প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর করে তাঁদের ছেলেদের ছাত্র-সমাজে পুনরায় ভর্তি করে দেন। এইসব ছেলেদের এখন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদলভুক্ত হতে কোন বাধা রইল না। এর ফলে ছাত্রসমাজের আয়েরও এক নূতন পথ খুলে গেল—রিঅ্যাডমিশন্ ফি নিতে শুরু করলাম।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছাত্র-সমাজের সুখ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ায় পার্শ্ববর্তী গ্রাম হতে তো বটেই, দূরের গ্রামগুলি থেকেও ছাত্র-সমাজের শাখা খোলার জন্য অনেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ আমাকে জানালেন।

সহোদরপ্রতিম কালিদাস ঘোষালের আগ্রহে মাদ্রালে যে শাখা ছাত্র-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই শাখা-প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা দেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান স্বনামধন্য শ্রীপঞ্চানন ঘোষালকে পেয়েছি।

ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী

ছাত্রসমাজ বিদ্যায়তনে জীবিকা উপার্জনের উপযোগী স্বাবলম্বন শিক্ষার ব্যবস্থা যথাশক্তি করা হয়েছিল। বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে শ্রম-মূলক শিক্ষার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে ছেলেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে উন্নত এবং শ্রমনিষ্ঠ, কর্মপটু সেই সঙ্গে নিয়মানুবর্তী এবং দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলার আন্তরিক প্রবল চেষ্টা চলছিল। ছাত্র-সমাজ প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট দুই ঘণ্টার মধ্যে চরকাতে সুতাকাটা, বাগান তৈরি, গ্রন্থাগার চালনা, সমবায় পদ্ধতিতে ছোটখাট কারবার, হাডুডুডু খেলা, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়ে প্রথম অবস্থায় ছাত্রসমাজের সকল শ্রেণীর ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হত। তারা ঐ

সময়ের মধ্যে অবসরের সুযোগ করে নিয়ে মহাপুরুষদের মাহাত্ম্যপূর্ণ জীবনী পাঠও করত। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার প্রারম্ভে গীতার নিম্নলিখিত স্তোত্রের এই অংশটুকু পাঠ করা হত। একাদশ অধ্যায়ে ভক্তি-প্রণত বিহ্বল অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ স্তব করছেন :—

স্থানে হৃষীকেশ ! তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশোদ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ ! গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত ! দেবেশ ! জগন্নিবাস ! ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্বত এব সর্বঃ।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥
পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব !॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসিদেব সোঢ়ুম্॥
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব ! রূপং প্রসীদ দেবেশ ! জগন্নিবাস !॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈবরূপেন চতুর্ভূজেন সহস্রবাহো ! ভব বিশ্বমূর্তে !॥

সকল শ্রেণীর ছেলেরা একসঙ্গে অর্জুনকৃত এই উদ্দীপনাপূর্ণ গম্ভীর স্তব সমস্বরে পাঠ করে পরমেশ্বরকে প্রণামান্তে ভগবৎভাবে বিভোর হয়ে নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে হাত দিত। আর প্রতি রবিবার সকালে বাড়ির পড়া তৈরি করে ছেলেরা সকলে মিলে গ্রামে বেরিয়ে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে আনত। গ্রামের দুঃস্থ অসহায় লোকের মধ্যে ঐ চাল বণ্টন করে দেওয়া হত।

এ ছাড়া অপরাহ্ণে গ্রামের কোন সুপণ্ডিত চরিত্রবান শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হত। রবিবাসরীয় সভায় তিনি সকল শ্রেণীর ছেলেদের মঙ্গলজনক উপদেশ দিতেন। তাঁর এই উপদেশ

প্রয়োজন অনুসারে ছেলেদের জীবনে বাস্তব রূপ নেয়—এই ছিল আমার একান্ত ইচ্ছা। কেউ উপদেশ পালনে অবহেলা করছে কিনা সেই বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা হত অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ছাত্রদের সহায়তায়। নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ছাত্রদের জীবনে প্রয়োগের ব্যাপার নিয়ে ছাত্রসমাজের সভায় যথেষ্ট আলোচনা ও অনুসন্ধান চলত। কিছুদিন পরে আবার কোন বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিকে আহ্বান করে এনে বক্তৃতা দেওয়ানো হত। প্রতিষ্ঠানে সময়নিষ্ঠা, সুশৃঙ্খলা, বিলাসিতা বর্জন, পরিবার-জীবনের ছোটবড় প্রতিটি কর্তব্য পালনে তৎপর ও অবহিত হওয়া, ছাত্রদিগকে একান্ত যত্ন ও আগ্রহের সহিত শেখানো হত। পিতামাতা গুরুজনকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা, তাঁদের বাধ্য হয়ে চলা এবং নিষ্ঠার সহিত ছাত্রজীবনের সকল কর্তব্য পালন, নীতিধর্ম পালন সকল ছেলের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। কারণ চরিত্রগঠন, নীতিধর্ম পালন, শৃঙ্খলারক্ষা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতিশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং স্বাবলম্বিতা শেখানো, দেশের, দশের ও সমাজের প্রতি কর্তব্যপালনে তৎপর করে তোলাই ছিল আমার প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশীয় ভাবধারায় এবং দেশীয় পদ্ধতিতে আমি ছাত্রদের জীবন গড়ে তোলার পথ নির্দেশ করে দিতে চেয়েছিলাম।

কিছুকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি সবদিক দিয়ে উন্নত হয়ে উঠল। ছাত্র সমাজের ছেলেরা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে লাগল ; তাদের আচার ব্যবহার হয়ে উঠল সুন্দর এবং খেলাধুলায়ও তাদের কৃতিত্ব প্রশংসনীয় ছিল। ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠানটি বড় হয়ে সুনাম অর্জন করাতে গ্রামের একদল লোক গোড়ার দিকে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে এর দুর্নাম রটাতে আরম্ভ করেছিল। এমনকি অতিরিক্ত উৎসাহী কয়েকজন ব্যক্তি আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করিয়েছিল ; কিন্তু তখন গ্রামে সহৃদয় গুণগ্রাহী ব্যক্তির অভাব ছিল না। প্রধানতঃ তাঁদের প্রযত্নে ও চেষ্টায় এবং আমাদের উচ্চ আদর্শ, মহৎ উদ্দেশ্য ও অপরাধহীনতার দরুন আমায় কোন কষ্ট পেতে হয়নি। পক্ষান্তরে বরং আমার প্রতিষ্ঠানের গৌরব ও জনপ্রিয়তাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই অধিকতর উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে প্রতিষ্ঠানের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। প্রতিষ্ঠানটি বড় হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক রকম খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা করা হল। এবং পূর্ণবয়স্কদের নিয়ে কর্মী-সমাজ নাম দিয়ে আর একটি নূতন বিভাগও খোলা হল।

ছাত্রসমাজের গোড়াপত্তন যাদের নিয়ে করেছিলাম সেইসব ছাত্র—গোবিন্দদেব ভট্টাচার্য, রামমোহন ভট্টাচার্য, রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুধাময় ভট্টাচার্য, লালবিহারী ভট্টাচার্য, যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য, ফণিভূষণ ভট্টাচার্য, হরিদাস বন্দোপাধ্যায়, সুশীলকুমার বন্দোপাধ্যায় তারকদাস হালদার, শিবদাস হালদার; সীতাপতি ভট্টাচার্য, পাগলরাম ভট্টাচার্য, সাতুগোপাল দাস, ভবদেব ভট্টাচার্য, সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য, বলরাম ভট্টাচার্য, গৌরচন্দ্র ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য প্রভৃতি তরুণ ছেলেদের আরও কিছুকাল আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সুপ্রভাবের অধীন রাখা সমীচীন বোধ হল।

কর্মী-সমাজ গঠন

সিনিয়র ব্যাচ বা তরুণ দলের ছেলেদের বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত হলে তাদের কাজ দিয়ে আটকানোর উদ্দেশ্যে কর্মী-সমাজের উদ্ভব। ছাত্রসমাজই বৃহদাকারের কর্মী-সমাজরূপে আত্মপ্রকাশ করল। এই কর্মী-সমাজ গঠনে আমার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেশবচন্দ্র রায় আমার একান্ত সহায় হয়েছিল। কর্মী-সমাজ প্রতিষ্ঠানের ভার বিশেষভাবে তাদের উপরই অর্পণ করেছিলাম। ওই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে ঐ দুই বন্ধু আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিল। আমার অনুপস্থিতিতে তারা আন্তরিক আগ্রহের সহিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলী সম্পাদন করত। কর্মী-সমাজেও কয়েকটি নির্দিষ্ট বিভাগ ছিল। তন্মধ্যে সেবা বিভাগটাই ছিল মুখ্য। সেবা বিভাগের মধ্যে ছিল অনাথ ভাণ্ডার, দাতব্য চিকিৎসালয়। এই চিকৎসালয়ে সমাগত রোগীদের ব্যবস্থা ও ঔষধ দান, প্রাথমিক চিকিৎসা, ষ্ট্রেচার ড্রিল, ফার্স্ট'-এড্ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ছাত্রদের অর্জন করতে হত। অনাথ-ভাণ্ডারের জন্য গ্রামের গৃহস্থ-বাড়ি থেকে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ এবং অনেকের কাছ থেকে নগদ টাকাপয়সাও চাঁদা হিসাবে গ্রহণ করা হত।

গ্রামস্থ স্কুলের দরিদ্র ছেলেদের এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আমাদের গ্রামবাসী অনাথ ছেলেদের বইপত্র কেনা ও স্কুলের বেতন দেবার জন্য অনাথ ভাণ্ডারের অর্থ ব্যয়িত হত। স্বগ্রামবাসী দরিদ্রদের মধ্যে কাপড়-চোপড়, চাদর ও বিতরণ করা হত বিশেষ দান হিসাবে। তাঁতশালা, সমবায় সমিতি, পাঠশালা, গ্রন্থাগার পরিচালনা শিক্ষা, ব্যায়াম ও শরীরচর্চা, টিউটোরিয়াল বোর্ডিং, উদ্যান তৈরি, ছাত্রসমাজের কাজকর্ম দেখাশোনা প্রভৃতি বিভাগগুলি

ও খেলাধুলার জন্য মাঠ কর্মী-সমাজের আওতায় ছিল। ক্রমে ক্রমে কর্মক্ষেত্রের প্রসার হওয়াতে বিঘাখানেক জমিসহ একটি বড় বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। 'আদর্শ-ভ্রাতৃ-সমাজ' নাম দেওয়া সম্মিলিত ছাত্রসমাজ ও কর্মী-সমাজ প্রতিষ্ঠানকে ঐ বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। আমাদের প্রতিষ্ঠানে সকল কর্মীই স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করত। কর্মই ছিল তাদের সাধনা। কেবল পাঠশালার শিক্ষকগণ যথারীতি মাসিক বেতন পেতেন। প্রতিষ্ঠানের উচ্চশ্রেণীর ছেলেরা প্রতিষ্ঠানের নিম্নশ্রেণীর ছেলেদের পুরাতন বই-পত্রাদি দিয়ে সাহায্য করত; এছাড়া কেউ পড়া শিখতে এলে তাকে পড়া তৈরির ব্যাপারে সাহায্য করত। এটাই ছিল তাদের একান্ত কর্তব্যের মধ্যে গণ্য।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে ক্রমশঃ ছেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং প্রবল কর্মতৎপরতা দেখা দিল। প্রথমে আমাদের বিদ্যালয়ের নাম ছিল ছাত্রসমাজ পাঠশালা। এটি ছিল কেবল বর্ণপরিচয়ের শিক্ষালয়। আমি এর পরিচালনার ভার দিয়েছিলাম আমার পূজনীয় পিতামহ রামানুজ বিদ্যার্ণব মহাশয়ের উপর। তাঁর সোৎসাহ তত্ত্বাবধানে একজন বেতনভোগী বৃদ্ধ পণ্ডিত যামিনী ভট্টাচায শিশুদের বর্ণপরিচয় করাতেন। এই পাঠশালাই ক্রমোন্নতির ফলে নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হয় এবং অবশেষে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। আমাদের শিক্ষক এবং ছাত্র-সমাজ পাঠশালার সম্পাদক লোকান্তরিত অমরকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নামে এই বিদ্যালয়ের নামকরণ হয় 'অমরকৃষ্ণ পাঠশালা'। এই পাঠশালা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে এখনও সুনাম নিয়েই বিদ্যমান।

আমাদের তাঁতশালাতে কমপক্ষে তেইশখানা বড তাঁত ও একখানা 'গাডা' তাঁত ছিল। ধুতি, গামছা—এই ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি তৈরি করে আদর্শ ভ্রাতৃসমাজের আর্থিক প্রয়োজনের কিয়দংশ মেটানো হত। গ্রামের শিক্ষার্থী ছেলেদের মঙ্গলের জন্যই ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠানের সকল আয়োজন হয়েছিল। ছাত্র-সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যদের প্রতি অলঙ্ঘ্য নির্দেশ ছিল এই যে, যে কোন পাঠেচ্ছু ছাত্রকে জিজ্ঞাসিত হলেই বিনা পারিতোষিকে পড়া দেখিয়ে দিতে হবে। দেশের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি ও অসমর্থ অভিভাবকদের সুবিধার জন্যই এই বিধান প্রচলিত হয়েছিল। ছেলেদের মধ্যে যাতে দলাদলির মনোভাব সংক্রমিত না হয়, সেজন্য আমি নিয়ম করে দিয়েছিলাম যে, তাদের বাড়িতে বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন

ইত্যাদি উপলক্ষে সামাজিক ভোজের আয়োজন হলে অভিভাবকেরা ব্যক্তিগত বিবাদ ও ভেদবুদ্ধি ভুলে প্রতিষ্ঠানের সকল ছেলেকেই নিমন্ত্রণ করবেন; নতুবা নিয়মলঙ্ঘনকারীর পোষ্যকে প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে অধিকসংখ্যক ছেলের শিক্ষার সহায়তার জন্যই পরে 'টিউটোরিয়াল সংস্থা' খোলা হয়েছিল। এই 'বোর্ডিং'-এ ফী বা পারিতোষিক হিসাবে পাঠেচ্ছুরা কিছু দিতে বাধ্য ছিল। ইনফ্যাণ্ট শ্রেণীর প্রত্যেক ছেলেকে সমস্ত বিষয়ে পড়া দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মাসিক পাঁচটাকা নেওয়া হত। এইভাবে সমস্ত পাঠ্য বিষয়ে সাহায্যের জন্য জুনিয়র শ্রেণীর প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রতিমাসে সাড়ে সাতটাকা এবং সিনিয়র শ্রেণীর প্রত্যেক ছেলের কাছ থেকে দশটাকা মাসিক বেতন হিসাবে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কর্মী-সমাজের বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেরাই বিশেষ করে 'টিউটোরিয়াল বোর্ডিং'-এর দিকে নজর দিতেন এবং পড়াশুনা দেখানোব কাজও সম্পন্ন করতেন। প্রত্যেক কর্মীব উপর দশটি কবে ছেলের ভার দেওয়া হত। ইংবাজী, বাঙলা, ইতিহাস, অঙ্ক ইত্যাদি প্রতিটি পৃথক পৃথক বিষয়ের সহায়তা করার দরুণ প্রত্যেক কর্মী দশটাকা পেতেন। পাবিতোষিক হিসাবে যে টাকা তাঁরা পেতেন তাতে তাঁদেব নিজেদের পড়াশোনাব খরচ চালানোর সুবিধা হত।

'টিউটোবিয়াল বোর্ডিং'-এর ছেলেরা প্রতিদিন সব সময় এই স্থানেই থাকত। বিদ্যালয়ে যাওয়াব সময় এখান থেকেই যেত এবং ছুটির পব এখানেই ফিবে আসত। 'টিউটোবিয়াল বোর্ডিং'ই তাদেব একপ্রকাব বাড়িঘর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেরা কেবল সকালে একবাব নিজেব বাড়ির কাজ ও আহারাদির জন্য, এবং বিদ্যালয় থেকে ফিবে এসে বিকালেব জল-খাবারের জন্য ও বাড়ির কোনো দরকাবে আবার নিজগৃহে গমন করত। স্নান, বিশ্রাম, নিদ্রা তাদের 'টিউটোরিয়াল বোর্ডিং'-এর মধ্যেই হত। সকালে ও বিকালে ছেলেরা এইসব কারণে একঘণ্টা করে ছুটি পেত। বিশেষ কারণে কোনো ছাত্রকে অন্য সময়ও কিছুক্ষণের জন্য বাড়ি যাবার অনুমতি দেওয়া হত। সুশৃঙ্খলা ও সময়নিষ্ঠার দিকে কড়া নজর রাখা হত। আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হত না। ছাত্রসমাজে হাডুডুডু, কপাডি ইত্যাদি দেশী খেলা প্রচলিত ছিল। সে সময় যাদবপুর-কসবা অঞ্চলে প্রতি বৎসর ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হত। তখনকার অখণ্ড বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে তরুণ খেলোয়াড়দল ঐ প্রতিযোগিতায় যোগদান করত।

মাসেক কালের বেশি ধরে কপাডি খেলার প্রতিযোগিতা পূর্ণ উদ্যমে চলত। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ প্রতিযোগিতায় ছাত্রসমাজের ছেলেরা প্রতি বৎসরই প্রতিপক্ষ সকল দলকে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ী হত, কেবল উত্তরপাড়ার বেশি বয়সের ছেলেদের সঙ্গে এঁটে উঠত না। এ ছাড়া আহূত হয়েও তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ম্যাচ খেলত এবং বিজয়ী হয়েও ফিরত। ভাটপাড়ার কোনো প্রতিযোগিতায় ছাত্রসমাজ হার মানে নি। স্পোর্টস, জিমন্যাসটিক্স ইত্যাদি দৈহিক ক্রীড়া-প্রদর্শন ব্যাপারেও তারা কম দক্ষ ছিল না। একবার ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক আহূত এক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় ছাত্রসমাজের ছেলেরা তেত্রিশটি বিষয়ের সকলটিতেই বিজয়ী হয়ে তেত্রিশটি পুরস্কারই হস্তগত করেছিল। পরবর্তী কালে কর্মী-সমাজও ঐ ঐতিহ্য সগৌরবে বজায় রেখেছিল।

প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজায় 'আদর্শ-ভ্রাতৃ-সমাজে'র উদ্যোগে ক্রীড়া-উৎসবের এবং নানারকম আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হত। আমার ব্যায়ামগুরু শ্রদ্ধেয় রাজেন গুহঠাকুরতা, বন্ধুবর গোপালচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, কেশবচন্দ্র সেন, উদীয়মান ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষ, সত্যচরণ ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রনাথ রায়, শৈলেন চৌধুরী প্রমুখ ক্রীড়া-কৌশলীদের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় রাজেন গুহঠাকুরতা প্যারালাল বারের খেলা দেখাতেন, গোপাল চৌধুরী একসঙ্গে লম্বালম্বিভাবে গ্রন্থিবদ্ধ তিনখানি মোটরগাড়ির গতি রোধ করতেন, কেশবচন্দ্র মোটা লোহার শিকল অক্লেশে ছিঁড়ে ফেলতেন, বিষ্ণুচরণ ঘোষ পেশীনিয়ন্ত্রণ-কৌশল দেখাতেন, সত্যচরণ ভট্টাচার্য ভারোত্তোলন করতেন, যতীন আর শৈলেনও তাদের নিজস্ব ক্রীড়াকৌশল দেখাত। এই সঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ছেলেরাও অনুরূপ ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করত। বিশেষত শ্রীমান যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য খিলানের ভঙ্গিতে উদর উঁচুতে তুলে অবস্থান করে পাঁচ-সাতজনের যুগপৎ ভারবহনকৌশলটি দেখাত এবং তার ভারোত্তোলনকৌশলটিও অপূর্ব ছিল। প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ছেলেরাও নিজস্ব স্পোর্টস, জিমন্যাস্টিকসের সঙ্গে ফার্স্ট এড, স্ট্রেচার ড্রিল ও অ্যাম্বুলেন্স প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারে নৈপুণ্য দেখিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। দূর-দূরান্তর থেকে আগত শত শত লোক ঐ ক্রীড়া-উৎসবের চমৎকারিতায় বিমুগ্ধ হত। এ ছাড়া রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যারিস্টার ক্যাপ্টেন জে. এন. ব্যানার্জি; বয়স্কাউট ও রোভার্সদের সর্ববঙ্গীয় অধিকর্তা ও গুপ্ত প্রেস প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ব্যারিস্টার এন. এন. ভোস; বঙ্গীয়

প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিরা আমার হিতৈষী রূপে আমাদের প্রতিষ্ঠানে ভাটপাড়ায় শুভাগমন করতেন। তাঁরা উৎসাহ ও উপদেশাদি দ্বারা আমাদিগকে প্রেরণা যোগাতেন। ঐ দিনের সভায পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মতো প্রজ্ঞাবান সহৃদয় লোকমান্য মনস্বী স্থানীয পণ্ডিতেরাই সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন। দেশেব মঙ্গলের জন্য তাঁবা যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করতেন তাব ফলে সমবেত সকলেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে কিছু না কিছু নূতন সত্যের আলোক প্রাপ্ত হত।

আমাদেব প্রতিষ্ঠান স্থাপনেব বহু পূর্ব থেকেই কলিকাতাবাসী পিতাব অফিসেব বন্ধুবান্ধবেবা শ্রীপঞ্চমীব দিন আমোদ-আহ্লাদের জন্য আমাদেব ভাটপাডাব বাডিতে মিলিত হতেন। সরস্বতীপূজাব দিনই তাঁদেব আমাদেব প্রতিষ্ঠানেব কৃতিত্ব প্রদর্শনেব উত্তম সুযোগ—এই ভেবে আমবাও ঐ দিনেই আমাদেব ক্রীডাপ্রদর্শনীব দিন ধার্য কবে নিলাম। অভিভাবক ও মান্যগণ্য ব্যক্তিগণকে আমবা পত্রেব দ্বারা আমন্ত্রণ জানাতাম। পল্লী-গ্রামের গৃহস্থবাডিতে প্রচলিত সবস ব্যঞ্জনাদি গ্রহণেব আগ্রহ-উৎসাহও তাঁদেব মধ্যে বিশেষ ভাবে ছিল। আমাব মাতাঠাকুবানী নানাবকম ব্যঞ্জন স্বহস্তে বন্ধন কবে তাঁদেব তৃপ্তিসহকাবে ভোজন করাতেন। সমস্ত দিন আমাদেব বাডিতে কিছু কিছু গান-বাজনাতে এবং উৎসব-আনন্দে কাটিযে সন্ধ্যাব পব তাঁবা স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হতেন। ঐদিনে সমাগত অতিথিদেব ভোজন-আপ্যায়নেব সমস্ত ব্যযভাব পিতাই চিবকাল বহন কবে এসেছেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানেব শ্রমলব্ধ বা ভিক্ষালব্ধ একটি কপর্দকও এই কার্যে ব্যযিত হয নি।

পুনরাবর্তক জ্বরে গ্রহ-রত্নের আশ্চর্য প্রভাব

কলিকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটে পাঁচ বৎসর কাল আমাকে পড়তে হয়। ঐ সময় আমাকে অসুখ-বিসুখে খুব ভুগতে হয়েছে। ১৯২২ সালে গোড়ার দিকে গরমের দিনে ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সময় আমার পিত্তজ্বর প্রথম শুরু হয়। ঐ জ্বর ৮-৯ মাসের পর অগ্রহায়ণ মাসে শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপশম হত। প্রায় ১৭-১৮ বৎসর কাল ঐ পুনরাবর্তক পিত্তঘটিত জ্বর আমাকে কষ্ট দিয়েছিল। শীতের সময়টা জ্বর কিছু দিনের জন্য উপশম

হলে কিছুটা সাময়িক স্বস্তি বোধ হত। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম ও শরীরের উপর অত্যাচারহেতু হজমশক্তির দৌর্বল্যজনিত এই জ্বর হয়েছে—বহু অভিজ্ঞ হাকিম, বৈদ্য ও চিকিৎসক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। রোগনির্ণয়ে তাঁরা যে অভ্রান্ত ছিলেন—এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

গিরিধি ছেড়ে এসে পাটনা যাবার পূর্বে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি আমি এই সময় একবার স্বামীজির আদর্শ-সম্বলিত স্বদেশীভাবাপন্ন নীতিধর্মী ভারতীয় নাগরিক দল গঠন করা যায় কিনা, তা বুঝে দেখার মানসে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করি। সিমলা পাহাড় থেকে গাড়োয়াল, হরিদ্বার, কনখল থেকে হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, তারপর জয়পুর, আজমীর, পুষ্কর, সাবিত্রী পাহাড়, চিতোর, আগ্রা, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান ও নগর দর্শনান্তে কলিকাতায় চলে আসি। তিন-চারমাস এই ভ্রমণসময়ে থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে অনেক অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কখনও ধর্মশালায়, কখনও স্টেশনের প্ল্যাটফরমে, এমনকি মথুরায় ঘোড়ার আস্তাবলেও আমাকে রাত কাটাতে হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার কোন সুব্যবস্থা কিংবা নির্দিষ্ট সময় ছিল না। অসময়ে স্বল্পপরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করেছি। দুধ ফল ভিন্ন অন্য খাদ্য খাইনি। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ। এই উপলক্ষে অধিক জন-সমাগমের ফলে হরিদ্বারে কলেরার প্রকোপ হয়। এই ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে থেকেছিলাম, কিছু রোগীর সেবা-শুশ্রূষাও করেছিলাম। আমার বিশ্বাস ওইসব কারণ থেকেই আমার জ্বরের উদ্ভব। সুতরাং কলিকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটে ছাত্রাবস্থায় অসুস্থ শরীরে আমাকে দারুণ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। আমার সহপাঠী বন্ধুরা অনেক সময় বই পড়ে আমাকে শোনাত এবং তা শুনে শুনে পাঠ আয়ত্ত করতাম। জ্বরে আমি এতই আচ্ছন্ন হয়ে পড়তাম যে বই খুলে পড়ার সাধ্য আমার থাকত না। এই পুনরাবর্তক-জ্বর-পীড়িত শরীর নিয়েই আমি আমার ছাত্রজীবনের সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছি—যথারীতি ক্লাশে উপস্থিত হয়েছি, মনোযোগসহকারে চিকিৎসক শিক্ষকদের বক্তৃতা শুনেছি—সযত্নে বেডের রোগীদের পরিচর্যা করেছি এবং আউট-ডোর রোগীদের দেখাশোনা করেছি। শুধু তাই নয়, এই পিত্তজ্বরে ভুগে-ভুগেই সবরকম যন্ত্রণা, অস্বস্তি অগ্রাহ্য করে আমি ধৈর্য, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে আমার প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিচালনা করে এসেছি। চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রতিবারই সাফল্য লাভ করেছি—থিওরেটিক্যাল বিষয়ের চেয়ে প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপারেই আমি

ভাল ফল লাভ করতাম। ছাত্রজীবনে কেন, চিকিৎসক জীবনেও আমি পুনরাবর্তক জ্বরে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বিছানায় শুয়ে আলস্যে দিন কাটাই নি। রোগী দেখেছি এবং রোগীদের বাড়িতে যথারীতি গিয়েছি। তখন শরীরে এমনই শক্তি ছিল যে ৪-৫ ডিগ্রী জ্বরেও কাবু হয়ে পড়তাম না। শরীরে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়নি, লোকে তাই আমাকে সুস্থ বলেই মনে করত।

বাংলা ১৩৪৩ সালে গ্রহের প্রভাব সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার পর গ্রহদোষ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি বহু অভিজ্ঞ ও নামকরা জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়েছি। যিনি যখন যে রত্ন ধারণের কথা বলেছেন তখনই আমি সেই রত্ন ব্যবহার করেছি। কিন্তু এইসবে কোন প্রকার সুফল না পাওয়ায় রত্নগুলি খুলে রেখে দিয়েছিলাম। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরাবর্তক জ্বরের দারুণ-পীডায় মৃতপ্রায় হয়ে পড়ি। তখন জীবনের আশা একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলাম। নিরুপায় হয়ে গৃহিণীকে বলি, যেসব গ্রহরত্ন ঘরে আছে সেগুলি নিয়ে আসতে, তিনি আটটি গ্রহরত্ন এনে দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ আব-একটি রত্ন (নীলা) আনিযে একটি পুঁটুলির ভিতব নবগ্রহেব জন্য নয়টি রত্ন দিয়ে শরীরে ধারণ কবি। এতে আশ্চর্য ফল ফলে। পরেব দিনই জ্বর একেবারে উপশম হয়। নবগ্রহের কৃপায় আমি এ যাত্রায় মৃত্যুব মুখ থেকে উদ্ধার পাই। পুনরাবর্তক জ্বরে জীবনে আমি আর কখনও ভুগিনি।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি বিরূপ মনোভাব

পঞ্চম বর্ষে, অত্যধিক পড়াশোনাব চাপে আমার প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ভাটপাড়ার বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হত না। ফাইনাল পরীক্ষার ৩-৪ মাস পূর্বে দুই-তিন সপ্তাহ অন্তর একবার দেশের বাড়িতে যেতাম। এই সময় আমি হস্টেলে থাকতাম। একদিন বাড়ি গিয়ে দেখি যে আমার মা তিনদিন যাবৎ অসুস্থ, জ্বরে চলচ্ছক্তিরহিত। আমাদের গৃহচিকিৎসক গ্রামের ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন যে, 'বি-কোলাই' ইনফেকশন হয়েছে। কিন্তু রোগীর সম্পূর্ণ ভার তিনি নিতে রাজী হলেন না। তিনি আমাদের আত্মীয় ট্রপিক্যাল স্কুলের মেডিসিনের অধ্যাপক ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্যকে দিয়ে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা করাবার পরামর্শ দিলেন। মাসাধিক কাল পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর শিবপদ ভট্টাচার্য মহাশয় স্থির করলেন যে, বি-কোলাই রোগই হয়েছে। তিনি এবং স্থানীয় চিকিৎসক দেবেন্দ্রনাথ রায় ও নৈহাটির

নলিনীমোহন ভট্টাচার্য—এই তিনজন মিলে মায়ের চিকিৎসা করেন। মায়ের এই অসুখের সময়ে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেশবচন্দ্র রায় প্রাণপণে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। আমি তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম বলে মায়ের সেবা-পরিচর্যার কাজ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলাম না। হরপ্রসাদ ও কেশবচন্দ্র মায়ের শুশ্রূষার কাজে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করত, এমনকি আমি কাহিল হয়ে পড়লে তারা আমাকেও মাঝে মাঝে শুশ্রূষা করত। এতে আমি খুব স্বস্তি বোধ করতাম। এই দুই প্রিয় বন্ধুর মহানুভবতার ফলে আমার স্বল্প ক্ষমতা সত্ত্বেও রোগশয্যায় মায়ের যত্ন-শুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটি হয়নি। উভয় বন্ধুর কাছেই আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। উনচল্লিশ দিনের দিন মায়ের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ঐদিন ওই তিনজন ডাক্তারকেই আবার ডেকে আনা হয়। তাঁরা ইনজেকশনের ব্যবস্থা দেন। ইনজেকশন করার ভার আমার উপর পড়ে। আমার মনে হয়েছিল যে, যে-ঔষধ খাওয়ানো হচ্ছে তাই তাঁরা অত্যধিক মাত্রায় ইনজেকশন করার বিধান দিয়েছেন। ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে আমার ঘোরতর আপত্তি ছিল; কিন্তু তাঁরা ব্যঙ্গ-উপহাস করে আমার সে আপত্তি উড়িয়ে দিলেন। এই চিকিৎসকেরা চলে গেলে আমি একটার সময় ইনজেকশন প্রয়োগ করি, আর সেই ইনজেকশন দেবামাত্র মায়ের অবস্থা দারুণ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে পড়ে, তিনি অত্যন্ত ছটফট করতে থাকেন তাঁর বাক্-শক্তি অবিলম্বে রুদ্ধ হয়। এর পর তিনি মাত্র আট ঘণ্টা বেঁচে ছিলেন। মায়ের ঐ নিদারুণ ও মর্মন্তুদ যন্ত্রণার দৃশ্য দেখে আমার পিতামহ ক্ষিপ্তপ্রায় এবং অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়েন। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি তাঁর মন অত্যন্ত বিরূপ হয়ে ওঠে। তিনি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকে আসুরিক চিকিৎসা বলে নিন্দা করেন; অশ্রুপূর্ণ নয়নে পিতামহ আমাকে দিয়ে তাঁর পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, আমি যেন জীবনে আর কখনও অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা না করি—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখে দেশের দশের কল্যাণ সাধন করি।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মাতৃবিয়োগের পর হস্টেলে চলে এসে কয়েক মাস পরে মেডিকেল ইন্স্টিটিউটের ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম বলে তখন ব্রিটিশ সরকার পাস করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বীকৃতি দিলেন না। কিছুকাল পরে পশ্চিমবঙ্গীয় রাজ্য সরকার এল. এম. এস. ডিপ্লোমা দিয়ে মেডিসিন ও সার্জারিতে প্র্যাকটিস করবার জন্য যোগ্য বলে

আমাদের স্বীকার করলেন। প্রথম যুগের মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট হয়ে এল. এম. এস. ডিপ্লোমা পেয়েছিলাম। এল. এম. এস. ডিপ্লোমা এম. বি. ডিগ্রির অগ্রজ।

পূর্বেই আমাদের 'অন্যতম চিকিৎসক-শিক্ষক-ডাক্তার এস. কে. বসুকে অনুরোধ করে রেখেছিলাম যে, আমি তাঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বা সহকারী চিকিৎসক হতে চাই। সুতরাং ডাক্তারি পরীক্ষা পাশের পরই ডাক্তার বসুর সহকারী চিকিৎসক হিসাবে কাজ করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রায় দুই বৎসর আমি ডাক্তার বসুর সঙ্গে থাকি। ঐ সময়ে আমি প্রতি সপ্তাহান্তে একবার ভাটপাড়ায় গিয়ে আমার আদর্শ-ভ্রাতৃ-সমাজের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করতাম। ক্রমে চিকিৎসক হিসাবে দায়িত্বভার বৃদ্ধি পাওয়াতে আমার ও প্রতিষ্ঠানের কাজে দেশে নিয়মিত যাতায়াত কমে যেতে লাগল। মাতার পরলোকগমনে ঐ ব্যাপারে আমার বেশ অসুবিধাও ঘটেছিল, তথাপি প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার সংযোগ অক্ষুন্ন ছিল। আমার বন্ধু হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অনুপস্থিতির সময়ে প্রতি সপ্তাহে কলিকাতায় এসে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি-অবনতি এবং কাজকর্মের বিবরণ ও তথ্যাদি আমাকে জানাতেন। আমি তাঁর সঙ্গে ঐ বিষয় আলোচনা ও পরামর্শ করতাম, আর যাতে প্রতিষ্ঠানের যথার্থ উন্নতি ও অগ্রগতি হয় তা নির্ধারণে যত্নবান হতাম।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক জীবনের আরম্ভ ও বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির সান্নিধ্য

মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট হবার পর প্রায় আড়াই বৎসর কাল অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। পিতৃব্য ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য ও হিতাকাঙ্ক্ষী ডাঃ এ. সি. উকিলের প্রেরণায় আমি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে প্যাথলজি ও ব্যাক্টিরিওলজি বিষয় নিয়ে বিশেষ শিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করি। কারণ তাঁরা আমার মনে আগ্রহ জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি যদি প্যারিস শহরে গিয়ে ঐ দুটি বিষয়ে উচ্চতর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করি তবে জীবনে বহু উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হব। ডাক্তার কেদারনাথ দাস ও ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র সেইকালে স্বনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন। ডাঃ এস. কে. বসুর সঙ্গে তাঁদের সৌহৃদ্য ছিল বলে তাঁরই খাতিরে তাঁর

রোগীদের অপারেশন বা অস্ত্রোপচারের কাজে আহূত ডাঃ দাস ও ডাঃ মিত্র আমাকেও সহকারী হিসাবে গণ্য করতেন। সপ্তাহে কমপক্ষে চার-পাঁচ দিনই অস্ত্রোপচারের কাজ চলত, এতে আমার প্রচুর আয়ও হত। ডাঃ বসুর সান্নিধ্য ও উদারতার জন্যই চিকিৎসক হিসাবে আমার যশ ও প্রতিপত্তি অল্পকালের মধ্যে আশাতীত রকমে বর্ধিত হয়েছিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল হোম নাম দিয়ে বড়বাজার সিন্দুর-পট্টির বাঙ্গুর-বিল্ডিংস্-এ একটি আরোগ্যালয় খুলি। সেখানে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী এবং পেশোয়ারী ফল-বিক্রেতারই আমার রোগী ছিলেন। রোগনিরসনে বিশেষ সাফল্যহেতু আমি সৌভাগ্যবশত তাঁদের সকলের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলাম। সেই সময় আমার যে সকল বিত্তবান অবাঙালী রোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে সুরজমল, সুখলাল কর্নানি, মোতিলাল ডুগর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। এ ছাড়া মাঙ্গিরাম বাঙ্গুর, মতিলাল, হালুয়াসিয়া, পাটনী, আলুওয়ালে, অ্যাটর্নি প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, বর্মণ প্রভৃতি পরিবারেও আমি দুরারোগ্য-রোগ নিরাময় করে চিকিৎসক হিসাবে বহুখ্যাতি অর্জন করেছি।

তবুও ভাগ্যবিধাতার নির্দেশে আমাকে একদিন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় চলে আসতে হয়েছে। বড়বাজারে চিকিৎসার কাজে যখন নিযুক্ত ছিলাম তখন উত্তরপ্রদেশের বুলন্দসর জেলার বিখ্যাত জমিদার কুমার গুলাব সিং-এর কনিষ্ঠা ভগ্নি বুঁদাউ জেলার নিঃসন্তান বড় জমিদারের ছোট গৃহিণীকে উৎকট সান্নিপাতিক জ্বর থেকে রোগমুক্ত করি। এতে তিনি আমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হয়েছিলেন। আমার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি আমাকে খুব বিশ্বাসী ও ধার্মিক লোক বলে মনে করতেন। সুযোগ্য ও হিতৈষী চিকিৎসক হিসাবে গুলাব সিং ৪০ হাজার টাকা বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি উপঢৌকন দিয়ে স্থায়িভাবে আমাকে তাঁদের দেশে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। আমি তাঁর দান গ্রহণে অস্বীকৃত হই এবং তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করি। তবুও কোমলহৃদয় কুমার গুলাব সিং আমাকে ছাড়তে চাননি। তখন কলিকাতায় আমার নিজস্ব বাড়ি ছিল না। ভাড়াটে বাড়িতেই থাকতাম। কথাপ্রসঙ্গে এ খবর জানতে পেরে তিনি আমাকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় অবস্থান করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন এবং পীড়াপীড়ি করে বাড়ি তৈরির জন্য টাকাকড়ি দান করেন।

তখনও আমি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করছি। এমন সময় শ্যামবাজার

ফড়িয়াপুকুরে একজন ক্যানসার রোগীকে আমার চিকিৎসাধীনে পাই। অ্যালোপ্যাথিক ঔষধে বিশেষ ফল হবে না বুঝে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সঞ্জীবিত করবার ইচ্ছায় আমি তখনকার প্রথিতযশা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার ইউনান সাহেবকে পরামর্শদাতা হিসাবে আহ্বান করি এবং রোগীকে তাঁর হাতে তুলে দেই। পরিচয় অবগত হয়ে আমার ব্যবহারে তিনি অতীব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ভূয়সী প্রশংসা করে আমাকে খুব উৎসাহিত করেছিলেন। ইউনান সাহেব এমন আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কোন সময় যদি আমার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে আগ্রহ হয় তবে তিনি সানন্দে অকুণ্ঠচিত্তে যথাশক্তি আমাকে সাহায্য করবেন।

বিখ্যাত বণিক মোতিলাল তুগরের কোন আত্মীয়া প্রায় চারমাস যাবৎ অচৈতন্য অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন; এমনকি মুখ দিয়ে পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণের সামর্থ্যও তাঁর ছিল না—রেকটাল ফীডিং চলছিল। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার বার্নাডো ও আমার সিনিয়র ডাঃ এস. কে. বসু তাঁর চিকিৎসা করছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। বাড়ির সকলেই একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক একদিন সকালে আমার মেডিকেল হোমে এসে হাজির হন এবং আমাকে রোগী দেখবার জন্য তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। আমার শিক্ষাদাতা শ্রদ্ধেয় ডাঃ এস. কে. বসুর রোগীকে ঔষধ দিতে আমি প্রবল আপত্তি তুলেছিলাম; কিন্তু মোতিবাবু আমার কোন কথাতেই কর্ণপাত করলেন না। তাঁর জবরদস্তিতে নিরুপায় হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করি; অবশেষে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ দেব না সাব্যস্ত করে নিয়ে ভগবানকে স্মরণ করে রোগীকে একমাত্রা সাধারণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়েছিলাম। ঔষধ খাবার পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আশ্চর্য ফল ফলেছিল। বাড়ির সকলে আর প্রতিবেশীরা তাঁর এই অভাবিতপূর্ব আরোগ্যলাভকে দেবী ভগবতীর অলৌকিক কাণ্ড মনে করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। কয়েক ঘণ্টার ভিতরই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন, পরিপূর্ণ চৈতন্য লাভ করলেন এবং ক্ষুধার্ত হয়েছেন বলে নানারকম নিজের প্রিয় খাদ্য খেতে চাইলেন। আহারান্তে স্বাভাবিক চলচ্ছক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ির মোটরে তিনি ইডেন গার্ডেনে ভ্রমণ করে ফিরে এসেছিলেন। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য মোতিবাবু আমাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন চিকিৎসক বিবেচনা করে উচ্চকণ্ঠে আমার প্রশংসা করেছিলেন। আমার মেডিকেল হোমের সন্নিকটস্থ মন্দিরে ভক্তের আগমন ও পূজারীর আয় ঐ দিন থেকে বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অলৌকিক ক্ষমতা দেখে ডাঃ এস. কে. বসুও আমাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। মোতিলাল দুগরের আত্মীয়া আমার হাতের দেওয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধে আশ্চর্য রকমে আরোগ্যলাভ করায় হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও শতগুণ বর্ধিত হয়। রোগীটির রক্ত হতে শুরু করে সব কিছু নিজ হাতে পরীক্ষা করে যখন সব স্বাভাবিক অবস্থায় পেলাম তখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে যেটুক সন্দেহ মনে উঁকিঝুঁকি মারত তারও অবসান হল। তাতে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে আগ্রহ ও প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। এমন সময় অবস্থাচক্রে ও অনুকূল ঘটনার সন্নিবেশে আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হল। ডাক্তার ডি. এন. ব্যানার্জি তখন জার্মানি থেকে বিশেষজ্ঞ হয়ে দেশে ফিরে এসে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পুনরায় যোগদান করেন। কথাপ্রসঙ্গে আমার বিষয় জেনে তিনি আমাকে ব্যাকটিরিওলজি নিয়ে 'ডাই অন ব্যাক্‌টিরিয়া' রিসার্চ করতে উৎসাহ দেন। তাঁর উপদেশমত এই গবেষণার কাজে সাগ্রহে আত্মনিয়োগ করি। কিন্তু শরীরের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে অত্যধিক চোখের পরিশ্রম করার পরিণামে আমি 'আইরাইটিস' রোগে আক্রান্ত হই।

শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য ও জীবনের গতির পরিবর্তন

তখনকার প্রখ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমি চক্ষুরোগের চিকিৎসার্থে উপস্থিত হই। প্রথম দিনের সাক্ষাতেই তিনি আমার প্রতি বিশেষ স্নেহানুরক্ত হয়ে পড়েন, তারপর দিনের দিন আমি তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ আপনজন হয়ে উঠি। তিনি আমাকে যে স্নেহমমতা দেখিয়েছিলেন তার পশ্চাতে ছিল পুত্রশোকাতুর পিতৃ-হৃদয়ের মর্মবেদনা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের শোক ভোলবার জন্য কাশীধাম প্রভৃতি তীর্থ পর্যটনের শেষে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পরদিনই আমি তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম। আমাকে দেখেই তাঁর ভাবান্তর হয়েছিল। তিনি আমাকে যথেষ্ট সমাদর করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশে, প্রেরণায়, আনুকূল্যে আমি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হতে পেরেছি। এ সমস্ত কথা ক্রমশ বিবৃত করছি। আমার প্রতি পূজনীয় বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের অপত্যস্নেহ স্ফুরণ হবার ফলে তিনি আমার

একান্ত হিতৈষী ও জীবনে উন্নতিসাধনের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তখন ভারতবিখ্যাত বহু-অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তিনি অন্তরে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছিলেন যে অ্যালোপ্যাথিকের চেয়ে হোমিও-প্যাথিক শ্রেষ্ঠ এবং উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করতে পারলে ইহা অনেক বেশি সুফলপ্রদ ও জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর হবে। তাঁর চিকিৎসাধীনে থেকে দুই-তিন মাসের মতো লেগেছিল আমার চক্ষুরোগ হতে মুক্ত হতে এবং এই সময়ের মধ্যে বহুবার তাঁর সান্নিধ্যে আমাকে আসতে হয়।

এই সময় আমার ইচ্ছা ছিল কলিকাতায় প্যাথলজি ও ব্যাকটিরিওলজি পড়া শেষ হলে প্যারিস শহরে গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষালাভ করে বিশেষজ্ঞ হয়ে আসি। আমার পিতৃব্য ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য এবং আমার হিতৈষী শিক্ষক ডাঃ এ. সি. উকিল আমাকে এইরকম পরামর্শ দিয়েছিলেন। তদনুসারে আমার নানারকম ঝামেলার মধ্য দিয়ে ভারত সরকারের বিরূপতা সত্ত্বেও বন্ধুবর ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষের মধ্যম ভ্রাতা সাধক যোগানন্দের সহায়তায় আমেরিকা যাবার পাসপোর্ট জুটে যায়। আমেরিকা থেকে বিনা বাধায় স্বচ্ছন্দে ফ্রান্সে যাওয়া চলত। তথাপি বিধির নির্বন্ধে আমার বিলাত যাত্রায় অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক এল। শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবু আমার বিদেশ যাত্রার কথা শুনে অতিশয় কাতর হয়ে পড়লেন এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় অনেকক্ষণ বুঝিয়ে আমাকে যেতে নিষেধ করলেন। দেশে থেকেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় পারদর্শী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়ে আমি জীবনে উন্নতি করতে ও দেশের ও দশের মঙ্গলসাধনে সক্ষম হতে পারব, তিনি আমাকে এরূপ আশ্বাস ও নিশ্চয়তা দিলেন। শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই আমার পাসপোর্টের একরকম বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল। সামান্য কয়েকদিনের যাতায়াতে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমে উঠেছে, এমন সময় রাঁচীর যোগদা-আশ্রম থেকে খবর পেলাম যে, আমার পাসপোর্ট এসেছে।

এই সংবাদ পেয়ে আমার বিলাত যাওয়ার বাসনা অন্তরে নিয়ে গুরুজনদের প্রণাম করার জন্য ভাটপাড়া রওনা হয়েছি; এমন সময় দৈবক্রমে শিয়ালদা রেলস্টেশনে পূর্বপরিচিত এক গনৎকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁর পূর্বের ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়েছিল বলে তাঁর প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সুরী লেনে অবস্থিত নিজস্ব একখানা বাড়ির ভাড়া আদায় করতে খড়দহ থেকে কলিকাতায় আসতেন। ডাক্তার বিপিন চাটুজ্জের

ডিস্পেন্সারিতে দুধ আনতে যাবার সময় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। এবার তাঁকে দেখে আমার প্রাণ অনেকটা সুস্থির হল। কারণ শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবুর প্রতিনিবৃত্ত করার সকরুণ আবেদনে আমার হৃদয় এবং মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। যাবার আগ্রহ যেমন পূর্ণমাত্রায় ছিল, তেমনই এই প্রবীণ ব্যক্তিটির কথা অগ্রাহ্য করতে মনে তীব্র বেদনা অনুভব করছিলাম। জ্যোতিষী মহাশয়কে আমি ধরে বসলাম, আমার বিলেত যাওয়া ঘটবে কিনা এবং ফলাফল কি হবে তা বলে দিতে। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি রাজী হলেন। কিন্তু তাঁব ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুকূল বা উদ্দীপনাপ্রদ ছিল না। তিনি বললেন, 'বিলাত গেলে দেহান্ত অবশ্যম্ভাবী, আর যদি দেশে থাকেন জীবনের বিস্ময়কর দশান্তর ঘটবে,—এতকালের সাধ, স্বপ্ন, কর্মধারা, পবিকল্পনা বিসর্জন দিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ নূতনরূপে প্রকাশ পেতে হবে।' জ্যোতিষী ঠাকুরের কথায় মনে খুব আঘাত পেলাম বটে, কিন্তু কর্তব্য নির্ধারণে কিছুমাত্র বিলম্ব হল না। বিদেশ-ভ্রমণের আশা তখনই পরিত্যাগ করলাম এবং এই ভেবেও মনে স্বস্তি অনুভব কবলাম যে, শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবুর কথা অমান্য করে তাঁর প্রাণে ব্যথা দিতে হবে না। ঈশ্বরই যেন স্বয়ং আমার পথনির্দেশ করে দিলেন। আমার সব দ্বিধা দুর্ভাবনা কেটে গেল। বিলাত যাবার সংকল্প ত্যাগ করেছি জেনে বারিদববণবাবু আমাব উপর খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন।

এই সময় থেকে তিনি তাঁর চেম্বারে পুত্রবৎ স্নেহে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখবার সকল রকম সুযোগ দিলেন এবং তিনি নিজেও আমাকে নানা জটিল বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে শিক্ষার সহায়তা করতেন। শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবু আমাকে 'টকসিকোলজি'তে ('অগদতন্ত্রে') ব্যুৎপন্ন হওয়ার জন্য অ্যালোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সুযোগও সঙ্গে সঙ্গে মিলেছিল। ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটে তখন এক ব্যক্তি ছুটিতে দেশে চলে যাওয়ায় সাময়িকভাবে মেটিরিয়া মেডিকার ডিমনস্ট্রেটরের পদ খালি হয় এবং আমি ঐ পদে নিযুক্ত হই। মাস তিনেক আমি ঐ পদে থেকে কলিকাতার বিভিন্ন চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় কলেজের ছাত্রদের নিয়ে বিশেষ উৎসাহের সহিত ক্লাস করেছিলাম। এতে অনেকের উপকার হয়েছিল এবং আমারও মেটিরিয়া মেডিকা সংক্রান্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। এই সময় আমার বাঙ্গুর বিল্ডিং-এ মেডিকেল হোমের কাজ চালাচ্ছি এবং শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবুর চেম্বারে

রোজই অন্তত দুইবার যাতায়াত করি, এমন কি তাঁর লাইব্রেরিতে বসে চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থপাঠের পর ঐখানেই নিয়মিত রাত্রিযাপন করি। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দিকে আন্তরিক ঝোঁক থাকায়, শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবুর সান্নিধ্যে আসার তিন-চার বৎসর পূর্বেই আমি 'ক্যালকাটা ফ্যাকালটি কলেজ অব হোমিওপ্যাথি' থেকে রেগুলার ছাত্র হিসাবেই এইচ. এম. ডি. ডিগ্রী পাই, এই কথা আমি একপ্রকার সকলের কাছেই গোপন রেখেছিলাম। অ্যালোপ্যাথিক হোমিও-প্যাথিক দুই চিকিৎসাশাস্ত্র একসঙ্গেই পড়েছিলাম এবং হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রী আগেই অর্জন করেছিলাম। শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের সূচনাকালে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছি এমন সময় ন্যূনাধিক এক বৎসর কালের ভিতর আমি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত দু-চারজনকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আশ্চর্যরকমে নিরাময় করে তুলি।

কে. সি. মিশ্রনামক একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র তার নিজের গ্রামের একজন রোগীকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করবার জন্য বিহার থেকে নিয়ে আসেন। লোকটার রোগ ছিল **stricture urethra** (স্ট্রিক্চার ইউরেথ্রা) ঐ দেহাতী ব্রাহ্মণ জাত হারাবার ভয়ে কোনমতেই হাসপাতালে থাকতে সম্মত হল না। উপায়ান্তর না দেখে কে. সি. মিশ্র আমাকেই ঐ রোগীর চিকিৎসা করার কথা বলেন। মিশ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ঘোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়েই তাঁর স্বগ্রামবাসী রোগীকে আরোগ্য করেছিলাম। রোগীটি প্রায় একুশ বৎসর পূর্বে গনোরিয়া ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ছিলেন। তারপর থেকে ক্রমশঃ প্রস্রাব ঠিক পথে না হয়ে 'পেরিনিয়ামে' বহু ছিদ্রপথ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে পড়ছিল। আমি তাঁকে আট মাত্রা ঔষধ দিয়ে রোজ ১ মাত্রা করে খাবার ব্যবস্থা দেই। চার দিন ঔষধ ব্যবহারের পর পঞ্চম দিনে 'পেরিনিয়াম'-এর ছিদ্রগুলি বন্ধ হয়ে যায়। প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে বেগে রক্ত বেরোতে থাকে, তা দেখে ভয় পেয়ে দৌড়ে লোকটি আমার কাছে আসেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—এটা সুলক্ষণ, রোগ আরোগ্যের পথে চলেছে। এতে আমার একটা গভীর উপলব্ধি হল যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধে এরূপ ক্ষেত্রেও শল্যচিকিৎসার সমান ফল পাওয়া যায়। এটা আমার কাছে একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। এরপর দ্বিতীয় রোগী কে. সি. মিশ্র নিজে আমার হাতে রোগমুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছোটবেলায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি সুস্থ হয়েছিলেন

বটে কিন্তু ঐ রোগের আনুষঙ্গিক রোগ নাক দিয়ে রক্তপড়া ব্যাধি তাঁকে অধিকার করে বসেছিল। প্রতি বছর তাঁর নাক দিয়ে অঢেল রক্তপাত হত। প্রত্যেক বারই ঔষধ দিয়ে অতিকষ্টে রক্তপাত বন্ধ করতে হয়েছে। শ্রীমিশ্র যখন মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র এবং আমারও শিক্ষার্থী, এমন সময় আবার তাঁর সেই পুরাতন ব্যাধির আক্রমণ হয়। তিনি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বার্নাডো সাহেবকে চিকিৎসার জন্য ডাকেন। বার্নাডো সাহেবের ঔষধে সকালে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়, কয়েক ঘণ্টার পর বিকালে পুনরায় ভয়ানকভাবে নাসিকাপথে রক্ত ঝরতে থাকে। বার্নাডো সাহেবকে বাড়িতে না পাওয়ায় আমি আহূত হই। আমি শ্রীমিশ্রকে একমাত্রা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খেতে দিলাম। তার কয়েক মিনিটের মধ্যে ভোজবাজির মতো রক্তপাত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। বার্নাডো সাহেব অল্পক্ষণের মধ্যে অন্যত্র রোগী দেখা শেষ করে এসে হাজির হলেন। তিনি মিশ্রের কাছ থেকে হোমিওপ্যাথিকে রক্ত বন্ধের অদ্ভুত শক্তির কথা জেনে মুগ্ধ হন। পরে আমার পরিচয় পেয়ে যখন জানলেন আমিই ডুগরের আত্মীয়ার ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অলৌকিক শক্তি দেখিয়েছিলাম তখন আমার হাত শক্ত করে করে ধরে ডাঃ বার্নাডো বলেছিলেন, **"Dr. Bhattacharjee, just show me the dark side of Homœopathy—please. I again request you to show me the dark side."**—এটাও হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অসামান্য মঙ্গলকর গুণের সুনিশ্চিত প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে আমার তৃতীয় রোগী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর কথা বলছি। তিনি আমার প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁর সমস্ত শরীর শ্বেতীতে ছেয়ে গিয়েছিল। তাঁর আকুল কাকুতি-মিনতিতে বিচলিত হয়ে কেবল এক মাত্রা অত্যুচ্চ শক্তিকরণে তৈরী ঔষধ খেতে দিয়েছিলাম দুই সপ্তাহকালের জন্য। আর বলেছিলাম ফলাফল দেখে পরে অন্য ঔষধ দেব। কিন্তু ভগবানের অশেষ করুণায় পক্ষকালের মধ্যে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আরোগ্যপথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁকে আমার আর ঔষধ দিতে হয়নি, মাসাধিক কালের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ নীরোগ হয়েছিলেন এবং ত্বকের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরে পেয়েছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এখানেও দৈবশক্তির মতো আশ্চর্য কাজ করেছিল। আমার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধে তাঁর অটল বিশ্বাস সঞ্জাত হয়েছিল।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রথম যুগে ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন বুঝে শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবু আমাকে 'অ্যাকিউট' (সন্থরোগ) রোগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হাতে কলমে শিখতে উপদেশ দেন। শুধু তাই নয়, তাঁরই অনুগ্রহে শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মাড়োয়ারী হাসপাতালের হোমিওপ্যাথিক বিভাগে সহকারী মেডিক্যাল অফিসার পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম। চার-ছ-মাস কাজ করার পর যখন বুঝলাম যে, অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে তখন পদত্যাগ করে চলে এলাম। যাহোক, ক্রমেই শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবুর অন্তরঙ্গ, বিশ্বাসভাজন ও প্রীতিভাজন হয়ে উঠতে থাকি। তিনি সরল প্রাণে ও গভীর বিশ্বাসে আমার উপর নির্ভর করতে থাকেন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সংক্রান্ত দায়িত্বভার আমার উপর ন্যস্ত করতে থাকেন। তাঁরই আনুকূল্যে ৩৮নং কলেজ রোতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার জন্য ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে একটি ঘর জোগাড় হয়। শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবু নিজে কখনও ঔষধ দিতেন না। তাঁর চেম্বারে এরূপ নিয়ম ছিল যে, তিনি ব্যবস্থাপত্র লিখে দিতেন, রোগীদের নামকরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা 'কিং এণ্ড কোং' থেকে ঔষধ কেনার নির্দেশ দিতেন। দিনে দিনে আমিও তাঁর সহকারী ও চিকিৎসক বন্ধু হয়ে উঠি। দিনের বেলা তাঁর সঙ্গে আমি রোগী দেখতে যেতাম আর রাত্রিকালে তিনি রোগী দেখতে না গিয়ে আমাকে পাঠাতেন। সন্ধ্যার পর আর তিনি রোগী নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না, আমার উপরই দায়িত্ব ছেড়ে দিতেন। কিন্তু মহাপ্রাণতা-বশতঃ শিক্ষাদানকালে তিনি বহু বিষয় ব্যাখ্যা আলোচনা করে যেতেন, রাত্রি কত গভীর হয়েছে সেদিকে হুঁশ থাকত না। ৩৮নং কলেজ রোতে আমার হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি হবার পর শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবু তাঁব ঔষধ ব্যবহারে অভ্যস্ত নিয়মের অন্তর্নিহিত বেদনাদায়ক ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ঔষধ পরিবেশনে পরামর্শ-প্রার্থী চিকিৎসকদের ও রোগীর বাড়ির লোকদের অনবধানতা ও খামখেয়াল বশতঃ ঔষধের অপপ্রয়োগ হচ্ছে এবং তাতে বহু রোগী অনর্থক প্রাণ হারাচ্ছে। এজন্য তিনি তখন থেকে তাঁর বোগীদিগকে আমার চিকিৎসাগার থেকে ঔষধ নেবার নির্দেশ দিলেন। এতে দুদিকেই লাভ হল, চিকিৎসাবিভ্রাট বন্ধ হল আর আমারও প্রয়োজনীয় অর্থাগম হতে লাগল।

ক্রমশঃ অ্যালোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক—দুই দিক দেখা কষ্টকর হয়ে উঠলে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে 'মেডিকেল

হোম' বন্ধ করে দিলাম। আর চিকিৎসাগারের সমস্ত ঔষধ অবিলম্বে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতিকে দান করে দিলাম,—জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে। এখন থেকে শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোন কারণে অসুস্থতাবশতঃ, বিশ্রামের জন্য বা দূরাঞ্চলে রোগী দেখার উদ্দেশ্যে প্রবাসকালে অনুপস্থিত থাকার সময় আমি তাঁর চেম্বারে প্রতিনিধিরূপে চিকিৎসার সমস্ত কাজ করতাম। প্রায় দশবৎসরকাল আমি তাঁর সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছি। তাঁর মহানুভবতায় পারদর্শী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হতে পেরেছি। এইরূপে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যথেষ্ট যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা লাভের পর আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস যখন আমার সুদৃঢ় হল তখন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার সঙ্গে সংস্রব একেবারে ছেড়ে দিলাম। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবুর হোমিওপ্যাথিক 'গ্রুপের' (group) ঔষধে অভিজ্ঞ হওয়ার পর তাঁরই সৎ পরামর্শে সে যুগের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ইউনান সাহেবের কাছে যাই শিক্ষার্থী হিসাবে। তিনি আমাকে যে-একখানি সুপারিশপত্র দিয়েছিলেন সেটা দেখে ডাঃ ইউনান খুব খুশী হয়েছিলেন। সাহেব উচ্ছ্বসিত হযে শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবুর প্রশংসা করে আমাকে তাঁর বিশেষ group-এর ঔষধ প্রয়োগে রোগের লক্ষণ (indication) বুঝে চিকিৎসা শেখাতে সম্মত হয়েছিলেন। ইউনান সাহেবের নিরালা সান্নিধ্যে পাঁচ-ছয় মাস শিক্ষানবিশির শেষে আমি তাঁর গ্রুপের ঔষধে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠি। সেই সময় থেকে আজ পযন্ত নানা ক্ষেত্রে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের ফলস্বরূপ যথেষ্ট সুনাম ও সাফল্যের সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে চলেছি।

বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ঋষি অরবিন্দের ভগিনী শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দামান থেকে ছাড়া পেয়ে কলিকাতায় চলে আসেন। শ্রীমতী ঘোষ ও উপেনবাবু আন্দামানে থাকার সময় 'এগ্‌জিমা' (Eczema) রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কলিকাতায় এসে তাঁরা ঐ রোগের চিকিৎসা করাতে চান। এজন্য কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আসেন। শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। দু-চারদিন চিকিৎসা করার পর বারিদবরণবাবুকে জরুরী কাজে

বাইরে চলে যেতে হয়। তিনি তাঁদের ঔষধ-পত্রাদির ব্যবস্থার জন্য আমার উপর ভার দিয়ে যান। শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবুর সযত্ন চিকিৎসায় তাঁরা কিছুকালের মধ্যে নিরাময় হয়ে ওঠেন। ডাঃ বারিদবরণবাবুর অনুপস্থিতিকালে উপেনবাবু ও বারীনবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। তারপরও বহু বৎসর বিপ্লবী উপেন ব্যানার্জির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। অনেকবার আমি তাঁর সিঁথির বাড়িতে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে চিকিৎসা করতে যাই। কিন্তু ঘোষ পরিবারের সঙ্গে আমার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর পরে ১৯৫২ সালে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় শ্রীঘোষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। ঐ বৎসর জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ একদিন হঠাৎ বারীনবাবু Apoplexy রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। অর্ধমূর্ছিত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যাবার সময় তাঁর মুখ দিয়ে আমার নাম অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। বারীনবাবুর স্ত্রীর ঐ অস্পষ্ট কথার দিকে মনোযোগ দেবার অবসর ছিল না। তিনি দিশাহারা হয়ে অবিলম্বে একজন সুপরিচিত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসককে ডেকে আনেন। সেই চিকিৎসক বহু চেষ্টায়ও বারীনবাবুর রোগ সারাতে সমর্থ হলেন না। রোগীর অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে লাগল। বারীনবাবুর আত্মীয়-স্বজনেরা অতিশয় দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার মধ্যে পড়লেন। তাঁর স্ত্রীর চিন্তাভাবনার মাঝে বারীনবাবুর অস্পষ্ট স্বরে বলা আমার নাম আচম্বিতে তাঁর মনে পরিস্ফুট হয়ে উঠলে তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি বারীনবাবুর চিকিৎসা শুরু করি। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমার পরামর্শমত ঔষধ-পথ্যাদি ব্যবহারের পর বারীনবাবু সুস্থ হয়ে উঠতে থাকেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে আশ্চর্য ফল ফলে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু হবার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে বারীনবাবু একদিন কৃষ্ণনগরে বিশেষ উপলক্ষে বাস্তুহারাদের জমায়েতে সভাপতিত্ব করতে যাবার জন্য আমার অনুমতি চান। আমি তাঁকে যেতে নিষেধ করি। তবু তিনি একগুঁয়েমি করে কৃষ্ণনগরে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করতে চলে যান। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি বড় রকম কিছু অসুস্থতা বোধ না করেই সভাপতির কাজ ও উদ্বোধনী বক্তৃতা ইত্যাদি সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে এসে একখানি চিঠিতে বারীনবাবু এইসব কথা জানিয়েছিলেন। ঐ সময় বারীনবাবু দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে

উঠার কয়েকদিন পরে প্রায় তিনস্তম্ভব্যাপী 'জীবনমৃত্যুর নাগরদোলায়' নামক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রশংসা এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে আমার মহৎ কৃতিত্ব ও পারদর্শিতার বর্ণনা করেন। তিনি আমার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করেন।

ছাত্রজীবনে পরদুঃখকাতরতা

ছাত্রজীবনেও আমি পরদুঃখকাতর ও অসহায়ের প্রতি সমবেদনশীল ছিলাম। আমি যখন চিকিৎসা কলেজে পড়ি তখন ৪র্থ বার্ষিক পরীক্ষার সময় অর্থাভাবে বাধ্য হয়ে হোষ্টেলে যাই নি, মাতুলালয়েই থেকে ছিলাম এবং সেইখানেই রান্না করেই খেতাম। দেশ থেকে পিতা দুধ ও জলখাবার ইত্যাদি প্রত্যহ ডাঃ বিপিন চাটুজ্জের চিকিৎসালয়ে এনে রেখে দিতেন, আর আমি সুবিধামত সময়ে ঐগুলি নিয়ে আসতাম। ঐরূপে বরাবর যাতায়াত করছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন বিপিনবাবু একটি দুঃস্থ যুবকের কথা বলে তাকে সাহায্য করতে বিশেষ অনুরোধ জানালেন। যুবকটির নাম হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খুলনা ছয়-আনিপাড়ার কোন জমিদার বংশের সন্তান। অবস্থাচক্রে দৈন্যদশায় পড়ে সে তখন অর্থকষ্টে ও অন্নাভাবে খুব হীনভাবে কলিকাতায় বাস করছিল। বিপিনবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে আমি হরিচরণকে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে উদ্যোগী হই। তখন বাবা আমাকে সামান্য কয়েকটি টাকাই দিতেন, কারণ তাঁর ভয় ছিল - পাছে আমি বেশি টাকা হাতে পড়লে মাত্রাতিরিক্ত সহৃদয়তাবশে আমার দেশসেবার সহকর্মী বন্ধুবান্ধবকে কিছু দিয়ে ফেলে অর্থের অপব্যবহার করি।

যা হোক, এ-সময় পিতার কাছ থেকে সামান্য কয়েকটি টাকা পেতাম; তার অর্ধাংশ দিয়ে ৩৭নং কলেজ রো-তে কার্তিক ঠাকুরের হোটেলে হরিচরণের দুই বেলা আহারের মাসিক বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলাম। প্রায় দেড় বছর ধরে এইভাবে তার অন্নের ব্যয়ভার বহন করেছিলাম। তারপর যখন হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছু কিছু পেশাদারী চিকিৎসা শুরু করেছি, তখনও তার অবস্থার কিছু উন্নতি হয়নি দেখে তাকে আমার কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করি। হরিচরণ খুব সামান্য লেখাপড়া শিখেছিল বলে কম্পাউণ্ডারি পাশের সুযোগ পাইনি। আইন

অনুযায়ী অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে কম্পাউণ্ডার হবার অধিকার তার ছিল না। তবু সে কম্পাউণ্ডার হিসাবেই বহুকাল আমার কাছে কাজ করেছে। নিরুপায় হয়ে আমি তাকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যাপারে কম্পাউণ্ডারের কাজ করতে দিয়েছিলাম। হরিচরণ সাধুপ্রকৃতির লোক ছিল। সে ধৈর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে দীর্ঘকাল আমার কার্য সম্পাদন করেছে। আমার সান্নিধ্যে বহুদিন অবস্থান করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মূল তথ্যগুলি আয়ত্ত করে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সে খুলনায় তার দেশে চলে যায়। সেখানে চিকিৎসালয় খুলে হরিচরণ অনেক রোগীকে নীরোগ করে প্রসার-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়, আর অল্পকালের মধ্যে তার দারিদ্র্যও দূরীভূত হয়, বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘকাল সে খ্যাতিমান চিকিৎসক হিসাবে লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হয়ে উঠেছিল।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর শিক্ষার্থী হিসাবে কোটালিপাড়ানিবাসী হৃষিকেশ দে, হরিচরণের সম্বন্ধী যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বটকৃষ্ণ মণ্ডল প্রমুখ যুবকেরাও আমার সান্নিধ্যে থেকে কম্পাউণ্ডারের কাজ করে হাতে-কলমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মৌলিক তথ্যগুলি শিখে নিয়েছিল। তারাও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা পেয়ে গেলে তৎকালীন অখণ্ড বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করে এবং নাম, যশ, প্রতিপত্তি অর্জন করে। এই-সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, আমার কাছে শিক্ষালাভান্তে তাদের রোগীর চিকিৎসাতেই আত্মনিয়োগ করতে হবে, চাকুরি করা কিছুতেই চলবে না। কারণ জনকল্যাণের আদর্শে তাদের গড়ে তুলতে আমি যত্নবান হয়েছিলাম। সমাজের হিতসাধনে ব্রতী ও কর্মযোগে অনুরাগী ছিলাম বলে এই সময়ে আমার বাড়িতে জীবনসংগ্রামে বিপন্ন বহু নিরুপায় যুবককে স্থান দিয়েছিলাম। এর ফলে তারা কলিকাতায় বাস করে নানা বিষয়ে অর্থকরী বিদ্যা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিল। অনেককে আমি সময় সময় আহার এবং অর্থ দিয়েও সাহায্য করেছি। উপরি-উক্ত আমার শিক্ষার্থীদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবরাই বেশির ভাগ আমার বাড়িতে ভিড় করে থাকত কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সাগ্রহ প্রত্যাশায়।

আত্মপ্রচার না করে আর-একটি কথা উল্লেখ করা সমীচীন। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার গোড়ার দিকে কিছু কিছু আয় হতে চলেছে এমন সময় আমি

আমার কম্পাউণ্ডারদের নির্দেশ দিয়েছিলাম—আমার অর্জিত অর্থ থেকে প্রথমেই আমার বিপ্লবী বন্ধুদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আলাদা করে রেখে দিতে হবে; তারপর আমার আত্মীয়-স্বজন বা পরিজন যে-কেউই টাকা চাইবেন তাঁকেই প্রার্থিত অর্থ দিতে হবে, তারপর নিজেদের প্রাপ্য নিয়ে অবশিষ্ট অর্থ, অল্প বা অধিক হোক, আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে সমস্ত টাকার মাসিক হিসাব মিলাতে হবে।

ফেলুর সঙ্গে পরিচয় ও সহানুভূতি

ছাত্রজীবনে কয়েক বছর আমি রাধানাথ মল্লিক লেনে মাতুলালয়ে একাকী বাস করছি এমন সময় ফেলুনামে একটি ১৪-১৫ বৎসরের ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সে আমার কাছে প্রায়ই আসত—সকাল বিকেল যে কোন সময় আমার জানালা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে যেত—ঘনিষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষায়। পাড়ার লোকেরা বিষয়াশয়বঞ্চিতা বিধবার এই ছেলেটিকে একটুও সুনজরে দেখত না, বদ ছেলে মনে করে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করত। ফেলু খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। আমি তাকে ভাল হবার উপদেশ দিলাম এবং আমার সঙ্গে মিশতে বা আমার ঘরে ঢুকতে আপত্তি করলাম না। আমি বুঝেছিলাম, উপযুক্ত শিক্ষা ও সুপ্রভাবে সে মানুষ হয়ে উঠতে পারে। ক্রমে ফেলু বা পাঁচুগোপাল সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং সে আমাকে দাদা বলে ডাকতে আরম্ভ করে। সে আমার খুব অনুগত ছিল এবং কখনও আমার কথার অবাধ্য হত না। পাঁচুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ পরিচয়ের সময় হতে বরাবর অবিচ্ছিন্ন ছিল। বেনেটোলা লেনের বাড়িতে আছি এবং অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, এমন সময়ে পাঁচুর জীবনে এক মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা ঘটে। তার দুঃখে মর্মাহত হয়ে তাকে সান্ত্বনা দেই আর আমার বাড়িতে এসে থাকতে বলি। সে আমার কথায় আমার বাড়িতে চলে আসে। এই সময় পর্যন্ত পাঁচু কিছু করে উঠতে পারেনি বলে তার মনে খুব আপসোস ছিল। সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে, আমিও তাকে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ দান করেছি। ইতিপূর্বে আমি তাকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে কাশীতে নারিকেল ব্যবসা করবার জন্য পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু নারিকেলের ব্যবসায়ে কিছু করে উঠতে না পেরে সে ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে আসে। এরপর আমি আবার পাঁচুকে দিল্লীতে

পাঠাই তখনকার বাঙালী পল্লীতে নিত্যপ্রয়োজনীয় শাকসব্জি ফল ইত্যাদি ফেরি করবার জন্য ; কিন্তু নয়াদিল্লীতেও পাঁচু কিছু করে উঠতে পারে নি। ফেরির কাজে বেরিয়ে কেবল ক্রেতাদের অসৌজন্যবশতঃ কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। এরপর পাঁচুকে আমার বাড়িতে আশ্রয় দিই। সে ছোট ভায়ের মতো আমার কাছে থাকত এবং আমার ডিস্পেন্সারি দেখাশোনা করত। সাংসারিক নানা কাজেও অকুণ্ঠচিত্তে সহায়তা করত। পাঁচু সকলের সঙ্গে মিলেমিশে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিল। আন্তরিকতা ও অনুরক্তির গুণে পাঁচু আমার অন্তরঙ্গ আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিল, আমি তাকে সকল ব্যাপারেই পুরোপুরি বিশ্বাস করতাম। প্রাণের আগ্রহে অকপট সেবা দিয়ে সে আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সেবা-কাজে পাঁচুর আচরণ সত্যই প্রশংসনীয়। আমি জীবনে এক সময় জ্যোতিষশাস্ত্রে— গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব কিংবা ফলাফলে বিশ্বাস করতাম না। বাংলা ১৩৪৩ সালের গোড়ার দিকে একদিন জ্বরে অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে-শুয়ে খেয়ালবশে ঐ বছরের পাঁজির পাতা উলটাচ্ছিলাম, হঠাৎ আশ্বিন মাসের নক্ষত্রবিচার চোখে পড়ে। তাতে উল্লেখ ছিল যে, কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত জাতকের কোন উপকৃত মিত্র তার বিরুদ্ধাচরণ করবে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠে। পাঁচুগোপাল পাশেই দাঁড়িয়েছিল, আমি কৌতুকবশে পঞ্জিকার ঐ নক্ষত্র-ফলের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

পাঁচুগোপাল আমার এই তামাসার কথা শুনে অকারণে গম্ভীর হয়ে উঠে বলল, "এ আর আশ্চর্য কি! আমিই হয়তো আপনার সঙ্গে শত্রুতা করব!" পাঁচুর কথা আমি পরিহাসের সঙ্গে উড়িয়ে দিই। আমি তখন বিশ্বাস করতে পারি নি যে, পাঁচু, যে আমার একান্ত অনুগত, সে শত্রু হয়ে উঠবে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এমন একটি ঘটনা ঘটল, যাতে আমার চোখ খুলে গেল, দৈবে আমি বিশ্বাসী হয়ে উঠলাম ; গ্রহনক্ষত্রের ফলাফল আর বাকচাতুরী বলে মনে হল না। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বিখ্যাত দন্তচিকিৎসক বিপিন রায় কন্যার চিকিৎসার জন্য আমায় ডাকতে আসেন। আমি পীড়িত অবস্থায় অন্দরমহলে ছিলাম, আর পাঁচু বসে ছিল আমার চেম্বারে। বিপিনবাবু আমাকে চিনতেন না। এই সুযোগে পাঁচু তার এক বদ মতলব কাজে লাগাল। সে 'গৌরহরি ভট্টাচার্য' পরিচয় দিয়ে নিজে বিপিনবাবুর বাড়িতে রুগী দেখতে গেল। প্রথম দিন সে ভাঁওতা দিতে সক্ষম হল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে তার চালাকি ধরা পড়ল। পাঁচু নকল

ডাক্তার সেজে আমার ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এই সন্দেহ মনের মধ্যে দৃঢ় হওয়ায় বিপিনবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তীব্র ভাষায় পাঁচুকে তিরস্কার করলেন আমার চেম্বারের ভেতরেই। তখন পাঁচুর কীর্তি আমার নজরে পড়ল।

আমি পাঁচুকে কাছে ডেকে অনুযোগ করে বললাম যে, সে মহা অন্যায় করেছে। ঐ মেয়েটি আসলে আমার চিকিৎসাগুরু শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবুর চিকিৎসাধীন রুগী, আমারও এমন দুঃসাহস নেই যে, তাঁর বিনা অনুমতিতে আমি তাঁর রুগীকে দেখাশুনা করি, আর একথা তো তোমার অজানা নেই। তারপর খুব কড়া ভাষায় পাঁচুকে বেশ খুব খানিকটা বকুনি দিলাম। পাঁচু মাথা হেঁট করে নীরব রইল।

বারিদবরণ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যুৎবরণ বাবুর সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়ে পাঁচু আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় বের করল। সে নানা রকম মনগড়া নিন্দাবাদ বিদ্যুৎবাবুর মারফত বারিদবরণ বাবুর কানে তুলে বারিদবরণ বাবু ও আমার মধ্যে বিভেদ ও বিরক্তি সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হল। বারিদবরণ বাবু ছোট ভাইয়ের এইসব কানভাঙানো কথা কতদূর বিশ্বাস করেছিলেন, জানি না।

এই ঘটনাব কয়েক দিনেব মধ্যে পাঁচু কলিকাতা ছেড়ে কুমিল্লা চলে যায়। শেষে পাঁচু মেদিনীপুর গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকে। আর ব্যবসায়ে প্রভূত লাভবান হয়ে বহু অর্থ উপার্জন করে।

এই অবসরে আমার নক্ষত্র প্রসন্ন হয়ে ওঠে আর সুফল দিতে আরম্ভ করে। এই কারণে পাঁচুর আমার প্রতি পূর্বের শত্রুভাবও কেটে যায়। সে নিজের ভুল বুঝে আবার আমার প্রতি অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করতে থাকে। এর প্রমাণ পাই আমার ছোট ভাইয়ের একটি হীন আচরণের মারফত। কয়েক বছর পরে নিতাই যখন পাঁচুকে আমার বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে তখন পাঁচু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে নিতাইকে খুব কড়াকড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিল,—রাজী তো হয়ই নি। এই সূত্রে তার সঙ্গে আমার পূর্বের সদ্ভাব ও প্রীতি পুনর্জাগ্রত হয়েছিল।

ছাত্রসমাজের কার্যালয় ও স্কুলের জন্য জমি সংগ্রহ

বেনেটোলা লেনের বাড়িতে বাস করছি এমন সময়ের উল্লেখযোগ্য আর-এক ঘটনা -আমার 'আদর্শ ভ্রাতৃসমাজের' সঙ্গে যুক্ত উচ্চ প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করা। আমাদের গ্রামে গঙ্গাতীরে বাঁধাঘাটের উত্তরে জোড়া শিবমন্দির সংলগ্ন কিছু দেবোত্তর জমি ছিল। স্কুলবাড়ির জন্য ঐ জমি আয়ত্ত করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। বহু শরিকের বেড়াজালে বাঁধা ঐ জমি পেতে আমার বহু খাটুনি হয়েছে। আমি কাশী ও পরে মীরাট গিয়েছি ঐ জমির সর্বাধিক বড় অংশীদার এক মহিলার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি ভূমিদানে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে পিতার হুঁশিয়ারিতে সেটেলমেণ্টের পরচা দেখে জানা গেল যে, তিনি দেশ ছেড়ে দূরে থাকার সুযোগ পেয়ে অন্যান্য শরিকরা তাঁকে বঞ্চিত করেছেন—তাঁর নামের বদলে জমির অধিকার সংক্রান্ত দলিলে অপর কয়েকজনের নাম তঞ্চকতা করে লেখা হয়েছে। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্য শরিকের সঙ্গে ছুটিছাটাতে ভাটপাড়ায় গিয়ে আলাদা আলাদা মিলিত হয়ে ঐ জমির বিষয় কথাবার্তা বলি। তাতে দীর্ঘ সময় লাগে বটে তবে তাঁরা সকলেই সমাজকল্যাণের কথা ভেবে পঞ্চায়েতি দান-পত্রে স্বাক্ষর করে জমির নিজস্ব অংশের মালিকানা-স্বত্ব বা অধিকার সানন্দে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই বলি, এই জমি সংগ্রহের কাজে আমার শ্রম ও উদ্যোগ কিছুমাত্র উপেক্ষণীয় ছিল না। এর সঙ্গে আরএকটি ক্ষুদ্র ব্যাপার জড়িয়ে ছিল। ঐ জমি কোন প্রজার ভোগদখলে ছিল; সে অন্যত্র উঠে যেতে চায় জেনেই স্কুলবাড়ির জন্য ও আদর্শ ভ্রাতৃসমাজের প্রধান কার্যালয় হবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে মনোনীত করা হয়েছিল। আমি বিভিন্ন শরিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জমিটুকুর মালিকানাস্বত্ব আয়ত্ত করতে ব্যস্ত আছি,—এমন সময় জানলাম যে, আমার বিলম্ব দেখে আদর্শ-ভ্রাতৃসমাজের ছেলেরা স্বীয় শ্রমার্জিত কিছু টাকা উক্ত প্রজাকে হস্তান্তরকরণের পারিতোষিকস্বরূপ দিয়ে জমির প্রজাস্বত্বাধিকারও পেয়েছে।

এই মনোনীত ভূমিতে আদর্শ ভ্রাতৃসমাজের উদ্যোগে পরিচালিত পাঠশালাটি প্রথমে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ক্রমে তা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অমরকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে তখন এর নামকরণ হয় 'অমরকৃষ্ণ পাঠশালা'। এই অমরকৃষ্ণ পাঠশালা আজও ভাটপাড়ায় সগৌরবে বিদ্যমান আছে।

১৯৭৩ সাল নাগাদ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির পঞ্চদশ বর্ষ পূর্তি হয়। কয়েক বৎসর পর নবাগত প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের এদিকে নজর পড়ে। এই শুভ বর্ষ উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব কেন পালিত হয় নি এ নিয়ে তিনি সহকর্মী শিক্ষকদের কাছে অনুসন্ধান করেন। তখন তিনি জানতে পারলেন যে

বিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ পরিচালকবর্গ এ বিষযে আগ্রহশূন্য। তখন তিনি কর্মী-প্রধান ধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্য ও সহকর্মী শিক্ষকগণের সঙ্গে আলোচনা করে কয়েক বৎসর পরে হলেও জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানেব জন্য উদ্যোগী হন। তাঁরই উৎসাহে আমি জয়ন্তী উৎসবে বিদ্যালয়টির আদি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সমাদরে নিমন্ত্রিত হই। আমি এই নিমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করেছিলাম এবং নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। সেই সভায় ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু-চারটি কথাও বলেছিলাম। জয়ন্তী উৎসব দেখে আমি খুশী হয়েছিলাম সত্য, কিন্তু এই অনুষ্ঠানে নূতন যুগেব আদর-আপ্যায়নের রীতিনীতির প্রবর্তন আমার মনকে পীড়িত করেছিল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার বিদ্যালয় ভারতীয় ভাবধারা হতে দূরে সবে যাচ্ছে আর আমাব শিক্ষাদর্শ আধুনিক যুগেব প্রভাবে ব্যর্থ হতে চলেছে।

পূর্বেই বলেছি, চিকিৎসায় ব্যস্ত থাকার দরুণ এবং নানা অসুবিধাবশতঃ মায়ের পরলোক গমনেব পর থেকে আদর্শ ভ্রাতৃসমাজের সঙ্গে আমার সংস্রব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। আমার বন্ধু হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত কিছু খবরাখবর নিযে এসে আমাকে জানাত এবং আমিও বন্ধুকে নানারকম সুপবামর্শ দিতাম। ক্রমশ ভ্রাতৃসমাজের কর্মোদ্যম মন্দীভূত হতে চলেছিল, তবুও পিতাব জীবদ্দশায আমার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা হয়েছে, এবং কাজও একরকম চলছিল। আমার বন্ধুবর হরপ্রসাদের প্রচেষ্টায ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আদর্শ ভ্রাতৃসমাজের অস্তিত্ব বজায ছিল। ঐ বৎসর হরপ্রসাদের দেহাবসান ঘটে এবং শত্রুভাবাপন্ন নানা লোকের আসুরিক আঘাত এব উপর পড়ে। বন্ধুবব কেশবচন্দ্র বায় একা সেই ধাক্কা সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যায় আব প্রতিষ্ঠানটিও লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে।

শরীরচর্চা ও ব্যায়াম অনুশীলন

আমি বরাবরই ব্যায়ামের পক্ষপাতী। ছোট বয়সে দেশের বাড়িতে এবং কলিকাতায় মামার বাড়িতে ব্যায়াম অভ্যাস করতাম। স্বাস্থ্য মানুষের একটা বড সম্পদ। 'শরীরমাদ্যম খলু ধর্মসাধনম্।'—এই ধারণা আমার মনে সুদৃঢ় ছিল। আমার সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্যবান দেহ দেখে অনেকেই আমাকে ঈর্ষা করত। চিকিৎসা কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, এই সময় সিটি কলেজে

এক নূতন ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অধ্যক্ষ ও পরিচালক ছিলেন শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই রাজেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যায়ামবীর গোপালচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তি আমার সুহৃদ ছিলেন, কাজেই ঐ ব্যায়ামাগারে আমি সহজেই শরীরচর্চার সুযোগ পেয়ে গেলাম। দুই-তিন বছর সিটি কলেজের ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম অভ্যাস করি। তারপর বন্ধু গোপালচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ইউনিভার্সিটি ল' কলেজে আইন পড়বার উদ্দেশ্যে হার্ডিঞ্জ হস্টেলে চলে আসেন। তখন হার্ডিঞ্জ হস্টেলের অভ্যন্তরেও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রদ্ধের মাস্টারমশাই রাজেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা এই ব্যায়ামাগারেরও অধ্যক্ষ ও পরিচালক হয়েছিলেন। গোপালচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ঐ ব্যায়ামাগারেই তখন ব্যায়াম অনুশীলন করতে থাকেন। একারণে আমি ও আমার বন্ধু গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য আর সিটি কলেজের ব্যায়ামাগারে যেতাম না। ঐ হার্ডিঞ্জ হস্টেলের জিমন্যাসিয়ামে আমরা শরীরচর্চা করতাম; অবশ্য সিটি কলেজের ব্যায়ামাগারে মাঝে মাঝে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতাম। সেবাকার্যে আমার ঝোঁক ছিল বলে এবং চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, এজন্যও আমার উপরে এক অহেতুক দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল। উক্ত দুই ব্যায়ামাগারে ব্যায়ামপ্রদর্শনকালে শরীর-চর্চায় নিরত বন্ধুবর্গের শরীরে যখন আঘাত লাগত, কারও দেহ ক্ষত-জখম ইত্যাদি হত তখন আমাকে চিকিৎসার নানারকম ব্যবস্থা করতে হতো।

অল-বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন গঠনে আমার অবদান

সিটি কলেজের ব্যায়ামাগারে বৎসরে একবার ব্যায়াম-প্রদর্শনী হত। শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই রাজেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা, গোপালদা, কেশব সেন, সত্যচরণ ভট্টাচার্য, যতীন, শৈলেন প্রমুখ ব্যায়ামবিশারদ ব্যক্তিরা এবং তরুণ ব্যায়াম শিক্ষার্থীরাও নানাবিধ চমৎকার ব্যায়ামক্রীড়া প্রদর্শন করতেন। শ্রদ্ধেয় রাজেন গুহঠাকুরতা, গোপালচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, আর ব্যায়াম সমিতির অনেকে মিলে আমরা মাঝে মাঝে সিটি কলেজের ব্যায়ামাগারে বৈঠকে বসতাম। এই বৈঠকে আমাদের মধ্যে ব্যায়াম ও অঙ্গচালনার কৌশলগুলি সারা বাংলাদেশে প্রদর্শন ও প্রচার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হত। বিশিষ্ট

ব্যায়ামপ্রদর্শনকারীরা পাবনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরে দলবলসহ গিয়ে কয়েকবার ক্রীড়া প্রদর্শন করেছিলেন।

গোপালচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী—আমাদের প্রিয় গোপালদা তখন হার্ডিঞ্জ হস্টেলে থেকে ল' পড়ছিলেন এবং হস্টেলের অন্তর্গত ব্যায়ামাগারে অঙ্গচালনা অনুশীলন করতেন। একদিন তিনি জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, ব্যায়ামাগারের নীচে নেমে আসতে পারেন নি। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, বিখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় ও আমি গোপালদাকে দেখতে গিয়েছি। ঐদিন সেখানে আমরা কয়েকজন মিলে এক আসরে একথা ওকথা আলাপ করছি, তখন প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় সমগ্র বাংলাদেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একটি ব্যায়াম সঙ্ঘ গঠনের কথা তোলেন। আমরা সকলে এ বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর প্রস্তাবটি সমর্থন করলাম। তারপব আমরা শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই উপদেষ্টা-সুহৃৎ বাজেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতাকে একথা জানাই। তিনি আমাদের যুক্তিপূর্ণ কর্মপন্থা নির্দেশ করে দেন। এতেই 'অল-বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোশিয়েশন' (All-Bengal Physical Culture Association—A.B.P C.A.) গঠনের সূত্রপাত হয়। গোপালদা, আমি, গৌরীকান্ত ও হেমবাবু এই ব্যাপারে রাজেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে উদ্যোগী ও যত্নবান হয়ে উঠি। আমাদের বহু প্রয়াস-প্রচেষ্টার ফলে ব্যায়ামশিক্ষাপ্রচারক সর্ববঙ্গীয় শরীরচর্চা পবিষদ গঠিত হয়েছে। ক্রমে এই-সমস্ত বিবরণ সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করলাম। দেশবরেণ্য রাজনৈতিক নেতা ও সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনি অকৃতদার ও বিপুল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। ব্যায়াম, ক্রীড়া, শরীরচর্চা ইত্যাদি বিষযে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। অ্যাডভোকেট গোপালদার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল সহকর্মী হিসাবে। এই সূত্রে গোপালদার সঙ্গে হেমবাবু, শ্রদ্ধেয় রাজেন গুহ-ঠাকুরতা, গৌরীকান্ত ও আমি তাঁর কাছে যাই, এই প্রস্তাবিত ব্যায়াম পরিষদ গঠনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে। তাঁর সঙ্গে প্ল্যান বা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করি। তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠে আমাদের খুব উৎসাহ দেন। তাঁরই প্রভাবহেতু স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সলি-সিটর যতীন্দ্রনাথ বসু এর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দেশের এই-সকল

বরেণ্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি নিজে এর সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন, অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছিলেন, শ্রীরামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষের পদ নিয়েছিলেন। আমি, গোপালদা, গৌরীকান্ত সকলে সদস্য হয়েছিলাম। সলিসিটর যতীন্দ্রনাথ বসুর নির্দেশমত এখন 'অল্-বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন' ও কর্মপরিচালক সমিতি আইনগতভাবে রেজিস্ট্রি করা হলো। তখন দেশভক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা কর্পোরেশনের একজিকিউটিভ অফিসার ছিলেন। ব্যায়াম পরিষদ ভবন নির্মাণের জন্য কিছুটা জমির প্রয়োজন হয়। আমরা আবশ্যক জমি চেয়ে কর্পোরেশনে সুভাষবাবুর কাছে অনুরোধ জানাই। তিনি সানন্দে তাতে রাজী হলেন। তাঁর মধ্যস্থতায় ব্যায়াম পরিষদ ভবনের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের পশ্চিম দিকে আর মহম্মদ আলি পার্কের পশ্চাৎ ভাগে ১৭৫ ফুট ফ্রন্টেজ প্রায় তের কাঠা এগার ছটাক পরিমিত একফালি জমি ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ঐ ভূমির বাৎসরিক খাজনা একটাকা মাত্র নির্দ্ধারিত হয়। ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠানের কাজ চালাবার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ গলদঘর্ম হতে ও দৌড়াদৌড়ি করতে হয় নি। ক্যাপ্টেন ব্যানার্জির কাছ থেকে অর্থসাহায্য পেয়ে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

জিতেন্দ্রবাবুর তখন বৃদ্ধ বয়স, তিনি প্রায়ই অসুখে-বিসুখে ভুগছিলেন। আর তাঁর নিকট আত্মীয় কেউই কাছে ছিলেন না। এক বেয়ারা 'বয়'-ই সব সময় তাঁর কাজকর্ম করত, তাঁকে দেখাশোনা করত। তাঁর কোন দূরসম্পর্কীয়া এক আত্মীয়াও ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে তাঁর চেম্বারে আসতেন; কিন্তু এই স্বার্থান্বেষী মহিলা ও ভৃত্যকে কোন গূঢ় কারণে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখতেন—একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। এইহেতু তাঁর মনের মধ্যে নিত্যই একটা আতঙ্কের ভাব বিরাজ করত। আমি, হেমবাবু, গোপালদা তাঁর খুব বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছিলাম। তিনি আমাদের খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর ভয় লাঘব করার উদ্দেশ্যে আমরা প্রায় দিনই তাঁর কাছে যেতাম—কখনও একাকী, কখনও বা দলবদ্ধ হয়ে। শ্রদ্ধেয় রাজেন গুহঠাকুরতা এবং গৌরীকান্তও মাঝে মাঝে যেতেন। আমাদের দেখে তাঁর মন প্রফুল্ল হত, সুতরাং তিনি আমাদের উপর অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, ব্যায়াম খেলাধুলা ইত্যাদিতে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। তাই ব্যায়াম পরিষদের ব্যয় নির্বাহের জন্য

তাঁর প্রাক্‌-মৃত্যু-ইচ্ছাপত্রে (will) আমাদের লক্ষাধিক টাকা ও তালতলার ডাক্তার লেনে কিছু ভূসম্পত্তিও দান করে যান। জমি সংগ্রহের কয়েক বছর পরে ঐ টাকাও আমরা পাই। স্যার রাজেন মুখোপাধ্যায়, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও স্যার মন্মথ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে তখন একটি 'ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছিল এবং এর নিকটই এই অর্থ ও সম্পত্তি রক্ষিত হয়েছিল। এখন ভবন নির্মাণ-কাজে আমরা অগ্রসর হই।

তখন মার্টিন কোম্পানির একজন ইঞ্জিনিয়ার ব্রাউন সাহেব বিলাত যাত্রা করছিলেন। আমরা তাঁকে অনুরোধ জানাই বিলাতের বিভিন্ন বিখ্যাত শরীরচর্চার কেন্দ্রগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ও ব্যায়ামাগার সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে। আমাদের বিশ্বাস ছিল, উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা রচনায় এইসব তথ্যাদি ও অভিজ্ঞতা খুব কাজে লাগবে। প্রায় মাস ছয়েকের মধ্যে ব্রাউন সাহেব কলিকাতায় ফিরে এলেন। ব্যায়াম সঙ্ঘের পরিচালকেরা মার্টিন কোম্পানিকে ব্যায়াম ভবনের পরিকল্পনা রচনা করবার ও কক্ষাদি নির্মাণের ভার দিলেন গঠন ও বিন্যাসের নিজস্ব রুচিসম্মত কিছু কিছু নির্দেশ সমেত, কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা নানাবিধ ব্যায়াম কৌশলের অনুশীলন শুরু করে দিয়েছিলাম। আমাদের মনোনীত জমির দক্ষিণে অতি নিকটে দিল্লী অঞ্চলের অধিবাসী প্রসিদ্ধ বণিক জগন্নাথ গুপ্তের বিশাল বাসভবন ছিল। আমি, হেমচন্দ্র রায়, অধ্যাপক মহান্তি ও শ্রদ্ধেয় রাজেন গুহঠাকুরতা বিশেষ উদ্যোগী হয়ে তাঁর বাড়ির উত্তরাংশে পথের ধারে একটি লম্বা প্রশস্ত ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। ঐ বৃহৎ কক্ষেই ব্যায়াম-ভবনের সূচনা হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ব্যায়াম ভবনের কিছু অংশ তৈরি হয়েছে, সমস্ত কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয়নি, এমন সময় কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধে। দাঙ্গার সময় আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম মুসলমান দুর্বৃত্তদের হাতে। তারা নির্মীয়মাণ কক্ষাদি দিনের পর দিন ভেঙে দিয়ে গেছে। এইসকল দুর্জনেরা নানা ধরনের উৎপাত করেছে,—ব্যায়াম অনুশীলনের অতি প্রয়োজনীয় বহুমূল্য যন্ত্রপাতি এবং প্রখ্যাত অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি কর্তৃক উৎসর্গীকৃত অনেক দুর্লভ শরীরচর্চা-বিষয়ক গ্রন্থ তারা লুটে নিয়েছে আর চেয়ার, টেবিল, আসবাব-পত্র ভেঙেচুরে দিয়েছে। একরকম বৎসরকাল এইভাবে আমরা উৎপীড়িত হয়েছি।

এই ব্যাপারে আমি নিজে বহু কষ্ট সহ্য করেছি—বহু মাস ধরে নালিশ নিয়ে

পুলিশের দরজায় ধর্না দিতে হয়েছে। আমি আমার আসবাব-ব্যবসায়ী রোগীদের কাছ থেকে টেবিল চেয়ার ইত্যাদি চেয়ে নিয়ে আপাতত কাজ চালাবার ব্যবস্থা করেছি এবং সাময়িক বিজলী বাতির জন্য সামান্য কিছু খরচ নিজে করেছি। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যায়াম ভবনের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্যায়াম সঙ্ঘের কার্যাবলী আরম্ভ হয়। বাংলাদেশের ছোট ছেলেমেয়েদের নৈতিক ও শারীরিক শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত নাগরিক গঠনের দিকেই বরাবর আমার নজর ছিল; কিন্তু কিছুকাল পরে যখন দেখলাম পরিচালকমণ্ডলী আমার কথা গ্রাহ্য করছেন না,—আমার উদ্দেশ্য বিফল হতে চলেছে, তখন আমি অনেকটা নিরুৎসাহ ও নিস্পৃহ হয়ে পড়লাম, কেবল আজীবন সদস্যপদই আমার বহাল রইল।

হোমিওপ্যাথির উপর অনাস্থা দূরীকরণে প্রয়াসে সাফল্য লাভ

জগন্নাথ গুপ্তের গৃহে যখন আমরা 'বঙ্গীয় ব্যাযাম সঙ্ঘের' বাড়িভাড়ার জন্য গিয়েছি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে বাড়িভাডা নেব বলে, সেই সময় আমি তাঁকে ভাড়া কমাবার অনুরোধ করি। তখন গুপ্তমশাই বললেন, 'আমি নিজেই এখন বিপন্ন, কি করে এ-অবস্থায় আপনাদের উপকার করতে পারি?' জগন্নাথ গুপ্ত তখন সত্যই ভীষণ অসুস্থ ছিলেন, তিনি Mastoid Abscess রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। প্রথমে ডাক্তার জে. এন. মজুমদার, ডাঃ ইউনান প্রমুখ কলিকাতার খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ তাঁর চিকিৎসা করেন, কিন্তু তাঁদের প্রায় দুই বৎসর চিকিৎসাতেও কোন ফল পেলেন না। তারপর কলিকাতা মেডিকেল কলেজের 'চোখ-নাক-গলার' (Ear, Nose, Throat) রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জুডা সাহেব অ্যালোপ্যাথিক মতে সাড়ে পাঁচ কি ছয় বৎসর জগন্নাথ গুপ্তের চিকিৎসা করছিলেন, কিন্তু নাছোড়বান্দা নিদারুণ রোগ কিছুতেই হার মানছিল না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়েছেন একথা না-শোনা থাকার কারণে আমি তাঁকে বলি, "হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করালে মন্দ হত কি? নিশ্চয়ই আপনি এত দিনে আরোগ্য লাভ করে যেতেন।" তখন গুপ্তমশাই আমার উপর দারুণ চটে যান আর বলে উঠেন, "রাখুন রাখুন, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বোগাস, এতে আবার কখনও অসুখ সারে? জে. এন. মজুমদার, ইউনান সাহেব এতদিন চিকিৎসা করেও রোগ সারাতে পেরেছেন? এর পর অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাই আমার মনঃপূত

হয়েছে, আমি মরি বাঁচি, যা ঘটে ঘটুক, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা আমি করাবই ; আপনার কথা আমি গ্রাহ্য করি না।” জগন্নাথ গুপ্তের কটূক্তিতে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগে। তখন আমি রুষ্টকণ্ঠে বললাম, “মি. গুপ্ত, আপনি একটি সায়েন্সকে তাচ্ছিল্য করছেন, অবমাননা করছেন, কোনো ব্যক্তিবিশেষকে নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করছেন না ; মনে রাখবেন এটা মস্ত বড় ধৃষ্টতা। আমার চিকিৎসাধীনে আসুন, গাড়ি পাঠিয়ে দিলেই আমি আসব। একটি পয়সা ‘ফি’ না নিয়ে আপনাকে সুস্থ করে তুলব। তখন কিন্তু আপনার এই নির্লজ্জ উক্তি দশজন নামকরা ভদ্রলোকের সামনে প্রত্যাহার আপনাকে করতে হবে। আর আমি যদি বিফলমনোরথ হই, আপনাকে একেবারে নীরোগ সুস্থ করে তুলতে না পারি, তবে আমি নিজের হাতেই তার জন্য সাজা নেব—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে আবার মাথা হেঁট করে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় হাত দেব।” কিন্তু সেদিন জগন্নাথ গুপ্ত আমাকে আমলই দেন নি, আমার কথা অবজ্ঞাভরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

প্রায় মাসখানেক গত হলে, একদিন সন্ধ্যাবেলা জগন্নাথ গুপ্তর বড ছেলে গাডি নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির হন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভদ্র-লোকটি বলেন—“মা আপনাকে একবার ডাকছেন, এখনই চলে আসুন। বাবার অবস্থা খুব খারাপ, কয়েকদিন যাবৎ ‘লক-জ’ (lock jaw) হয়ে বাকশক্তিরহিত হয়ে গেছেন, আহারাদিও বন্ধ, এখন শেষ অবস্থায় এসে পৌচেছেন। ডাঃ জুডা আজ জবাব দিয়ে গেছেন। এখন আপনি শেষ ভরসা।” আমি তাঁকে কয়েক মাত্রা ঔষধ দিয়ে সেই রাত্রের মতো বিদায় দেই। পবের দিন সকালে জগন্নাথবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি অনেকটা সুস্থই হয়ে উঠেছেন—দু-একটা কথ'ও বলতে পারছেন। আমি অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের সমস্ত সংস্রব ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়ে ক্ষতস্থানে ড্রেসিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। এক মাস দু-দিন আমার চিকিৎসাধীনে থাকার পর জগন্নাথ গুপ্ত মশাই সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে ওঠেন। তিনি দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। ছয়-মাস পর নিঃশেষে সন্দেহমুক্ত হয়ে গুপ্তমশাই নিজের শপথ রক্ষা করে-ছিলেন,—নিজের কটূক্তির জন্য তাঁর অ্যাটর্নি প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা ও অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোকের সামনে আপন পুত্র-কন্যাদের উপস্থিতিতে আমার কাছে মাপ চেয়েছিলেন। এই বিস্ময়কর ঘটনার পর থেকে জগন্নাথ গুপ্তের সত্যই হোমিওপ্যাথিকের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সঞ্জাত হয়েছিল।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রসারকল্পে উদ্যোগ

এইভাবে বহু জটিল রোগে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নিরাময়কর গুণে আমি নিজেই মুগ্ধ হই। তখন আমার মনে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রসারের জন্য খুব আগ্রহ জাগে। অথও বাংলায় যখন লীগ-গভর্নমেণ্টের রাজত্ব তখন নবাব হবিবুল্লা সাহেব ঐ সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সরকারী স্বীকৃতি হওয়ার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি। আমি একদিন সৈয়দ আবত্নর রব ও আমিন সাহেবদের সহিত পরামর্শমত হবিবুল্লা সাহেবের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে গিয়ে দেখা করি। অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরও দৈবক্রমে সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা তুইজনে একসঙ্গে নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ কবি। অধ্যাপক কবির হোমিওপ্যাথিকের বিস্ময়কর গুণ ও জনকল্যাণ সাধনে এর মস্তবড উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে 'সার্ভেণ্ট অব হিউম্যানিটি' পত্রিকাব সম্পাদকের মতামত ও আমার একটি কেস সম্বন্ধে আলোচনান্তে হবিবুল্লা সাহেবকে প্রাঞ্জল ভাষায় সারকথা বুঝিয়ে দেন। নবাব হবিবুল্লা আমাব কথা শুনে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তিনি আমাকে হোমিওপ্যাথির উন্নয়নকল্পে প্রতিশ্রুতি দেন। প্রসঙ্গক্রমে হবিবুল্লা সাহেব আমাকে বলেন—"রোগ সারানোর ব্যাপারে আপনার অপূর্ব দক্ষতার কথা ইয়াকুব সাহেব, আব্বাস আলি, মোশারফ হোসেন, শহিদ সুরাবর্দী প্রমুখ আমার বন্ধুবর্গ ও পরিচিত মহলের কাছে বহুবার শুনেছি। আমি আপনার নাম ও চিকিৎসা বিষয়ে বেশ ওয়াকিবহাল আছি। হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞান যে অবহেলার বস্তু নয়, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। হোমিওপ্যাথিকে সরকারি স্বীকৃতিদানের জন্য আমি যথাশক্তি প্রয়াস পাব।" নিজ প্রতিশ্রুতিমতো হবিবুল্লা সাহেব কাজ করেছিলেন।

আড়াই মাস তিন মাস পরে একদিন অপরাহ্লে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মিঃ ডি. সি. ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীঅরুণ ঘোষ মহাশয় আমাকে ফোনে ডেকে বলেন, "নবাব হবিবুল্লা সাহেব আপনাকে জানাতে বলেছেন যে, অ্যাডভাইসরি হোমিওপ্যাথিক বোর্ড সম্প্রতি গঠন করা হচ্ছে। এর মারফত হোমিওপ্যাথির উন্নয়নের চেষ্টা হবে সরকারী সহায়তায়। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ও অনুরোধ যে, আপনি এতে যোগদান করেন। আপনার আগ্রহে, উৎসাহেই তো এই উদ্যম!" আমি তখনই সে ফোনের ডাক মারফত জবাবে জানতে চাই—কোন্ কোন্ ব্যক্তি ঐ অ্যাডভাইসরি বোর্ডেব সদস্য হচ্ছেন। শ্রীঅরুণ ঘোষের কথায় যখন জানতে পারলাম যে,

ডাঃ ইউনান সাহেব, শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কলিকাতার বরেণ্য হোমিওপ্যাথরা বোর্ডে আমন্ত্রিত হননি, নিম্নাধিকারী বহু হোমিওপ্যাথই এতে যোগ দিচ্ছেন জেনে, তখন আমি এই ব্যাপারে একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি। আমি কিছুতেই বোর্ডের সদস্য হতে সম্মত হইনি। শ্রীঅরুণ ঘোষ মহাশয়ের বহু পীড়াপীড়িতেও আমি নিজের মত পরিবর্তন করিনি। যাই হোক, অ্যাডভাইসরি হোমিওপ্যাথিক বোর্ড হয়েছে দেখেই আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। এতে আমার যোগ দেওয়া না-দেওয়া এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় নি এই ভেবে যে, এই বোর্ড গঠনে আমার উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। কারণ, আমি চেয়েছিলাম হোমিওপ্যাথিকের ব্যাপক প্রসার ও রুগ্ন পীড়িত জনসমাজের কল্যাণ। ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হয়ে হোমিওপ্যাথিকের বড়াই করতে যাই নি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কি রকম বিস্ময়কররূপে রোগ উপশম হয় নিজ অভিজ্ঞতায়ই তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। নিচে দু-একটি কেস-এর উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে বলেই মনে করি। আশুতোষ বোস নামে এক ভদ্রলোকের কন্যা বারুইপুরের জমিদারবাড়ির কুলবধূ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। কলিকাতার যশস্বী একজন স্ত্রী-রোগবিশেষজ্ঞ তাঁকে বরাবর দেখছিলেন। অবশেষে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, 'রোগ কিছুই নয়—পেটে আট মাসের একটি সন্তান, তাই এই কষ্ট।' তিনি বলেন 'বিশ্রামই এর আসল চিকিৎসা।' কন্যার দারুণ কাতর অবস্থা দেখে পিতা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাই তিনি কন্যাকে দেখাবার জন্য তাঁর বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন। রোগিণীকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়—গর্ভস্থ সন্তানটি এখন স্বাভাবিক অবস্থায় নেই—টিউমারে পরিণত হয়েছে। আমি আমার এই মত প্রকাশ করায় সেই বিশেষজ্ঞ খুব হেসেছিলেন; কিন্তু আমার ঔষধ খাওয়ার পর যখন লোহার মতো শক্ত টিউমারটি বেরিয়ে এল তখন সকলে চমকিত হলেন। বলা বাহুল্য, মহিলাটি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করেন। এক্সপেরিমেন্ট-এর উদ্দেশ্যে ঐ শিশু-টিউমারটি নিয়ে আসি এবং বৈয়মের ভিতর ঔষধে ভিজিয়ে সংরক্ষণ করি। পরে কয়েকখানি স্লাইড তৈরি করে ডাঃ কেদার দাস, ডাঃ ডি. এন. বোস, ডাঃ এস. কে. বোস প্রমুখ আমার হিতৈষীদের দেখিয়েছিলাম।

মনে পড়ে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে একদিন ভোরে তালতলার সুবিখ্যাত ডাক্তার বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ইন্টেসটাইনাল অবস্ট্রাকশন-এ হঠাৎ

আক্রান্ত হন। এতে তিনি খুব আতঙ্কগ্রস্ত হন। ডাঃ ঘোষ প্রথমে ডাঃ ললিত ব্যানার্জিকে ফোনে ডাকেন। ললিতবাবুর যেতে কিছু দেরি হবে বলায় আর অস্ত্রোপচারে বিপদের আশঙ্কায়ও বটে তিনি নিরুপায় হয়ে আপাততঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাবেন, ঠিক করেন। তিনি অবিলম্বে শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবুকে ফোনে ডাকেন; কিন্তু সেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে বারিদবরণবাবু জ্বরে অসুস্থ ছিলেন, তাই যেতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে বলেন,—"গৌর, ডাঃ বীরেন ঘোষের ইণ্টেসটাইনাল অবস্ট্রাকশন হয়েছে; আমি তো যেতে পারছি না। তুমি গিয়ে তাঁকে চিকিৎসা করো।" আমি অতি সত্বর ডাঃ ঘোষের বাড়িতে তালতলায় চলে যাই। তখনও ললিত-বাবুর আসতে কিছু দেরি আছে। আমি তক্ষুনি ডাঃ ঘোষকে এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খেতে দিয়ে সবিনয়ে বলি, "আধ ঘণ্টার মতো সময়ে ঔষধের ফলাফল দেখতে পাবেন। এর বেশি সময় আমি নেব না।" আশ্চর্যের বিষয়, দশ-পনর মিনিট যেতে না যেতেই ফ্লেটাস্ বার হয়ে যাওয়ায় ডাঃ বীরেন ঘোষ সুস্থ ও সঙ্কট-মুক্ত হন। তাঁর হাবভাবে মনে হল, তিনি যেন নব জীবন পেয়েছেন। তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়ে ওঠে; উল্লসিত হয়ে তিনি মুক্তকণ্ঠে আমাকে অনেক সাধুবাদ করেন এবং প্রাণভরে আমার সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য কামনা করেন। ললিতবাবুকে তিনি ফোনে ডেকে বলে দেন,—আর আসার দরকার নেই, আর আমিও বাড়ি ফেরার পথে ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা করে সকল কথা তাঁকে জানিয়ে আসি। এধরনের মারাত্মক সার্জিকাল কেসে-ও যে হোমিওপ্যাথিকে এরূপ কল্পনাতীত সুফল লাভ হয়, তা এ প্রথম উপলব্ধি করিলাম।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত বলরাম বসুর নাম বঙ্গদেশের শিক্ষিত ও ধার্মিক মহলে কারো অজানা নেই। শ্রদ্ধেয় বলরামবাবুর পুত্রবধূ, রামকান্ত বসুর স্ত্রী সুশীলা বসুর খুব বড় পিত্ত-পাথুরী (gallstone) হয়েছিল। শেষদিকে ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, ডাঃ সুবোধ দত্ত ও ডাঃ মণি সরকার তাঁকে দেখছিলেন। গলস্টোনটি ম্যালিগনান্ট্ হয়ে উঠেছে, এরূপ সন্দেহে তাঁরা তিনবার ডিপ থেরাপি প্রয়োগ করেছিলেন। এতে বিপরীত ফল ফলে, প্রথম বারের প্রয়োগে জ্বর ১০৫' ডিগ্রী, দ্বিতীয় বারের প্রয়োগে ১০৬' ডিগ্রী আর তৃতীয় বারের প্রয়োগে জ্বর ১০৭' ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে যায়। মহিলার ত্রাস জনক অবস্থা দেখে এই-সকল সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ডাঃ নলিনীবাবু তখন আর অধিক ড্রীপ থেরাপির প্রয়োগ নিষেধ করে

দেন। তিনি রোগিণীর জীবনের সকল আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন ; তাই নিরুৎসুক কণ্ঠে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে রোগিণীকে জবাব দিয়ে চলে যান। এরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় ডাঃ সুবোধ দত্তও শরীরে অস্ত্রোপচার করতে অস্বীকৃত হন। ভদ্রমহিলাটির জামাতা ডাঃ মণি সরকার শেষ চেষ্টা হিসাবে কেবল এখন গোটা তিনেক ইনজেকশন করতে চান। এমনই সংকটকালে মহিলাটির পুত্র রাধাকান্ত বসু বিকেল বেলা আমাকে ফোনে ডেকে অনুরোধ জানান, অন্তিম দশায় তাঁর মাকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করবার জন্য। আমি মহিলাটির চিকিৎসা করি। আমার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রথম কয়েক মাত্রা খাবার পরই সঙ্কটজনক অবস্থা কেটে যায়। তিন-চার মাস ঔষধ ব্যবহারের ফলে পাথুরী গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, মহিলাটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। এর পরও তিনি বহু বৎসর জীবিত ছিলেন। এই অসামান্য ঘটনায় ডাঃ নলিনী-রঞ্জন সেনগুপ্ত, ডাঃ মণি সরকার প্রমুখ যশস্বী চিকিৎসকেরাও হোমিওপ্যাথি-কের দিকে সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করতে থাকেন।

সবশেষে আমার প্রাক্তন রোগী জগন্নাথ গুপ্তের ছেলে বাবু মূলচাঁদ গুপ্তের কথা বলছি। ১৯৩৪ সালে তিনি অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগে দারুণ রকমে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে পড়ায় কলিকাতার খ্যাত-নামা প্রধান প্রধান শল্যচিকিৎসকদের ডাকা হয়। ডাক্তারদের মতামত শুনে বাড়ির সকলেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা বলেছিলেন অ্যাপেণ্ডিক্সটা খুবই পেকে গিয়েছে—অবিলম্বে অস্ত্রোপ্রচার দরকার, নতুবা যে কোন মুহূর্তে এটা ফেটে গিয়ে পেরিটোনাইটিস হয়ে যেতে পারে। আর এরূপ ভয়ানক অবস্থা দেখা দিলে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে বাধ্য। ডাক্তার-বাবুদের কথা শুনে রোগীর মা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পছন্দ করলেন না। পূর্বের ঘটনায় হোমিওপ্যাথির প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস হয়েছিল। তিনি ভগবানের নাম করে আমাকে ডেকে নিয়ে আমার উপব রোগীর চিকিৎসার ভার ছেড়ে দেন। আমার চিকিৎসায় মূলচাঁদ কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে ওঠেন ; কিন্তু আহূত চিকিৎসকদের কথায় তাঁর মনে সন্দেহ দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল যে, রোগটি আবার ফিরে দেখা দিতেও পারে। এই কারণে মূলচাঁদবাবু পুরো আঠারটি বৎসর অপেক্ষা করে আরোগ্য সম্পর্কে একেবারে সুনিশ্চিত হয়ে আমাকে স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পত্র দিয়ে-ছিলেন। তাঁর চিঠির একটুখানি অংশ এখানে তুলে দেওয়া অসমীচীন হবে না "Then Dr. Gourhari Bhattacharyya, undertook to cure

the disease without operation. So, as directed by him, I started taking Homœpathic medicine which cured me. It is over eighteen years since then. I am glad to say that I have had no attack of pain in the abdomen." মূলচাঁদবাবুর চিঠি পড়ে আমার খুব আনন্দ হল, মনে মনে ভাবলাম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হয়ে আমি নিজ জীবনকে ধন্য করেছি।

কলিকাতার পল্লী হিন্দুমহাসভার দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য

হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে এখন আমার মনের সকল দ্বিধা ও অবসাদ কেটে যাওয়ায় সমাজকল্যাণে হোমিওপ্যাথিকের প্রসার ও প্রচারের জন্য খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে নীতি-ধর্ম শিক্ষা ও দেশাত্মবোধে ছোট ছেলেমেয়েদের জাগ্রত করার প্রয়োজনবোধ করেছিলাম। আর 'দুনিয়ার যাকিছু ভাল, আপন ছাঁচে ছেপে নিয়ে এগিয়ে চলার শপথ গ্রহণ করিয়ে —স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ নাগরিক গড়ে তুলতে আমি বরাবরই চেয়েছিলাম। আন্তরিক আগ্রহে দায়িত্বশীল, সৎস্বভাব বিশিষ্ট চরিত্রবান ও নিয়মানুবর্তী নাগরিক সৃষ্টি করে দেশের সমাজের সত্যকার উন্নয়ন ও হিতসাধন করাই আমার জীবনের ব্রত—আমার গঠনমূলক কাজের সারবস্তু। এই কাজে যত আমার উৎসাহ ও আনন্দ অন্য কিছুতেই তেমন নয়। পরিণত বুদ্ধি নিয়ে যখনই যেখানে গিয়েছি সেখানেই উত্তম নাগরিক গড়ে তোলার আদর্শ প্রচারে সচেষ্ট হয়েছি। নিজের গ্রামে ভাটপাড়ায় আমার প্রতিষ্ঠান ও ছেলেদের নূতন ধরনে ট্রেনিং দেওয়ার কথা পূর্বে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা কাজে অতিশয় ব্যস্ত থাকার দরুন ভাটপাড়ায় যাবার তেমন সময় হত না—কলিকাতার চৌহদ্দির ভিতরই আমাকে আবদ্ধ থাকতে হত। তখন আমরা রাধানাথ মল্লিক লেনের ও বেনেটোলা অঞ্চলের বাসাবাড়িতে বাস করি। এই সময় বহু কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও একেবারে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়িনি, নিজের কর্মাদর্শ ভুলিনি। কলিকাতায় প্রথমে 'ভারত-ভবিষ্যৎ-সঙ্ঘ' গঠন করি। কলিকাতা মহানগরীতে বিচিত্র রুচির বিচিত্র মনোভাবের লোক বাস করে। এখানে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এত উগ্র যে, তাদের স্বমতে নিয়ে এসে কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে গঠনমূলক কাজে

উদ্‌বুদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এই সময় হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, বিখ্যাত আইনজীবী সনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তির সঙ্গে এই সূত্রে পরিচয় হয়েছিল। এদিকে ভারত-ভবিষ্যৎ-সঙ্ঘের কাজও উৎসাহী কর্মী ও সদস্যের অভাবে তেমন সুবিধামত চলছিল না। তাই মনে মনে ইচ্ছা হল—যদি অভিভাবক-মণ্ডলীর সঙ্গে ব্যাপক পরিচয় ঘটে, তবে ভাল হয়। এরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের প্রভাবে ছেলেমেয়েরা হয়তো আমার প্রতিষ্ঠানের কাজে এগিয়ে আসতে পারে; আর হিন্দু মহাসভার কর্মসম্পাদনার মধ্য দিয়ে আমার এই বহু পরিচিতির সুযোগ অবিলম্বে জুটেও গেল।

সনৎকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। অকস্মাৎ স্ত্রীবিয়োগে শোকে আঘাত পেয়ে তিনি এই দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছুক হন। তিনি আমাকে তাঁর পরিত্যক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহান্বিত হন। আমি তাঁর অনুরোধে কলিকাতা পল্লী হিন্দু মহাসভার সভাপতির পদ গ্রহণ করি। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই কালে জাতিধর্মনির্বিশেষে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণকে আমিও হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে অন্নবস্ত্র ও আশ্রয় দিয়ে নানাভাবে অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য করেছি। আমার যত দূর জানা আছে, অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এই দুর্দিনে হিন্দু মহাসভার মতো বিপুল উদ্যমে কাজ করে নি। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কলিকাতায় যে শান্তি কমিটি গঠিত হয়, আমি তার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলাম। ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ স্বাধীনতার প্রাক্-কাল। এ সময় কলিকাতা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানে প্রচণ্ড দাঙ্গা বেঁধেছিল; হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে আমিও তখন প্রাণপণে দুঃস্থ দুর্গতদের সেবা করেছিলাম। আর্ত বিপন্নদের উদ্ধারকল্পে প্রাণের মায়া ছেড়ে অনেক সময় আমাকে বিপদ্-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এরূপ অনেকগুলি আতঙ্ককর ঘটনার মধ্য থেকে মাত্র একটির উল্লেখ করলেই বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানো যাবে।

কলিকাতায় তখন হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা চরম অবস্থায় পৌঁচেছে—কোন রকম মিটমাট বা আপোস-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। লীগ সরকার ক্ষমতায় আসীন ছিলেন আর পরোক্ষে মুসলমান হাঙ্গামাকারীদের পৃষ্ঠ-পোষকও ছিলেন। এমন সময় হিন্দুদের সায়েস্তা করবার মতলবে মুখ্যমন্ত্রী এক হাজার বালুচ সৈন্য কলিকাতায় এনে নামাতে চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম—এতে হিন্দুরাই দারুণ

পীড়িত হবে—ভয়ানক রকম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই আমি ও আশুতোষ লাহিড়ী মহাশয় একদিন সকাল সাতটা নাগাদ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাই প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে। আমাদের এই ঘরোয়া বৈঠকে কেবল শ্যামাপ্রসাদবাবু, আশুতোষ লাহিড়ী ও আমি ছিলাম। কথাবার্তা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে; ইতিমধ্যে যে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে সেদিকে আমাদের হুঁশ ছিল না। ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করে যখন আশুবাবু ও আমি গাড়িতে উঠেছি গন্তব্য স্থানে পৌঁছাবার জন্য, তখন কিছুদূর চলার পর দেখি রাস্তা জলে টইটুম্বুর। জলের জন্য পুরাতন গাড়ি বেশিদূর এগুতে পারছিল না। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু ও ধর্মতলার সংযোগস্থলের কাছাকাছি এসেই ড্রাইভার বলল 'বাবুসাহেব, নূতন গাড়িতে উঠতে হবে, এ গাড়ি যেতে পারবে না।' অগত্যা আমরা দুজনে আর-একটা নূতন ট্যাক্সিতে উঠে বসি। হ্যারিসন রোডের সন্নিকটে হ্যালিডে পার্কের সামনে এসে পড়তেই আমাদের গাড়ীর ভিতরে জল ঢুকতে শুরু করে। তাই আর এগুতে পারা গেল না। তখন আমরা কোন্ রাস্তা ধরে কলেজ স্ট্রীটে পৌঁছাব এই নিয়ে আলোচনা করছি—এমন সময় তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট থেকে একদল মুসলমান লৌহদণ্ড হাতে আমাদের গাড়ি ঘিরে ফেলে আঘাত হানতে উদ্যত হয়। এই সঙ্কটমুহূর্তে গাড়ি পিছু হটিয়ে কলুটোলা স্ট্রীট দিয়ে বার হয়ে আসার চেষ্টা করি। রাস্তায় বেশি জল জমেছে দেখে পুনরায় গাড়ি ফিরিয়ে আমরা ইডেন হসপিটাল রোড ধরে যখন মাঝামাঝি পথে এসেছি তখন গাড়ি চলা বন্ধ হয়ে যায়। ঐ রাস্তার দক্ষিণ দিকে মুসলমান ছাত্রদের একটি হোস্টেল আছে। এই হোস্টেলের বারান্দা থেকে মুসলমান ছাত্রেরা আর সন্নিহিত কশাইখানা ও আশপাশ থেকে মুসলমান স্ত্রীলোকেরা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক মুসলমান ছেলেদের কাফেরদের গাড়িখানা ভেঙে ফেলার জন্য তাতিয়ে দিচ্ছিল। এদিকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নার্সকোয়ার্টারের মেয়েরা নিরুপায়ভাবে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল। নার্সদের চোখে পড়বার ভয়ে কোন বয়স্ক মুসলমান গাড়িতে আঘাত করতে সাহসী হয় নি। উঠতি বয়সের মুসলমান ছেলেরাই উস্কানি পেয়ে গাড়ি ভেঙে ফেলার ও দরজা খুলে ফেলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। এইসব দেখে আমরা গাড়ির দরজার হাতল খুব শক্ত করে প্রাণপণে টেনে ধরে থাকি, যাতে দরজা কোনমতে না খুলতে পারে। আর সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকার পাঁচ টাকার নোট তুলে ধরে আমরা ঐ

ছেলেদের প্রলুব্ধ করতে চাই গাড়িটি ঠেলে দেবার জন্য। এতে সুফল ফলে; কয়েকটি সরলমনা ছোট ছেলে টাকার লোভে গাড়ি ঠেলতে শুরু করে দেয়, প্রাকা শিখ ড্রাইভারের আশ্চর্যজনক দক্ষতায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে গাড়িটি স্টার্ট নিয়ে চলতে থাকে। তখন যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। এখন আমরা তাড়াতাড়ি কলেজ স্ট্রীটে এসে পড়ি তারপর বৌবাজার স্ট্রীট ধরে শিয়ালদার পাশ দিয়ে হ্যারিসন রোডে পড়তেই ড্রাইভার আর এগুতে চায় না। এখন আমরা খান্না মোটর কোম্পানিতে পৌঁছে গেছি, তাই ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। আমাদের বিপদের কথা শুনে শিব খান্না মহাশয় ড্রাইভার ডেকে আশুবাবুকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিলেন আর আমাকে একখানা ছোট উঁচু বাসে তুলে নিয়ে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সেদিন আমাদের জীবন এইভাবে রক্ষা পায়।

যাহোক স্বাধীনতা-লাভের পর দেশের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসাতে আমি আমার প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে আবার উদ্যোগী হই। তখন 'প্রবুদ্ধ ভারত' নাম দিয়ে সঙ্ঘটিকে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করি। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধাবান উৎসাহী দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয়, নতুবা কার্য পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আমিও দক্ষ উৎসাহী কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, হিন্দু মিশন, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণমিশন, বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হয়ে কর্মী সরবরাহের জন্য আবেদন জানাই। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক মহাশয় বিব্রত হয়ে একই রকম নৈরাশ্যব্যঞ্জক সুরে উত্তর করেন, "কর্মীরই তো একান্ত অভাব। কর্মী সংগ্রহ করে দেওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়।" তাঁদের কথায় আমি হতাশ হয়ে ফিরে আসি। তারপর আমিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনটো অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ইতিপূর্বে আমি আমার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সরকারের নিকট সাহায্য চেয়ে আবেদনের কেতাদুরস্ত উত্তরও পেয়েছিলাম; কিন্তু ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় অকপট সরলচিত্তে আমাকে বোঝালেন যে, আমার সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে সরকারী সাহায্য নেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। নানাসময় নানাদলীয় সরকার গঠিত হবে, তার ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যাঘাত এবং আদর্শ-চ্যুতি ঘটবে। আমি তাঁর কথা মেনে নিই, আর সরকারী সাহায্যের আশাও ত্যাগ করি। তবুও

কয়েকজন বিশিষ্টব্যক্তি উৎসাহিত হয়ে পড়ায় গঠনমূলক কাজ একপ্রকার ভালই চলতে থাকে। তবে এই নামে মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের মঠাধ্যক্ষের আপত্তি থাকায় কিছুকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির নূতন নামকরণ হয়—'সম্বুদ্ধ-ভারত-সন্তান।'

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত বিভক্ত হয়ে এবং বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যখন দেশ স্বাধীন হল, তখন হিন্দুমহাসভার উপযোগিতা বিশেষ রইল না। এখন এই জন্য শ্যামাপ্রসাদবাবু, নির্মল চাটুজ্যে ও আমি একই সঙ্গে এর সঙ্গে সংস্রব পরিহার করলাম। আমি আমার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও প্রসার কল্পে যুগোপ-যোগী করে নাগরিক সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অন্তরে অনুভব করলাম। এবং এই কাজে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন বোধে আমি আমার সংশোধিত নাগরিক জীবন গঠন সংক্রান্ত পরিকল্পনাটি নিয়ে নিজাম প্যালেসে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী মহোদয়গণের সঙ্গে এই বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করি। কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাতে তাঁরা মিষ্টি কথায় আমাকে ফিরিয়ে দেন, আমার এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। সুতরাং উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মারফত আমার আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করি; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, আমার আবেদনে সাড়া দিলেন না। কাজেই 'সম্বুদ্ধভারত সন্তান' প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী সাহায্যের আশাও ছেড়ে দিতে হল। এ ছাড়া কর্মীর অভাব তো আছেই। তবুও যেমন করে হোক প্রতিষ্ঠানটি বহুশ্রমে চালাতে থাকি।

এর উপর আরও এক নূতন কাজের চাপ কাঁধে এসে পড়ল। শহীদ সুরাবর্দী মহাশয় কলিকাতা ছেড়ে স্বাধীন বাংলাদেশে চলে যাবার সময় হকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদটি আমাকে দিয়ে যান। এতে কাজের বোঝা আরও বেড়ে গেল বটে কিন্তু আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কোনও উপকার হল না। যাহোক, কয়েক মাস পরে ক্লান্তি বোধ হওয়ায় বিধান-সভার নির্বাচনের পর হকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিত্ব ছেড়ে দিলাম। এই সময় থেকে আমার নিজস্ব 'সম্বুদ্ধ ভারত সন্তান' প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা-কাজের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ি, বাহিরের সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা অযৌক্তিক মনে হলো।

হিন্দু কোড বিল

১৯৫৬ সালে 'সম্বুদ্ধ-ভারত সন্তান' প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যাপারে আমি যখন ব্যাপৃত ছিলাম সেই সময়ের একটি ঘটনা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করছি। হিন্দু মেয়েদের বৃহত্তর স্বাধীনতা ও পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার দেবার জন্য লোক-সভায় হিন্দু কোড বিল উত্থাপন করা হয়। ভারত সরকার ঐ বিল আইন-বদ্ধ করার পূর্বে হিন্দু জনসাধারনের মতামত নেবার জন্য 'প্লেবিসাইটের' বন্দোবস্ত করেছিলেন। শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঋষীন্দ্র সরকার এবং শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী রাণু মুখার্জি ও আমি এই উপলক্ষে তত্ত্বাবধানকার্যে নিযুক্ত ছিলাম। হিন্দু জনসাধারণের যথার্থ ও আন্তরিক মতামত এ ব্যাপারে ঠিকঠিক গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা, সে দিকে নজর রাখার জন্য আমি খুব আগ্রহী ছিলাম। এই বিলের সমাজের অমঙ্গলের দিকটাই আমার চোখে বড় হয়ে ধরা দিয়েছিল। আমি নিশ্চয় বুঝেছিলাম যে এর ফলে যৌন অনাচার কদাচার বৃদ্ধি পাবে, দাম্পত্যকলহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, গৃহ-বিবাদ তুচ্ছ কারণে মস্তবড় গুরুত্ব পাবে। এইজন্য আমি এই বিলের ঘোরতর বিরোধী ছিলাম। হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে অত্যুৎসাহীদের জালিয়াতি, চালাকি, জবরদস্তি, প্রতারণা বেশ ভালভাবেই চলেছিল বলেই আমার ধারণা। একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় আমার মনে খুব আঘাত লেগেছিল। ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ আমরা সকলেই প্রাচীন স্মৃতি অনুসরণ করে চলি। হিন্দু কোড বিল আমাদের মনঃপুত হইনি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অফিসে বসে কাগজ ওলটাতে ওলটাতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদবাবু ঐ বিলের সমর্থনসূচক ভাটপাড়ারই একখানি পত্র বার করলেন। এতে আমার পিতার জ্যেষ্ঠ মাতুলানীর নেত্রী হিসাবে স্বাক্ষর ছিল। ঐখানি রমাপ্রসাদবাবু আমার হাতে দিয়ে আমাকে দেখতে বলায় আমি বড় লজ্জায় পড়লাম, আর তক্ষুনি ভাটপাড়ায় বৃদ্ধা মাতুলানীর কাছে ছুটে গেলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসবাদ করে জানলাম যে, আসল কথা কাউকেই গোচর করা হয় নি। গানের আসরের কথা বলে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে সভায় নিয়ে গিয়ে দুর্মতিরা দু-চারটি গান শুনিয়ে কাজ আদায় করেছিল। এই অঘটনের কথা আমি পণ্ডিত শ্রীজীবন্যায়-তীর্থ এবং পদ্মভূষণ পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মাতুল মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে এলাম। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে হিন্দু সমাজের যথার্থ অকপট মতটি অভিব্যক্ত করার সুযোগ পায়নি। সমাজের মঙ্গলকামী হিসাবে আমি এই কথা আমার জীবনের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ

করে রাখলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারে মনু, পরাশর ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হিন্দুর পক্ষে মহৎ কল্যাণকর।

কর্ম্মক্ষেত্র ও সংসার জীবন

কাহিনীর সামঞ্জস্য রাখার খাতিরে আমাকে অতীতের পানে এখন দৃকপাত করতে হবে। আমার পিতা পুরাতন বাতশিরা রোগাক্রান্ত রোগী ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, ঐ সময় তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। মা—পূর্বেই লোকান্তরিতা হয়েছিলেন। সুতরাং গ্রামের বাড়িতে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন করার সুবিধা ছিল না, যদিও আমার মেজকাকীমা যথাশক্তি ভাশুরের সেবাযত্নের ত্রুটি করতেন না। তা ছাড়া ভাটপাড়া থেকে অফিসে যাতায়াতও এখন কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। এসব কারণে আমার কাছে পিতা রাধানাথ মল্লিক লেনে ছোট বাড়ি ভাড়া করে কলিকাতায় চলে আসেন। তিনি সঙ্গে আমার ছোটভাই ও বড় ভগ্নি এবং বড় ভগ্নিপতি ও তাঁদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসেন। আমরা কয়েক মাস রাধানাথ মল্লিক লেনের বাড়িতেই ছিলাম। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য গ্রামসুবাদে আমার কাকা, তাঁর সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি আমার পিতাকে বোঝালেন যে, ছোট বাড়িতে থাকায় আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে, একটি বড় বাড়ি হলে মন্দ হয় না; তা হলে তিনিও আমরা একই বাড়িতে একসঙ্গে মিলেমিশে আরামে থাকতে পারব। তাঁর কথার যৌক্তিকতায় আমার পিতা সন্তুষ্ট হলেন। তখন আমাদের বেনেটোলা লেনে একটি বড় বাড়ির ছয়খানি বৃহৎ কক্ষ যুক্ত সমস্ত দ্বিতলাংশ এবং নীচতলার একাংশে তিনখানি ঘর ভাড়া করা হয়। রাধানাথ মল্লিক লেন থেকে আমরা এখন নূতন বাসাবাড়িতে চলে আসি।

পিতা, পিতামহ সব সময়েই এই ধারণা পোষণ করতেন যে, আমি ঘরছাড়া বিবাগীদলের একজন; সংসারের দিকে কিছুমাত্র আমার মন নেই। তাঁরা ভাবলেন আমাকে বিষয়ানুরাগী ও সংসারী করে তুললেই আমার যথার্থ মঙ্গল—এরূপ বোধের বশবর্তী হয়ে তাঁরা নানারকম ফন্দি-ফাঁকি খুঁজতে লাগলেন আমাকে বশে আনবার জন্য। শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবু আমার ঠাকুরদার ছাত্র ছিলেন। এই সূত্রে তিনি বারিদবরণ বাবুর নিকট গিয়ে ধরে বসলেন আমাকে সুশীল সুবোধ সংসারীদের দলে টেনে আনতে। শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবু আমাকে অতিশয় স্নেহের চোখে দেখতেন। পিতামহের

কথা শুনে সানন্দে সাগ্রহে আমার বিষয়-বিমুখ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে উদ্যোগী হয়ে পড়েন। বন্ধুবান্ধব দরিদ্র কিংবা বিপ্লবী দলের প্রাক্তন সহ-কর্মীদের মধ্যে দানখয়রাতে চিকিৎসালব্ধ নিজের আয় বিলিয়ে দিয়ে আমি যাতে ফতুর না হয়ে পড়ি, সেদিকে তিনি খুব সজাগ দৃষ্টি রাখতেও থাকেন। আমার অর্থসঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি তাঁর রোগীদের জন্য ব্যবস্থাপত্রে যেসব হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নাম লিখে দিতেন সে সব ঔষধ আমার ফার্মেসি থেকে ক্রয়ের নির্দেশ দিতেন। প্রত্যেক প্রেসকিপশান-এর জন্য তিনি তাঁর প্রাপ্য কমিশন আমার কাছ থেকে আদায় করে নিতেন; এটা আমার জন্য তাঁর কাছে গচ্ছিত থাকত। তাঁর সহকারী হিসাবে তাঁর সম্মানার্থে আমাকে একখানি গাড়ি কিনতে হবে, একথাও তিনি বলেন। এ ছাড়া আমাকে গৃহস্থ করে তোলবার জন্য শ্রদ্ধেয় বারিদ-বরণ বাবু খুব উৎসাহী হয়ে পড়েন। কলেজ রোতে আমার বাড়ির জন্য জমি কেনার ব্যাপারে তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

ভারতবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবুর শিষ্য ও সহকারী হিসাবে ক্রমেই আমার নাম ও খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বহু জটিল ব্যাধি নিরাময় করে আমি জনসমাজের শ্রদ্ধা ও বারিদবরণ বাবুর পঞ্চমুখ প্রশংসা লাভ করেছি। একদিনের কথা মনে আছে—তিনি তখন আমাকে তাঁর লাইব্রেরিতে বসে বই পড়তে দিতেন আর নিজে হোমিওপ্যাথির নানা জটিল বিষয় নিযে আলোচনা করতেন। এমন সময় একদিন তাঁর লাইব্রেরির একটি ডুপ্লিকেট চাবি তৈরি করিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এ তো বাইরের চাবিকাটি দিলাম, তুমি যদি আসল চাবিকাঠিটি আমার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পার, আমি খুব খুশী হব, আমার এই চাবিকাটি দেওয়া সার্থক হবে।' তাঁর কথার গূঢ় ইঙ্গিত বুঝতে পেরে আমি তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলি, 'আপনার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই আমি আপনার মনোমত যোগ্যতা অর্জন করতে পারব।' প্রথম প্রথম বারিদবরণ বাবুর সঙ্গে রোগী দেখতে যেতাম নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভের প্রত্যাশায়। তিনি আস্তে আস্তে আমাকে অধিকতর সাহসী ও স্বাবলম্বী করে তুলতে সচেষ্ট হন। নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা বিশেষ কারণে ব্যস্ত থাকলে, নিজের রোগীর 'ডাকে' তিনি চিকিৎসার জন্য আমাকে পাঠাতেন। মফঃস্বলে চলে যাবার সময় তাঁর রোগীর চিকিৎসার ভার আমার উপর দিয়ে যেতেন। তবে তাঁর রোগী দেখার 'ফী' তিনি আদায়

করে নিয়ে নিজের কাছে রাখতেন,—বিশেষ মতলবে। এই কারণে আমার অভিজ্ঞতা, নামডাক ও আয় সব কিছুই প্রচুর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমার উপর তাঁর বিশ্বাস ও ভালবাসার অন্ত ছিল না।

বৈষয়িক নানা ঝঞ্ঝাট ও দারপরিগ্রহ

১৯২৭-২৮' খ্রীষ্টাব্দে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসাবে আমি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাবান। কাজেই এখন নানাবকম বৈষয়িক ঝামেলা হুড়মুড় করে আমার কাঁধের উপর একসঙ্গে এসে পড়ে। জমি কিনে বাড়ি তৈরি করতে হবে, বাবার বড় ছেলেকে বিবাহ করতে হবে, মাতৃহীন গৃহে অসুস্থ পিতার দেখাশোনা করতে হবে, একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের নানা ছোটখাটো খুঁটিনাটি ব্যাপার সামলাতে হবে;—সমস্তকিছু মিলে আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটবার উপক্রম হয়। প্রথমে বিবাহের কথা বলি। আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল—বিবাহ করব না; কাজেই বারবার অন্ততঃ ছয়-সাতটি সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিই; কিন্তু বিধিলিপি অমোঘ। পরিশেষে আমাকে পরাজয় স্বীকার করতে হল, আমি এই কথাই বলছি এখানে পরিষ্কার বিবৃত করে। অন্তিম মুহূর্তে মা আমার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চেয়েছিলেন যে, আমি বিবাহ করে গৃহী হব। আমি তাঁর কথার উত্তর দিইনি, চুপ করে ছিলাম। অসুস্থ পিতা, বড় ভগ্নিপতি, পিতৃব্য, মেজ ভগ্নি, এবং পিতামহ এখন উঠেপড়ে লেগে গেলেন—আমার বিবাহ দেবেনই। নানাদিক থেকে সম্বন্ধও আসতে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে আমার বিবাহে কোনরূপ নীতিগত বাধা ছিল না—আমি তো গৃহেব মধ্যে থেকে পারিবারিক জীবনই যাপন করছিলাম। বহু বৎসর পূর্বে দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে সন্ন্যাসী হবার আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে বেলুড়মঠ ছেড়ে গৃহে ফিরে এসেছিলাম পিতার সঙ্গে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আমাকে সংসারে থেকেই হিন্দুশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং কোন দিক দিয়েই আমার বিবাহে অসম্মত হওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল না। তবুও মন কেন যে বিবাহে সায় দিচ্ছিল না, সে এক মস্ত প্রহেলিকা। আমার চিরকুমারব্রত অবলম্বনের অনুকূলে আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেহই ছিলেন না। শিক্ষাগুরু বারিদবরণ বাবুও না, ভবিষ্যৎ বক্তা দৈবজ্ঞ ঠাকুরও না। দৈবজ্ঞ ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন

যে, আমার জীবনের উলটপালট ও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে আমার বিবাহ হবেই—এ কেউই রোধ করতে পারবে না। আশ্চর্যের বিষয় তৎকথিত নির্দিষ্ট তারিখেই আমার বিবাহ হয়। অসুস্থ পিতা যেদিন ১০৪ ডিগ্রীর উপর জ্বর নিয়ে টলতে টলতে কন্যা দেখতে গেলেন, সেই দিনের ঘটনা বলছি। সেই দিন আমার ছোট কাকা আমাকে জোর দিয়ে বলতে এসে-ছিলেন যে, পঞ্চানন ভট্টাচার্যের মেয়েকে আমার বিবাহ করতেই হবে। কারণ কন্যাপক্ষের দ্বারা বিবাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও উপকরণসামগ্রী প্রায় সমস্তই কেনা হয়েছে অথবা যোগান দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এরূপক্ষেত্রে ছোট কাকার অভিমত—আত্মীয়স্বজনের উপরোধেও আমাকে বিবাহ করতেই হবে, নতুবা বড়ই অশোভন দেখায়। কিছুটা তর্কবিতর্কের পর আমি তাঁর কথা উড়িয়ে দেই। তখন ছোট কাকা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমাদের বেনেটোলা লেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান; কিন্তু ছোট ভায়ের চোখের জল আমার অসুস্থ পিতার দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি বুঝতে পারেন যে, আমার রূঢ় আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েই ছোট কাকা অভিমান-ভরে চলে যাচ্ছেন। তখন পিতা প্রবল জ্বর সত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে টলতে টলতে এসে আমাকে বললেন, 'তুমি কি সকলের কথা অগ্রাহ্য করবে বলে ঠিক করেছ! এত কষ্ট পাচ্ছি, তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে তো বিবাহের কথা কখন কোনদিন বলিনি। দেখছ তো বাড়িতে আমাকে সাবু পথ্যাদি তৈরী করে দেবে এমন কেউ নেই। তোমার ছোট ভাইটিও তো অসুস্থ। এরকম ক্ষেত্রে তোমার কি উচিত নয় যে বিবাহ করে বধূমাতাকে ঘরে নিয়ে এসে আমার সেবাযত্নের সুরাহা করে দেওয়া! বিবেক হারালে চলবে কেন?' পিতার কথা শুনে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়ি, চুপ করে থাকি, কী করব কিছুই ভেবে উঠতে পারি নি। যাহোক সেই দিনই পিতা আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে ফেললেন। আমি কি কারণে অল্পক্ষণের জন্য ঘরের বাইরে গিয়েছি, ফিরে এসে দেখি পিতা বাড়িতে নেই—হঠাৎ বিছানা ছেড়ে এই সন্ধ্যাবেলাতেই কোথায় চলে গিয়েছেন। তিনি আমার মৌনকে সম্মতি বলে ধরে নিয়েছিলেন।

কয়েকদিন আগে আমার পিতার সমনামা অরবিন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব শুনে পিতা বলেছিলেন "আমরা সবাই তো রাজীই আছি, এখন ছেলের মত করাতে পারলেই হয়। ও তো কাছেই রয়েছে। ওর

মত আদায় করতে পার কি না জিজ্ঞাসা করে দেখো না।" পিতার উত্তর শুনে তিনি আর কোন কথা না বলে একটু বিব্রত হয়ে চলে যান। এজন্য সেদিন কন্যা দেখার উদ্দেশ্যে বার হয়ে বাবা প্রথমেই অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মেয়েকে পছন্দ করা চলে কিনা দূর থেকে আভাসে তা ঠিক করতে হরীতকীবাগানে তাঁদের বাড়ির সন্নিকটে চলে যান। তারপর পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যাকে দেখবার জন্য ভাটপাড়ার বাড়িতে গিয়ে কন্যার পিসেমশাই শ্রীহরিচরণ জ্যোতিষীকে ডেকে আনান। জ্যোতিষী মহাশয়ের কাছে তিনি নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এ কন্যাও একরকম অস্পষ্টরূপেই দেখা হয়। পিতার মনের ভাব এই ছিল যে, দুই কন্যার মধ্যে যেটি মাথায় একটু বেশী উঁচু হবে তাঁকেই তিনি বড় পুত্রবধূরূপে মনোনয়ন করবেন। এরূপ তুলনামূলক উচ্চতার বিচারে দেখা গেল, শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মেয়ে যোগ্য পাত্রী। কাজেই তাঁর পিতাকে খবর পাঠান হল—কন্যা পছন্দ হয়েছে—দুই-একদিনের মধ্যে লগ্নপত্র সম্পাদন করে বিবাহের দিন ঠিক করা হবে। পিতা অসুস্থ ও প্রায় চলচ্ছক্তিহীন ছিলেন, এজন্য খুল্লতাত পিতার অনুমতিক্রমে পিতামহের উপস্থিতিতে বিবাহের সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। অপ্রসন্নচিত্তে বিবাহ করতে যাচ্ছি বলে কন্যাপক্ষের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত যৌতুকাদিও গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েছিলাম। কেবলমাত্র শ্বশুর মহাশয়েব বিশেষ অনুরোধে একটি অঙ্গুরীয় ও হাতঘড়ি নিয়েছিলাম। এমন কি আমি বরবেশও ধারণ করিনি—সাদাসিধে আটপৌরে খদ্দরের ধুতিচাদর পরে গিয়েই বরের আসনে উপবিষ্ট হই। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, বাংলা ১৩৩৫ সালের ২৯শে আষাঢ় আমার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

বিবাহ অনিচ্ছায় চাপে পড়ে করেছি, তাই এর এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আমাকে অভিভূত করে ফেলে। মাস ছয়েক কাল আমি একরূপ জড়, আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম। কলিকাতায় চিকিৎসার কাজে উৎসাহ উদ্যম সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলাম -আর ভাটপাড়ায় যে গিয়ে আমার আদর্শ ভ্রাতৃসমাজের কার্য পরিদর্শন করা তো একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে আমার আর্থিক ক্ষতি, প্রতিষ্ঠানের বিশৃঙ্খলা ও অবনতি ঘটতে থাকে, আমার দুর্নাম রটতে থাকে। রোগীদের আগ্রহে ও পেশার খাতিরে আমি আবার চিকিৎসাকার্যে মনোযোগী হই এবং দুর্নাম এড়াবার জন্য দুই-একবার ভাটপাড়ায় গিয়ে আমার প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানও করে আসি। শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবুর উপদেশমত এখন কিছুদিনের মধ্যে একখানি

সেকেণ্ড হ্যাণ্ড 'স্টাণ্ডার্ড-নাইন' মোটর গাড়ি—এই উদ্দেশ্যে বাবার কাছে গচ্ছিত টাকা থেকে ক্রয় করি। তখনও আমার নিজের বাড়ি হয়নি তাই বাধ্য হয়ে কিছুদিন বারিদবরণবাবুর গ্যারেজে গাড়িটি রেখে পরে মাসিক ভাড়া দিয়ে অপরের গ্যারেজে রাখতে হত। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৮-৯ বৎসর কাল আমার এই গাড়িখানি ব্যবহার করি। এই গাড়ি ক'রে আমরা ভাটপাড়ার বাড়িতে প্রয়োজন অনুসারে বহুবার গিয়েছি। শারদীয়া পূজার সময় আত্মীয়স্বজন এবং দরিদ্র প্রিয়জন—গ্রামবাসীদের শাড়ি কাপড় জামা ইত্যাদি উপহার দেবার জন্য এই গাড়িতে আরোহণ করে গিয়েই আমরা দুজনে একবার ভাটপাড়ার পৈতৃক বাসভবনে রাত্রিযাপন করেছিলাম। আমার এই গাড়ি দেখে আমার নিকট আত্মীয়দের মধ্যেও কেউ কেউ আমাকে হিংসা করতে থাকেন—প্রতিক্রিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই বোঝা যায়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গাড়িখানি আবার thorough over haul করিয়ে ও নূতনের মতো রং করে তোলার পর যখন কারখানা থেকে ফিরে এল, তখন একটি অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় মনে কেমন একটা খটকা বাধল। ভাবলাম এটাকে আর নতুন বাড়ির গ্যারেজে তুলবো না। আর তখনই বেলুড় মঠের শ্রদ্ধেয় সনৎ মহারাজকে ফোনে ডেকে গাড়িখানি ঠাকুরের মন্দির তৈরির কাজে লাগানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে মিশনকে দিয়ে দিই। সেই সময় বেলুড়ে ঠাকুরের মন্দির নির্মাণের কাজ আরম্ভ হচ্ছিল, কাজে লাগবে বলে পরদিন সকালে লোক এসে গাড়ীটা নিয়ে গেল। মন্দির নির্ম্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমার গাড়িখানি বেলুড় থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল,—কিন্তু এটা আর নিজে না নিয়ে আমার বিশ্বস্ত পুরাতন ড্রাইভার মহাদেবকে দান করে দিই। এরপর এক ট্যুরিস্ট ইংরাজ ভদ্রলোক কলিকাতা দর্শন করতে এসে দু-চারদিন পূর্বে ক্রীত বড় অস্টিন-টুয়েল-ফোর (Austin twelve four) গাড়িখানি বিশেষ কারণে বিক্রয় করতে বাধ্য হন,—আমার পুরাতন রোগী এক পর্তুগীজ সাহেবের মধ্যস্থতায় আমি এটা ক্রয় করি। গাড়িখানি খুব বেশিদিন ব্যবহার করিনি, পেট্রোল ইত্যাদির রেশনিং-এর গোলযোগ চলার কারণে। এমন সময় আমার এক প্রতিবেশী পূর্ববঙ্গের এক ভদ্রলোক কয়েক সপ্তাহ কাজে লাগাবেন বলে গাড়িখানি ধার চেয়ে নিয়ে যান। তিনি অতি চতুর ও কৌশলী লোক ছিলেন, তাঁর প্রবঞ্চকতায় এ গাড়িটাও হারাতে হলো। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কোন রোগীকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাধি থেকে মুক্ত করার জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি

তাঁর দুইখানি গাড়ির মধ্যে ছোট গাড়িখানি অতি অল্পমূল্যে আমাকে বিক্রি করে দেন। আমি সামান্য কিছু টাকা দিয়েছিলাম, তাও তিনি গাড়ির নতুন টায়ার-টিউব ব্যাটারি ইত্যাদি কেনার কাজে লাগিয়ে ছিলেন। মোটের উপর মূল্যবাবদ অতি সামান্য টাকাই নিয়েছিলেন। ঐ গাড়ি নানাস্থানে আমার যাতায়াতের কাজে ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বহু বৎসর ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও এটা আমার ছোট মেয়ের ব্যবহারের জন্য তার কাছে রয়েছে।

কলেজ রোতে জমি ক্রয় ও বাসভবন নির্মাণ

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কিভাবে জমি ক্রয় করে কলেজরোতে বাড়ি তৈরি করি সেকথা এখানে বলছি। আমার সব সময়ই নিজস্ব বাড়ির দিকে ঝোঁক ছিল। তার প্রধান কারণ আমি কিছুটা নিরিবিলি থাকতে ভালবাসি আর দ্বিতীয়তঃ ভাড়াটে বাড়িতে স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাস করা যেমন অসুবিধাজনক, তেমনই চিকিৎসাকার্য চালানোও খুব কষ্টকর ; সর্বোপরি 'পুনরাবর্তক' জ্বরের সময় বিছানায় শুয়ে মাসিক ভাড়া যোগান এক দুশ্চিন্তা। তাই মনে মনে জমি কিনব ঠিক করে এবিষয়ে ওয়াকিবহাল কয়েক ব্যক্তিকে বলে রেখেছিলান বিক্রয়ের জমির খোঁজে থাকতে। এইসকল খোঁজখবর-দাতা লোকের মধ্যে কলেজ রো নিবাসী রাজকুমার মুখার্জি ছিলেন একজন। বৎসরাধিক কাল কোন সন্ধান না দেওযায় বাড়ির জন্য জমি কেনার চিন্তায় মনটা বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। তখন আচম্বিতে একদিন পথ চলার সময় রাজকুমারবাবু আমায় ডেকে বলেন, 'আপনি বাড়ির জন্য জমি কিনবেন? ৩৭এ কলেজ রোতে একজন মহিলা জমি বিক্রয় করতে ইচ্ছুক, কিন্তু এটা নাবালকের সম্পত্তি আর বহু ঋণে জড়িত।' এ জমি ছিল আমার হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীর সন্নিহিত জমির এক অংশ। আর এই জমিতেই ছিল কার্তিক ঠাকুরের টিনের ছাউনি হোটেল ঘর, যেখানে আমার আশ্রিত ও প্রিয়পাত্র হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল আমার অর্থে অন্নগ্রহণ করেছিল। আমি চিরদিনই মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাসী। কাজেই এখন এই জমি ক্রয় করার সুযোগ পেয়েছি দেখে আমার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এ বিশ্বাস জাগ্রত হল যে, তিনিই স্নেহবশে কৃপা করে এই জমি আমাকে দিচ্ছেন। তখনই আমি উদ্যোগী হয়ে পড়ি। আমার জমি কেনার ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবু খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর বাড়ির

সন্নিকটে জমির সন্ধান মেলায় তিনি এ জমি হাতছাড়া না করার জন্য আমাকে নানাদিক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

'নাবালকের সম্পত্তি' শুনে আমার মনে যে দ্বিধা হয়, বারিদবরণবাবুর আগ্রহ দেখে আমার সে দ্বিধার ভাব দূর করতে চাই। নাবালকের দেনা সম্পূর্ণ মিটিয়ে তার হাতে যাতে মোটামুটি কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে সেই পরিমাণ অর্থ সাধ্যাতীত হলেও দিতে রাজী হই। ভগবানের কৃপায় অর্থ-সংগ্রহের জন্য নানা কারণে যথেষ্ট সময় পাওয়ায় সে সামর্থ্য আমার হয়েছিল। অনাথ বালকের সম্পত্তি, ভদ্রমহিলাটি তার অছি (**Executrix**), তিনি ইচ্ছা করলেই তা বিক্রয় করতে পারেন না। এই কারণে হাইকোর্টের অনুমতি ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে খরচ বাবদ তাঁর দুই হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। আমি এই কথা শুনে আইনগত সঙ্গতির বিষয় না ভেবেই তখন একপ্রকার সাহায্য হিসাবেই দুই হাজার টাকা আমার পিতার হাত দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেই। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য ছিল—নাবালকের উপকারের জন্যই বিশেষভাবে আমি টাকাগুলি দিচ্ছি, এ টাকা ফেরত না দিলে আমি দুঃখিত হব না। তবে যদি জমি বিক্রয় করতেই হয় তাহলে আমাকে যেন বঞ্চিত না করেন, এখন যে মূল্য ধার্য করা হয়েছে সেই মূল্যেই আমাকে জমি দিতে হবে আর এই দুই হাজার টাকা অগ্রিম মূল্য বলে ধার্য হবে। পিতা টাকা হস্তান্তর করার সময় আমার এই বক্তব্যটি ভদ্রমহিলাকে অবগত করান। যা হোক বিক্রয়ের আইনগত বাধা অবশ্য মিটে যায়; কিন্তু আমার দিক থেকে নিজের নামে জমি ক্রয় করে বাড়ি তৈরির বিষয়ে আইনগত মস্ত বড় একটি ফাঁক নজরে পড়ে। আমি তখনো স্বদেশী ও রাজনৈতিক আন্দোলনে পরোক্ষভাবে অনেকটা সংশ্লিষ্ট ছিলাম। মাসাধিককাল পূর্বে 'মীরাট-ষড়যন্ত্রে' জড়িত এক বিপন্ন ভদ্রলোককে আমি সাহায্য করেছিলাম। তিনি বিপ্লবী কালীদাস ভট্টাচার্য। কালীদাসবাবু জেল থেকে খালাস পেয়ে মজঃফরপুর থেকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো এক পরিবারকে উদ্ধার করে আনতে গিয়ে প্লুরেসি (**Pluresy**)-তে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে দেশে আনা হয় ও বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল, 'অক্সিজেন' দিয়ে তখন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছিল। তাঁর এই দারুণ সঙ্কটের সংবাদ পেয়ে তাঁকে দেখতে তাঁর স্ত্রী-পুত্রেরা 'ঝাড়গ্রাম' থেকে ভাটপাড়ায় আসেন। ভাটপাড়ায় তাঁর স্ত্রীর নামে একখানি বাড়ি ছিল, আর

এইটাই ছিল তাঁদের বসতবাটী। কোনো চতুর উকিল চালাকি করে নিজের পাওনা-আদায়ের ছলে বাড়িটি দখল করে বসেন। কালীদাসবাবুর স্ত্রী-পুত্রদিগকে তিনি বাড়ি থেকে টেনে বার করে দিলেন। তাঁদের এই অপমানের ও অসহায় অবস্থার কথা আমি অসুস্থ অবস্থায়ই আমার মেজ ভগ্নিপতির মারফত শুনে অবিলম্বে প্রতিকারের ব্যবস্থা করি। ভগ্নিপতি পঞ্চানন ভট্টাচার্য ভাটপাড়া পৌঁছেই নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে আমার কাছে পাঠান আমি তৎক্ষণাৎ তাদের মারফত উকিল ভদ্রলোকটিকে প্রাপ্য টাকা শোধ করে দিয়ে কালীদাসবাবুর স্ত্রীর বাড়িখানি ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানাই। টাকা পেয়ে উকিল ভদ্রলোকটি ঐ বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে সরে পড়েন। সঙ্কট কেটে যায়। হাসপাতালে মুমূর্ষু অবস্থায় এই সুখবর শুনে কালীদাসবাবু খুব উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন, তখনই তিনি বাড়ি যাবার জন্য বায়না ধরেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমার কাছে নরেশচন্দ্র দৌড়ে আসে। আমি কালীদাসদার শেষ ইচ্ছা পূরণে যে বিপদ রয়েছে সে সম্বন্ধে নরেশকে বিশেষভাবে সচেতন করে দিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে বলি। 'এ্যমবুলেন্সে' তুলে তাঁকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয়, সেখানে শীঘ্রই অলৌকিকভাবে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। আদর্শের দিক দিয়ে যত মহৎই হোক এ ধরণের কাজ ইংরাজ সরকার নেকনজরে দেখতেন না। তাই আমাব হিতৈষী আইনজ্ঞেরা পরামর্শ দিলেন নিজের নামে জমি কেনা ও বাড়ি করা ঠিক হবে না। তখন পিতার নামে জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণ করব স্থির হল।

আমার পিতা এ সময় কাশীতে একটি বাড়ি নির্মাণ করছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে প্রায়ই আমার কাছ থেকে কিছু কিছু টাকা চেয়ে নিতেন যথা সময়ে ফিরিয়ে দেবেন এই প্রতিশ্রুতিতে। বাড়ির জন্য জমি কেনার কাজে হাত দিয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে, পিতা যদি আমার নিকট হতে গৃহীত টাকা নির্দিষ্ট সময় ফিরিয়ে দিতে না পারেন, তবে বড়ই গোল-যোগে পড়ব। এই মনে করে আমি তাঁকে পুনঃ পুনঃ আমার টাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি উত্তরে আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেন ও জানান যে শীঘ্রই পেনসানের (Pension) টাকা অর্ধেক Commute করে আমার প্রয়োজনীয় টাকা প্রত্যর্পণ করবেন। পিতা বহুবৎসর যাবৎ 'বাতশিরা' রোগে কাহিল ছিলেন। Pension গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজন বোধে তিনি ঐ রোগের জন্য Operation করান। তারপর অনেকটা সুস্থ হয়ে

উঠে Pension-এর অর্ধাংশ 'কমিউট' করেন। প্রাপ্ত টাকার কিয়দংশ চারিকন্যাকে সমভাবে ভাগ করে দিয়ে দশ হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকে, ঐ টাকা দিয়ে আমার টাকা শোধ করে দিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু আমার ঐ টাকার প্রয়োজন হয় নি। পূর্বেই বলেছি, উত্তরপ্রদেশের স্বনামখ্যাত জমিদার গোলাব সিং আন্তরিক হৃদ্যতার পরিচয় স্বরূপ বাড়ি নির্মাণের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা আমার কোনো এক দেনাদায়গ্রস্ত সুহৃদকে সাময়িক ভাবে কাজে লাগাতে দিয়েছিলাম। এই ভদ্রলোক কি করে জানতে পারলেন যে, আমি এখন জমি কেনার টাকার জন্য বিব্রত হয়ে পড়েছি। তাই তিনি সৌজন্যবশে আমার পঁচিশ হাজার টাকা সত্বরই ফিরিয়ে দিলেন। যে অর্থ আবার ফিরে পাব বলে স্বপ্নেও ভাবি নি এবং যা একরকম লুপ্ত সম্পদ বলেই ধরে নিয়েছিলাম, তা যখন সমস্ত হঠাৎ হাতে এসে পড়ল তখন আমি আশ্চর্য ও চমকিত হয়ে গেলাম।

ঈশ্বরকৃপায় এখন আমার জমি ক্রয়ের আর্থিক দুশ্চিন্তা আর বিন্দুমাত্র রইল না। এই জন্য পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলাম বাবার হাতে যে টাকা তুলে দিয়েছি কাশীধামের গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে, সে টাকা আর ফিরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। স্বর্গত মায়ের ইচ্ছা পূরণকল্পে পিতা আর্থিক অভাব অনটন সত্ত্বেও কাশীতে বাড়ি নির্মাণের জন্য মনস্থ করলেন। এই সময় প্রতি সপ্তাহান্তে শোচনীয় ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কেবল প্রাণের উৎসাহে কাশীতে চলে যেতেন। রবিবার সকালে সেখানে পৌঁছে গৃহ নির্মাণকর্মের সবরকম ব্যবস্থা করতেন, আর রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করে সোমবার ভোরে বাড়ি পৌঁছে শ্রান্ত দেহে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিয়ে অফিসের দিকে ছুটতেন। প্রায় বছরখানেক ধরে তিনি এইভাবে কাজ চালিয়েছিলেন। তাঁর মনোবল ও কর্মোদ্দম দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম।

পিতা 'পেনসন' নিয়ে অবসর গ্রহণের পর থেকে কাশীতে অবস্থান করে বাড়ি নির্মাণ ব্যাপারে মনোযোগী হলেন। এখন তাঁর বৃথা অর্থব্যয় বা অর্থাভাবের কোনো কারণ রইল না। তাঁর পেনসন থেকে একক্ষেপে অনেকগুলি অগ্রিম আদায় বা Commute করে যথেষ্ট অর্থ তিনি হাতে পেয়েছিলেন। যাকে যা দেবার দিয়ে-থুয়ে অনেকগুলি টাকা অবশিষ্ট ছিল। আমার নিকট হতে গৃহীত টাকাও পরিশোধের জন্য

আলাদা করে রেখেছিলেন। এখন আর আমার এ টাকার প্রয়োজন হল না।

সুহৃৎ ব্যক্তির কাছ থেকে অভাবনীয়রূপে সাহায্য হিসাবে দেওয়া টাকা পুনরায় হস্তগত হওয়ায় শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবু খুশি ও নিশ্চিন্ত হবেন জেনে তাঁকে এ সংবাদ দিলাম এবং তাঁর হাতে ঐ টাকা সাময়িকভাবে গচ্ছিত রেখে দিলাম।

এরপর জমির মূল্য বাবদ টাকা দেবার যখন সময় হল তখন, পিতাও পূর্বে গৃহীত টাকা আমাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। অপ্রয়োজনবোধে আমি পিতার দেওয়া টাকা নিলাম না—সুহৃদ গোলাব সিং মহাশয় প্রদত্ত টাকাতেই জমির মূল্য প্রদান করি। কার্যকালে বলতে গেলে অল্প হাঙ্গামার ভিতর দিয়েই আমি বাড়ির জন্য জমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবু, রেজিস্ট্রার মহিম বটব্যাল মহাশয় ও আমার পিতার কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। ৪ঠা মার্চ জমি কেনার পর ঐ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দেই সি. সি. দে মহাশয় আমার বাড়ির নক্সা (Plan) তৈরি করে দেন। আমি নানা রকম সুবিধা অসুবিধার কথা ভেবে তাঁকে বলি যে, বাড়ির স্বয়ংসম্পূর্ণ দুটি অংশ গঠনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দুই অংশের দুটি আলাদা প্রবেশ দরজা থাকবে। এরকম করার পিছনে একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল—আমি চেয়েছিলাম একটি অংশ ঝামেলাহীন করে নিশ্চিন্ত মনে বাস করব। আর এতে যুক্ত থাকবে আমার চিকিৎসালয় ও গাড়ি ঘর। এবং যথাসম্ভব বাড়িটি হাওয়া বাতাস ও রৌদ্র প্রবেশের পথ-যুক্ত ফাঁকা ও স্বাস্থ্যকর হয়—এটাই আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, অপর অংশ প্রয়োজন অনুসারে ভাড়া দিয়ে দেব, আর ঐ অংশ পৃথক থাকার দরুণ ভাড়াটে অংশের কেউ হঠাৎ এসে আমার গৃহে ঢুকে পড়তে পারবে না। আমার গৃহে পরের উঁকিঝুঁকি দেওয়া পছন্দ করি না। বিচক্ষণ ইঞ্জিনীয়ার আমার মনোমত বাড়ির নক্সা তৈরি করে দিয়েছিলেন।

বাড়ির নক্সা অনুমোদনের পর নানারকম ঝঞ্ঝাট

ঐ বৎসর ২১শে এপ্রিল কর্পোরেশনের বিল্ডিং কমিটির বৈঠকের শেষ তারিখ ছিল। আমি অনেক তদ্বির করে কাউন্সিলার (councillor) হেম নস্করের

সহায়তায় ঐ তারিখেই নক্সা (plan) অনুমোদন করিয়ে নিই। এরপর আমার বাড়ির জমি বিক্রয়ের নাম খারিজ করার ব্যাপারে আমাকে কিছুটা ঝামেলা পোহাতে হয়। গাড়ি কেনার পর থেকে আমার আত্মীয়স্বজনের আমার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষের উদ্রেক হতে থাকে। এর পর থেকে তাঁদের হিংসা ও বিদ্বেষ উত্তরোত্তর অনল শিখার মতোই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বিদেশ থেকে ঘুরে আসার পর আমার বড়ি তৈরির কাজ আরম্ভ হয়। এ সময় থেকে আমার জীবনে নানারকম দুর্দৈব ও দুর্বিপাক দেখা দিতে থাকে। আমি এখন পুনরাবর্তক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ভুগছিলাম আর এ জ্বর আমাকে দীর্ঘকাল কষ্ট দিয়েছে। তা ছাড়া বাড়ি তৈরির কাজের তদারকি করার সময় এক বড় রকম দুর্ঘটনাও ঘটেছিল, যার ফলে বহু কষ্টও পেয়েছিলাম। আর সর্বোপরি আমার মর্মবেদনার কারণ হল আমার আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনের বিরূপ আচরণ। আমার সৌভাগ্যের উদয় দেখে আমার অতি নিকট আত্মীয়েরাও বৈরীসুলভ মনোভাব নিয়ে এখন প্রত্যক্ষভাবে আমার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে দেন। এমন কি আমার বাড়ি নির্মাণের কাজেও নানা ছুতোয় কেহ কেহ বাধা দিতে থাকেন। আমার গঠনমূলক কাজে আঘাত দিয়েছেন ; আর নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য ভাটপাড়ায় আমার প্রতিষ্ঠানের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করেছেন। পরদেশী ও অবস্থাপন্ন রোগীমহলে আমার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদও তাঁরা রটিয়েছেন এবং নিত্য নূতন উৎপাতে আমার কর্মস্থানে সোরগোল বাধিয়েছেন। এই ভাবে তাঁদের দৌর্জন্যহেতু আমি লাঞ্ছিত, অপদস্থ, এবং অর্থও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। পিতার পরলোকগমনের পর বাড়ির অনেকেই আমার সঙ্গে প্রিয় সম্পর্ক বা স্বজনোচিত সৌহার্দ্য বজায় রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ন্যায়ত ধর্মতঃ আমি তাঁদের মঙ্গল চিন্তাই করেছি। তবু কেন যে এই দুর্ভাগ্য তা ভেবে পাই না। তবে অলঙ্ঘ্য দুষ্পাঠ্য কঠিন বিধিলিপির কে মর্মোদ্ধার করতে পারে! অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের বিদ্বেষ ও বিরূপ মনোভাব আমার জীবনে এক মস্ত অভিসম্পাত। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর মনোভাব আমাকে যৌবনে পাগল করেছে, আমি সংসারকে কখনো সত্য বলে গ্রহণ করি নি। এই সংকটের সময় ধর্মবিশ্বাসে ও গুরুর কৃপায় আমি শক্তি পাই—আত্মরক্ষায় সমর্থ হই। আশ্রয়দাত্রী মা সারদামণি আমাকে বলেছিলেন যে, মঠে থেকে শাস্ত্রচর্চায় যে জ্ঞান লাভ হবে তার থেকে বহু বেশি জ্ঞানলাভ সংসারে থেকে করতে পারবে। মাতাঠাকুরাণীর এই কথাগুলি স্মরণ করেই আমি মনকে শান্ত

করি। বাড়ি নির্মাণের টাকাও ভাগ্যদেবীর প্রসাদে খুব সহজেই আমার অর্জন হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবু Native State গুলির জন্য ইংরাজ সরকারের তালিকাভুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের একজন ছিলেন। তাঁর শিষ্যও সহকারী হিসাবে আমি তাঁর সঙ্গে ঐ সকল নেটিভ স্টেটে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যেতাম। পর্যবেক্ষক চিকিৎসকরূপে এক একটি নেটিভ ষ্টেটে তাঁর নির্দেশমতো পনেরো কুড়িদিন কখনো বা মাসেককালের বেশিও থাকতে হত। এতে আমার প্রচুর আয় হত। একবার এমন ঘটনা ঘটে যে, আমাদের কাশীর নূতন বাটীতে দুর্গাপূজায় একটু অবসর পেয়ে মহাষ্টমীর দিন গিয়ে সবেমাত্র পৌঁচেছি এমন সময় শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবুর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম। তিনি লিখেছেন, 'রামগড়ের রাজবাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে। শীঘ্রই চলে এসো'। তখনো বাঁধাছাঁদা খোলা হয় নি। আমাকে অবিলম্বে তাড়াহুড়া করে কলিকাতায় ফিরে আসতে হয়েছিল। রামগড়ে প্রায় দেড়মাস থাকতে হয়েছিল। মনে আছে দেড়শো টাকা দৈনিক হিসাবে আমাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মুখ্যত সুহৃৎ কুমার গোলাব সিং-এর অর্থানুকূল্যেই আমার বাটিনির্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। জমি ক্রয় ও বাটি নির্মাণের নক্সা অনুমোদনের কাজে আমাকে এত বেশি মানসিক উদ্বেগ নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল যে, এর পরিণামে নক্সা অনুমোদন হয়ে যাবার পরই জ্বরে পড়ি এবং খুব দুর্বলতা বোধ করতে থাকি, এজন্য কাশীর বাড়িতে চলে যাই পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে ভালো আবহাওয়ায় তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভের আশায়। কিন্তু সেখানকার গরম ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠায় কলিকাতায় ফিরে আসি। গরমকালেই বরাবর আমার জ্বর হয় দেখে আমি শীতপ্রধান-দেশ মোরাদাবাদে আমার পিসিমার কাছে চলে যাই। সেখানে গিয়ে অল্পকালের মধ্যে জ্বর-মুক্ত হই। সম্পূর্ণ সুস্থ হই নি বলে আরো কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণের ইচ্ছায় থাকব স্থির করি। ইতিমধ্যে সুহৃৎ গোলাব সিং-এর বড় ভগ্নি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁরা মোরাদাবাদে আমার কাছে লোক পাঠান। নিজের স্বাস্থ্যের কারণে সেই লোককে আমার অক্ষমতার কথা বলি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাই যে, আমি এখন অ্যালোপ্যাথিক ছেড়ে হোমিওপ্যাথিক ধরেছি। পরদিন পুনরায় গোলাব সিং-এর লোক এসে কোন ওজর আপত্তিতে কর্ণপাত না করে আমার যাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে ফিরে যায়। আমি পর দিন 'বাবরালায়' যাত্রা করি। পথে চন্দৌসী স্টেশনে গাড়ি-বদল করবার জন্য নামি, কিন্তু কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে তন্ময়ভাবে আলাপ করতে করতে অন্য-

মনস্ককতাবশতঃ তাদের সঙ্গে পুনরায় ঐ গাড়িতেই উঠে বসি। ছাত্রদের হুঁশিয়ারিতে পরের স্টেশনে নেমে স্টেশনমাস্টারকে আমার ভ্রান্তির কথা জানাই এবং যাবার ব্যবস্থা কি ভাবে হতে পারে সে বিষয়েও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করি। কিন্তু সারাদিনে 'বাব্রালা' যাবার মাত্র একখানি গাড়ি থাকার দরুণ নিরুপায় হয়ে পড়ি। ঐ সময় একটি মাল-গাড়ি আসছিল, স্টেশনমাস্টার সেই গাড়ি থামিয়ে গার্ডের কামরায় তুলে দিয়ে আমার যাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। আমি স্টেশনমাস্টারের অনুকম্পায় যথাস্থানে পৌঁছে দেখি station জনমানব শূণ্য। যাত্রী গাড়িতে আমাকে না দেখতে পেয়ে গোলাব সিং-এরা হতাশ হয়ে চলে গেছেন। এখানকার স্টেশনমাস্টার আমাকে দেখে খেদ করে বলেন সারা গ্রামের লোক আপনাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করে এতক্ষণ থেকে আপনাকে না আসতে দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। সারাদিন কাজ না করে আপনার মিছিল দেখার অপেক্ষায় তারা ছিল। প্রায় মাইল খানেক লম্বা মিছিল করে আপনাকে নিতে এসেছিল। তাতে তিনটা হাতি, সাতটা উট, ঘোড়া বার-চৌদ্দটা আর রাব্বা ছিল কুড়ি-পঁচিশটা। সবই পণ্ড হয়েছে আপনার এই বিলম্বে আগমনের জন্য। এখন আপনাকে কি ভাবে কুমার সাহেবের বাড়ি পৌঁছে দিই সেই ভাবনা আমার হয়েছে। না আছে গাড়ি আর না আছে সংবাদ পৌঁছে দেবার লোক। অবশেষে একখানি মাটি বহনের গরুরগাড়ি স্টেশন মাস্টার মহাশয়ের নজরে পড়ে। এটাকে হাতছাড়া না করে তাতে চড়িয়ে আমাকে গোলাব সিং-এর বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। আমি সাড়ে চারটার সময় রওনা হয়ে রাত্রি সাড়ে বারোটা নাগাদ গোলাব সিং-এর বড় ভগ্নির বাড়িতে পৌঁছি। তখনো গোলাব সিং তার এক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সামিয়ানার তলায় বসে আমার অনুপস্থিতির বিষয় নিয়ে জল্পনায় ছিলেন। আমাকে দেখে তাঁদের দুর্ভাবনা কেটে গেল।

পরদিন সকাল থেকে আমাকে রোগিনীর দায়িত্ব নিতে হয়। আমার অসুস্থতার জন্য স্থানীয় চিকিৎসককে রোগিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়। রোগিনীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে আমাকে ছাব্বিশ দিন সেখানে থাকতে হয়। ইতিমধ্যে গোলাব সিং-এর ভগ্নির বাড়ির ঠিকানায় দিল্লী থেকে 'Willis Gold Flake'-এর Sole Agent আমার পুরোনো রোগী ইয়াসিনের শ্বশুরের বাড়ি থেকে শ্বশুরের ছোট মেয়েকে দেখবার জন্য ডাক্ আসে। আমাকে সেখানে যাবার সবরকম বন্দোবস্ত করে একজন ব্রাহ্মণ ও

একজন চাকর সঙ্গে দিয়ে গোলাব সিং আমাকে দিল্লীতে পাঠান এবং আবার তাঁর বাড়িতে ফিরে আসার অনুরোধ করেন। আমি পাঁচদিন দিল্লীতে থাকি। রোগিনীর অবস্থা একটু ভালো দেখে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চৌদ্দশত টাকা পেয়ে গোলাব সিংয়ের বড় ভগ্নির বাড়িতে পুনরায় ফিরে আসি। আসার পথে মীরাট ও হাপরের কাজটুকুও সেরে আসি। তাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও যত্ন এবং আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারি নি—এজন্য 'ফি'-বাবদ অর্থ গ্রহণে রাজী হই নি। কিন্তু তাঁর ঠাকুরমা হতে শুরু করে মা, বাবা, স্ত্রী সকলে আমাকে প্রণামী বাবদ ও আমার শিশুপুত্রের সোনার হারের জন্য হাজার পাঁচেক টাকা প্রদান করেন। দিল্লীর টাকা সমেত প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে আমি কাশীর বাড়িতে ফিরি। বাড়িতে আসার পথে 'রাম-ডাক্তার' গোধূলিয়ার কাছে তাঁর ডিস্পেন্সরির কক্ষ থেকে টাঙ্গাগাড়ি করে আমাকে আসতে দেখে চিনতে পারে, অবিলম্বে আমার পিছু নিয়ে আমাদের কাশীর বাড়িতে এসে হাজির হয়। তখন মাত্র আমি এসে পৌঁছে বাবার সঙ্গে কথা শুরু করেছি। এমন সময় কাশীতে 'বেরী-বেরী'র অত্যন্ত প্রকোপ হচ্ছে বলে আসবাবপত্র না খুলে খাওয়া-দাওয়া সেরেই কলিকাতায় ফিরিবার জন্য বাবা আমাকে তাড়া দিলেন। এমন সময় রামডাক্তারকে আমার পিছনে দেখে বিশেষত তার কয়েকটি মরণাপন্ন 'বেরী-বেরী' রোগীকে দেখিয়ে ব্যবস্থা নিতে চায় শুনে বাবা একেবারে ক্ষেপে উঠেন, আর একমুঠো খেয়েই আমাকে কলিকাতা রওনা হতে বলেন। আমি অনেক করে বুঝিয়ে রামডাক্তাবের সঙ্গে কংগ্রেসেব নামকরা নেতা শিবপ্রকাশবাবুর বাড়ি থেকে শুরু কবে এক এক করে ১৬টি রোগী দেখে রোগীদের জন্য ঔষধ ব্যবস্থাদিই তারপর সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি ফিরি। এবং বাবার কাছে প্রচুর বকুনি খেয়ে আহারাদি সেরে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হই। প্রণাম করার সময় বাবা বলেন, 'বাড়ির সামান্য কাজটুকু সেরে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমার হাত একেবারে খালি হয়ে এসেছে আর অপর একটা কাজও সেবে ফেলতে চাই তাই আমার টাকার খুব প্রয়োজন পড়েছে, তোমার কাছে যা আছে দাও। তোমার জন্য গোটা দশেক টাকা রাখলেই যথেষ্ট হবে, কারণ কলিকাতায় গিয়েই টাকা পেতে পারবে।' তিনি একথাও জানালেন যে, 'তোমার মেয়ে মায়ার খুব জ্বর হয়েছে আর নন্দরাণীর মেজ ছেলেরও খুব জ্বর চলছে। নন্দরাণী তাড়াতাড়ি তোমায় দেশে পাঠিয়ে দিতে লিখেছে।' আমি মাত্র দশটাকা সঙ্গে

নিয়ে সমস্ত টাকা বাবাকে দিয়ে আসি। তখনও বুঝতে পারি নি যে, বাবা বেরী-বেরীতে প্রচণ্ড ভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। পাছে আমি আক্রান্ত হই সেই ভয়ে আমাকে এ-ভাবে কলিকাতায় ফেরার জন্য তাড়া দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রোগী দেখে বেড়িয়ে যে অর্থ উপার্জন করেছি তাতেই আমার বাড়ি নির্মাণের ব্যয় সঙ্কুলান হয়ে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকারই কথা কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাবার অসুস্থতার খবর জানতে পেরে টাকার মায়া ছেড়ে বাবার প্রয়োজনকেই বেশি গুরুত্ব দিই। গুরুজনদের আশীর্বাদে গ্রহবৈগুণ্যে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়েও আমাকে কোনোদিন দেনা করতে হয় নি। সব খরচ মেটাবার মতো টাকা যথাসময়ে এসে গেছে। একান্ত অসহায় ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক এই মনে করে গা-ঢেলে দিয়েছি তবু হাত পাতি নি বা জানতে দিই নি কাউকে, তাতে কিছু ভুল বোঝার আঘাত সহ্য করতে হয়েছে এই মাত্র। আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল—কাশীধামে আমাদের নিজস্ব বাড়ি করা। দুঃখের বিষয় তাঁর পরলোক গমনের পর কাশীতে বাবা বাড়ি তৈরি করেন। এই বাড়ির খরচের জন্য আমি যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে পেরেছিলাম—এতেই আমার প্রভূত সান্ত্বনা। এই সৌভাগ্যের জন্য মঙ্গলময়ী গুরু শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীকে শতকোটিবার প্রণাম করি। কাশী থেকে ঐদিনই সন্ধ্যাবেলার গাড়িতে উঠে পরদিন সকালে কলিকাতায় এসে পৌঁছি। এসে দেখি আমার মেয়ে মায়া অসুস্থ, আমার ভাগিনেয় ইয় অসুস্থ, তাদের খুব জ্বর। আর আমার ভাই নিতাই তাদের ফেলে রেখে ভাটপাড়ায় দিব্যি চলে গেছে। সবদিক একা সামলানো সম্ভব নয় দেখে আমি বিপন্ন বোধ করলাম। সব কথা খুলে বাবাকে কাশীর ঠিকানায় চিঠি লিখলাম। ইতিমধ্যে দৈববশে অতি সহজেই mutation-এর কাজ অতি সত্বর সমাধা হয়ে গেল। যেদিন কাশী থেকে কলিকাতায় ফিরি সেই দিনই পূর্বাহ্নে আমি রোগী দেখার উপলক্ষ্যে বাহির হয়ে জমি বিক্রেতার বাড়িতে যাই। আমাকে দেখেই বাড়ি বিক্রেতার (Executrix-এর) ছোটছেলে বঙ্কিম ভোস আশ্বাস দিয়ে বলেন—'আজই আমি নাম খারিজের কাজ সম্পন্ন করে দিব—কোনো চিন্তা করবেন না।' আর সত্য সত্যই সেই দিনই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন—অবিলম্বে mutation-এর কাজ সম্পন্ন করে দিয়ে।

এই পত্রে আমি বাবাকে এও জানিয়েছিলাম যে, নিজের বাড়ি তৈরি করতে হলে আমাকে কাছে-ভিতে কোথাও বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হবে।

এসঙ্গে একথাও উল্লেখ করি যে, আমার জমি বিক্রেতার বাড়ির ভিতর দুখানি পছন্দসই ভালো ঘর ভাড়া পাওয়া যেতে পারে। পিতার জবাবের অপেক্ষায় থেকে আমি আমার ইঞ্জিনীয়ার চারুবাবুকে বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিতে বলি। তিনি আমার কথামত বাড়ি তৈরির আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি এবং প্রয়োজনীয় উপাদান ক্রয় করে কাজ শুরু করে দেন। এমন সময় হঠাৎ বাবা অসুস্থ শরীরেই কাশী থেকে কলিকাতায় এসে হাজির হন—বাড়ি-ভাড়া করাতে তাঁর আপত্তি ছিল। তখন আমার বাড়ির বহিরাংশ নির্মাণের উপক্রম হয়েছে। তিনি কাজ থামিয়ে দিয়ে বলেন—'ঘরভাড়া করে দরকার নেই। ভিতর মহলে প্রথমে দুখানা ঘর তুলে তোমরা থাক, এখানে থেকেই বাড়ির কাজের তদারকি করতে পারবে।' তাঁর নির্দেশমত চারুবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরের অংশে, সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে আমার বাসের জন্য দুখানা ঘর তুলেন। বাবা ঐ দুখানি ঘর নির্মাণের কাজের সময় নিজের অসুখের কথা চেপে রেখে খুবই খেটেছিলেন। তাঁর মনের ভাব এইরূপ ছিল যে, আমাকে তাড়াতাড়ি নূতন গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তিনি পরলোক গমন করতে পারবেন। মাতার দেহান্তের পর থেকেই বাবা এ জগৎ হতে কেবল যাবো যাবো করছিলেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সংক্ষেপে সেরে নিয়ে তাড়াহুড়া করে বাবা আমাদের গৃহপ্রবেশ সুসম্পন্ন করেন, তাতে তিনি খুব শান্তিলাভ করেন। আমার ঘর দুখানির জন্য অত্যধিক খাটুনির দরুণ পিতার অসুখ খুব বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করে। তাছাড়া ঘর তৈরির ব্যাপারে তাঁর শরীরে ও মনে যে অস্বাভাবিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল নির্মানের কাজ শেষ হলে তা অকস্মাৎ স্তিমিত হওয়ায় তিনি একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েন, আর তাঁর ব্যাধির নানা লক্ষণ উৎকট হয়ে উঠে। সুতরাং পূর্ণ বিশ্রাম ও বায়ু পরিবর্তনে কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে ভেবে আমি ফেলুকে সঙ্গে দিয়ে তাঁকে গিরিধিতে পাঠাই।

আমার সকল কাজে দক্ষিণহস্ত স্বরূপ আমার সহকারী ও মিত্র ফেলু বাবাকে নিয়ে গিরিধিতে চলে যাওয়ায় আমার উপর বড় রকমের চাপ এসে পড়ে। আমার ডিস্পেন্সারি দেখাশোনার কাজ, আমার ঘর সংসারের ছোট-খাট নানা রকম কাজ এবং নূতন বাড়ি তৈরির তদারকি কাজ—সকল কাজেরই ভারি বোঝা এখন আমার কাঁধে এসে পড়লো একসঙ্গে। আমি বিব্রতও ক্লান্ত হয়ে পড়লাম কিছুদিনের মধ্যেই। মাস দুই যেতে না যেতেই দৈবদুর্বিপাকে ঘটল এক দুর্ঘটনা—মিস্ত্রি সিঁড়ি তৈরি করার সময়

চাতালের কোণে একখানা 'T'-Iron বসাতে পারছিল না। সেই কারণে সে আমাকে ডিস্পেন্সারি থেকে ডেকে এনে উপায় নির্দেশ করতে বলে। তাকে কাজ বুঝাতে থাকি মিস্ত্রি সেইমত 'T'-Iron লোহার বরগা বসাতে যায় আর তার হাত ফস্‌কে 'T'-Iron লোহার বরগাখানি একেবারে লম্বালম্বি ভাবে এসে আমার পায়ের আঙ্গুলের উপর পড়ে। পায়ে জুতা ছিল তৎসত্বেও আমার একটি আঙ্গুল ছেঁচে হাড় গুঁড়িয়ে যায়। আমার কোনো এক বন্ধু-সার্জনকে ডেকে আনা হলে আমাকে তিনি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তারেরা Amputation (অঙ্গচ্ছেদ) ভিন্ন গত্যন্তর নেই একথা বলেন, তাতে আমি আপত্তি জানাই। এবং হাড়ের টুকরাগুলি ফেলে দিয়ে যে কয়টি সেলাই Stich দরকার তা দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে বলি। আর জানাই যে আমার নিজের ঔষধ খেয়ে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করব। আমার কথায় তাঁদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব তা করে ডাক্তারেরা আমায় ছেড়ে দেন। আমি বাড়িতে এসেই ঔষধ খাই। আমি কাউকে এ বিষয়ে কিছু না জানিয়ে চুপ করে চিকিৎসার জন্য যত্নবান হই। কে গিরিধিতে বাবাকে খবর দিল জানি না,—বোধহয় আমার কোন কম্পাউণ্ডার ব্যক্তিগত পত্রে একথা ফেলুকে লিখেছিল আর ফেলু সংবাদটি বাবার কাছে বহন করেছিল। যা হোক এই সংবাদে একটি ফল ফলেছিল—বাবা অবিলম্বে আমাকে দেখবার জন্য গিরিধি থেকে কলিকাতায় চলে আসেন।—আমি তাঁকে হঠাৎ আসতে দেখে আশ্চর্য হই। তিনি এই আচম্বিতে চলে আসার কারণ বিবৃত করে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

পিতৃবিয়োগ

দুই মাস কাল গিরিধিতে অবস্থান করেও পিতার স্বাস্থ্যের বিশেষ কিছু উন্নতি হয়েছে বলে বোধ হয় নি। অসুস্থ শরীর নিয়েই আবার পিতা আমার বাড়ির কাজের কিছু কিছু তদারকি আরম্ভ করেন—কিন্তু ৫।৬ দিনের মধ্যেই নিরতিশয় কাহিল হয়ে পড়েন। তাই তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে, নিজের অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে। তাই একটু টাল সামলে নিয়েই তিনি গঙ্গাদেবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বশত ভাটপাড়ার বাড়িতে না গিয়ে ঐখানকার বলরাম সরকারের ঘাটে গিয়ে উঠেন পরলোক-যাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে। গঙ্গার শীতল ও বিশুদ্ধ বাতাসে ৮।১০ দিন থাকার পর তাঁর

অবস্থা আরও একটু ভালর দিকে যায়। তখন তিনি কাশীতে গিয়ে মণি কর্ণিকার ঘাটে দেহত্যাগের বাসনা করেন। কিন্তু কেউই মুমূর্ষু রোগীকে কাশীতে নিয়ে যাবার সাহস পেলেন না। নিজের ছেলে মেয়েরা তাঁর কথা কানে তুলছে না দেখে তিনি নিজেই যাত্রার সবরকম বন্দোবস্তের কাজে উদ্যোগী হন। তিনি পাড়ার একটি অনুরক্ত ছেলে মারফত রেল কোম্পানির বড় চাকুরে আমার শ্বশুরকে রেলগাড়ির একখানি কামরা বন্দোবস্ত করে দিতে অনুরোধ জানান। আমার শ্বশুর তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন —যথাসময়ে একখানি রিজার্ভ (reserved) কামরা নিয়ে তিনি নিজে নৈহাটীতে এসে উপস্থিত হন। এই সঙ্কটময় অবস্থায় ছেলে মেয়ে কেউই তাঁর সঙ্গে যেতে সাহস করছে না দেখে তিনি পাড়ার দু-একটি অনুরক্ত ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই কাশীযাত্রার উপক্রম করছিলেন। তাঁকে এরূপ অবস্থায় অসহায় ভাবে কাশী রওনা হতে দেখে আমার ভাইবোনেরা ব্যথিত হয় এবং তাঁর কামরায় উঠে কাশীযাত্রা করে। পূর্বেই বলেছি - কাশীতে আমাদের একখানি বাড়ি আছে। কাশীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। সেখানে গিয়ে তিনি ঔষধ খাওয়াও ত্যাগ করেন। বিশ্বনাথের চরণামৃত এবং প্রসাদ পেয়ে ১০ দিন কাশীবাসের পর একাদশ দিনে প্রদোষ রাত্রে বাংলা সন ১৩৪৩ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ঠিক ঐ সময় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। আমার বাড়ির সামনের অংশে তখন রাজমিস্ত্রির কাজ চলছিল—গ্যারেজ এবং গ্যারেজের উপর দোছাতি ঘরখানি তৈরি হয়ে গেছে। আপাতত আমি সামনের অংশের দোছাতি ঘরেই থাকি, সঙ্গে আদরৎ নামে মাহিনা করা মজুরটি বাড়ি তৈরির মাল-মশলা চৌকি দেবার জন্য এই সামনের অংশেই পড়ে থাকত। আমার দরকার মতো চলাফেরার কাজে সে আমাকে সাহায্য করত। রোজকার মত সেদিনও আমি শৌচাদি কাজ সেরে দোছাতি ঘরে শুতে যাবার আগে কলতলার কাজ সারছি এমন সময় বাবার গলা শুনে চমকে উঠি। আর পিছন ফিরে পিছনের বাড়ির উপরতলার ঘরে জানালার দিকে তাকাতেই দেখি বাবা জানালার গরাদ দুটি দু-হাত দিয়ে ধরে মুখ কিছুটা বাড়িয়ে বলছেন 'পাইখানার আর একটু কাছে গিয়ে বসে কাজ সারোনা এত দূরে বসেছ কেন।' তাঁর সুস্থ দেহের দীপ্তি-সম্পন্ন মুখ দেখে আমার মনে সন্দেহ জাগে। সাধ্যমত চট্‌পট্ সিঁড়ি বেয়ে দোছাতি ঘরে গিয়ে ঘড়িতে দেখি তখন রাত্রি ৯টা। একটু বিচার করে দেখে—পিতা যে

কাশীলাভ করেছেন এ বিষয় সন্দেহ রইল না। সকালে উঠেই আমি কাশীতে পত্র লিখে জানতে চাই যথার্থ ঘটনা ও সময়ের বিষয়ে। অবশ্য পত্রডাকে দেবার অব্যবহিত পরে বাবার কাশী প্রাপ্তির সংবাদবাহী টেলিগ্রাম এসে পড়ে। দুদিন বাদে পত্রে জানতে পারি আমার ঘড়ির নির্দেশিত সময়েই পিতার দেহত্যাগ হয়েছে। পায়ে ক্ষত থাকার কারণে হবিষ্যান্ন খাওয়া ছাড়া আমি অন্যসকল শাস্ত্রীয় বিধি পালনে অসমর্থ ছিলাম। পিতা অতি স্নেহশীল ছিলেন। আমরা দুই ভাই যাতে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হই—সে দিকে তাঁর আগ্রহভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ছোট ভাইটি চিররুগ্ন বলে জীবনে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারি নি। এজন্য তাঁর মনে গভীর দুঃখ ছিল। সুতরাং সকলের মঙ্গল কামনায় তাঁর আশা ভরসা আমার উপরই ন্যস্ত ছিল। তিনি সর্ববিষয়ে আমার সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতেন—এমনকি অসুস্থ শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেও তিনি আমার জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণ ব্যাপারে অনেক খেটেছিলেন।

সকল পিতাই তাঁর ছেলে মেয়েদের প্রাণভরে ভালবাসেন সত্য, কিন্তু এখানে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ব্যক্ত করছি। পিতৃহৃদয় যে কত কোমল ও মঙ্গলকামী এটা তাঁর দু-একটি বেদনা ভরা শাসন থেকে বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। সন্তানের সুখেই যে পিতামাতারা সুখী এ বোধও অন্তরে জেগেছিল। ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত ও শিষ্ট হয়ে উঠলে তাঁদের অশেষ আনন্দ হয়। সামান্য নেশা করাটাও যে বদ অভ্যাস এবং সর্বদা পরিহার্য একথাও আমি শৈশবে পিতার একটি কঠোর উক্তি থেকে বুঝেছিলাম। ছোট বয়সে একদিন আমি মধ্যাহ্নে আহারের পর সখ করে পান-সুপারি খাই। দুর্দৈব্য বশে সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর আমার বড় বোনটি বমি করে ফেলে। আমাদের বাড়িতে পান খাওয়ার রেওয়াজ বিশেষ ছিল না বলে আমার খাওয়ার পর আর পান-সুপারী অবশিষ্ট ছিল না এজন্য মা তাকে বমি নিবারণের জন্য পান বা সুপারি দিতে পারেন নি। সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে পিতা যথারীতি সকল সন্তানের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করার সময় যখন শুনতে পেলেন আমার দুষ্কর্মের কথা, তিনি, তখন রুষ্টকণ্ঠে বলে উঠলেন, ওকে একটি চড় বসিয়ে দিলে না কেন? এতটুকু ছেলের আবার পান খাওয়া! পিতার মঙ্গলকর তিরস্কারের তাৎপর্য বুঝে এর পর থেকে আজ পর্যন্ত পান খাবার ইচ্ছা আমি মনে আনি নি। একবার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বেড়াতে যাই পুরাতন দিল্লীর নিকটে ঝোপঝাড়ে ভরা হস্তিনাপুর অঞ্চলে। ঠিক খাবার সময় শীর্ণদেহ বুভুক্ষ

এক ভিখারী এসে হাত বাড়াতেই আমার ভাগের আহার্য আমি তৎক্ষণাৎ তাকে দিয়ে দেই। এ খাদ্য বাড়ি থেকে নেওয়া হয়েছিল'—তখন কোনো খাদ্য ঐ জায়গায় কিনতে পাওয়া যেত না। আমার কাণ্ড দেখে পিতা খুব ব্যথিত হন এবং আমাকে বেদনা ভরা কণ্ঠে তিরস্কার করেন। আর একবার শীতের সময় কলিকাতায় আমি এক ফকিরকে আমার গায়ের আলোয়ান দান করি, এসময় বাবা দুঃখিত হন। তখনও আমার রোজগারের সময় হয় নি। তিনি কষ্টার্জিত অর্থে আমাকে এই চাদরখানা কিনে দিয়ে ছিলেন। পিতাব ব্যথাতুর মনোভাব দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—সন্তানের কষ্ট দেখে পিতা-মাতারা মনে বড কষ্ট পান। এ জন্য সকল দুঃখ কষ্ট থেকে পুত্র কন্যাকে তাঁরা প্রাণপণে আগলে রাখতে চান। এতে আমার এই নীতি উপদেশও মনে উদয় হল যে, পিতার কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় না করে স্বোপার্জিত অর্থেই দয়াদাক্ষিণ্য দেখান দান খয়রাতি করা উচিত। এ সব ব্যাপার বিলাসিতার রূপ নিলে দয়া-ধর্মের গাম্ভীর্যহানি ও উদ্দেশ্য নষ্ট হয়—এই মনোভাব নিয়েই ছাত্র-জীবনে 'হকারী' করে আমার প্রতিষ্ঠানের খরচ চালাই এবং ছাত্রদেরও এইরূপ মনোভাবাপন্ন হতে হাতে কলমে শিক্ষা দেই।

পিতার মৃত্যুর পর আমার জীবনে এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়। এখন থেকে আমি আত্মীয় স্বজনের বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাই। এ সম্বন্ধে পূর্বেই অনেকখানি বলেছি। এখানে কেবল আমার সহায়হীন জীবনের সুখ দুঃখের কথা বিবৃত করব। গ্রহবৈগুণ্যে—মহাগুরু নিপাতের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাগ্যে নানারকম দুঃখ দুর্দশা এসে উদয় হল। পিতার মৃত্যুর ছয় দিনের দিন দারুণ দুর্দৈবেরই ইঙ্গিত পেলাম। তখন আমার বাড়ি তৈরির কাজও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। এমন সময় আমার ইঞ্জিনীয়ার চারুবাবু আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন 'ভয়ের কারণ কিছু আছে,—যতদূর হয়েছে ততদূব থাক, এ বাড়ির জন্য আর বিশেষ কিছু খরচ করবেন না'। তিনি সব কথা খুলে না বললেও বুঝতে পারলাম যে আমার নিকট আত্মীয়দের কেহ আমার অনিষ্ঠসাধনে তৎপর হয়েছেন সুতরাং অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত বাড়ি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে না। বসবাসের প্রয়োজন মিটাবার মতো অংশত নির্মাণকার্য শেষ হলে চারুবাবু আর অগ্রসর হতে রাজী হলেন না। এই অসম্পূর্ণ বাড়ির বর্হিভাগে আমি আমার পরিবার নিয়ে অবস্থান করতে থাকি। আর অভ্যন্তর ভাগ বিশেষ কারণ উপস্থিত হ'লে আমার আত্মীয় স্বজনকে সাময়িক ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেই। নিজের বাটি বিক্রি হওয়ায়

আমার মধ্যম শ্যালিকা, সহধর্মীনির চিকিৎসার্থে আগত মাতুল নারায়ণ চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কণিষ্ঠ পুত্রের চিকিৎসার জন্য মেজ কাকীমা, আরোগ্যার্থী ব্যধিগ্রস্ত ছোট ভগ্নিপতি, কুলপুরোহিতের পুত্রদ্বয় কালীপদ ভট্টাচার্য ও তারাপদ ভট্টাচার্য আর সবশেষে ভাইদের সঙ্গে মামলায় সর্বহারা হয়ে বড় ভগ্নিপতি পর্য্যায়ক্রমে এসে আমার বাড়ির ঐ অংশে দুঃসময়ে বাস করে গিয়েছেন। আমার পিতার নাম করে বড়ভগ্নিপতি এখানে থাকা কালে আমার ছোট ভাই চিকিৎসার আশায় এসে ঐ বাড়িতে কিছুদিন থাকে। বড় ভগ্নি পতির প্ররোচনায়ও কুপরামর্শে আমার ছোটভাই বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার সঙ্গে বৈরাচরণ করে। দুইজনের মিলিত চক্রান্তে বাড়ির অভ্যন্তর ভাগ (যা স্বজন-পরিজনদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেই অংশ) আমার হাত ছাড়া হয়। বড় ভগ্নিপতি চলে যাবার সময় কৌশলে তার কোনো পেটোয়া লোককে ঐ অংশ ভাড়া দিয়ে যান—আর এমন ব্যবস্থা করে দিয়ে যান যাতে ভাড়াবাবদ প্রাপ্য সব টাকা আমার ছোট ভায়ের হাতে পড়ে। আমার বড় ভগ্নিপতির দৌর্জন্য ও অকৃতজ্ঞতা আমার বহু দুঃখ ও মনস্তাপের কারণ হয়েছে। অবশ্য ঘরের কথাতো সমস্ত কিছু সাধারণ্যে প্রকাশ করা চলে না।

মহাগুরু নিপাত বৎসরকে লোকে দুর্দৈবের বৎসর কেন বলে তা, আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। নিজে 'পুনরাবর্তক' জ্বরে ও পায়ে আঘাত পেয়ে অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিলাম, অনেক সময় শুয়ে শুয়েই রোগী দেখতে হত। পিতার অবর্তমানে আর্থিক দিক দিয়েও অভাব অনটনে আমাকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। চিকিৎসালব্ধ আয়ের উপর একমাত্র নির্ভর করেই সংসার চালাতে হত। এর উপর আবার মানুষের ছল চাতুরীও আমাকে কম বিব্রত করে নি। বেলুড়মঠের শিক্ষা এবং নিজ মনের স্বাভাবিক প্রবণতা দুই-ই মিলে আমাকে সরল চিত্তে লোককে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে। এজন্য বহু খল স্বভাবের ব্যক্তির নিকট জীবনে বহুবার ভালো রকমেই ঠকেছি। কিন্তু এতে আমি কখনও ক্রুদ্ধ হই নি। জীবনের সবকিছুতেই শিক্ষণীয় ও মঙ্গলকর কিছু না কিছু মেলে। তিক্ত ও অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাগুলি একেবারে তুচ্ছ বা মূল্যহীন নয়। ক্ষমা, সহানুভূতি, ঔদার্য মনুষ্য চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন করে। আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষাকাতর অতি নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধাচরণ আমাকে বহুভাবে পীড়া দিয়াছে। দুর্দিনে দুঃসময়ে আমি তাদের সাহায্য সহানুভূতি তো পাই-ই নি অধিকন্তু তাদের অত্যাচারে দুর্ব্যবহারে অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। জীব জগতে

এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। আমরা দেবতা নই—মানুষ ত্রৈগুণ্যযুক্ত মায়ামোহে আচ্ছন্ন মানুষের আচরণে ক্রোধ বা ক্ষোভ করা বৃথা। কাজেই মানুষের কাছ থেকে দেবোচিত মধুর আচরণ বা সন্ন্যাসী সুলভ নির্লোভ-নির্লিপ্ততা প্রত্যাশা করা বাতুলতামাত্র। আত্মীয় স্বজনের দুর্ব্যবহার ও উৎপাতকে আমি ধর্মবুদ্ধিতে সহজভাবে নিয়েছি। মনে করেছি এটাও পরোক্ষ ভগবানেরই আশীর্বাদ—শত্রু বেশি আত্মীয়েরা আমাকে আঘাতে, পীড়নে কর্মপাশ মুক্ত করে দিয়ে প্রকৃত বন্ধুরই কাজ করছেন। সকলেই উন্নতি করুক, ভগবান সকলকেই আশীর্বাদ করুন—এটাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

লোকান্তরিত পিতার বিষয় সম্পত্তি

পূর্বেই বলেছি আমি এক সময় সন্ত্রাসবাদী দলের সহিত যুক্ত ছিলাম। এই কারণে আইনের ঝামেলা এড়াবার জন্য আমার নিজস্ব বাড়ি স্বকীয় অর্থে ও চেষ্টায় নির্মাণ করলেও দলিল পত্রাদি পিতার নামে সম্পন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার এই দুর্বলতার সুযোগ আমার ছোট ভাই পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছে। সে এই যুক্তি দেখিয়েছিল যে, পৈতৃক সম্পত্তির অর্ধভাগ তার প্রাপ্য। বাড়িখানি যখন পিতার স্বত্বাধিকারে রয়েছে তখন এর এক অংশ অবশ্যই তার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য; কাহার অর্থে বা চেষ্টায় বাড়ি করা হয়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

পিতা লোকান্তর গমনকালে কাশীর বাড়ি, কাঁঠালপাড়ার বাগান ভাটপাড়ার ব্যারাকবাড়ি, ব্যারাকবাড়ির সন্নিকটস্থ টালিবাড়ি এবং আমাদের পৈর্তৃক ভদ্রাসন বাড়ি ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি রেখে যান। স্বর্গত মাতার অলঙ্কার ও পেন্সনের কয়েক হাজার টাকাও ছিল। ন্যায়ত ধর্মতঃ পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি, নগদ টাকাকড়ি ও মাতার অলঙ্কারাদি দুই ভ্রাতার মধ্যে সমভাবে বন্টিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার ছোট ভাই মনে করত, সেই পৈতৃক স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তার লোভ ছিল মাত্রাহীন, সে আমাকে প্রতারক অনধিকারী হিসাবে তাড়িয়ে দিলেই যেন বেঁচে যেত। সে যাই হোক, তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, আশা পূর্ণ হয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি বা মাতার অলঙ্কারাদি এমন-কি পৈতৃক ভদ্রাসন বাটীর অতি সামান্য অংশও আমি হস্তগত করতে পারি নি। আরও একটি ক্ষোভের কথা আছে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সখের

ফলবাগানখানি আমার পিতা গোয়ালিনীর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। ঐ বাগানে দুর্দৈব ঘটার পর তিনি বসবাস ও তদারকির জন্য বাগানখানি ত্রিভুবন সর্দার নামে এক হিন্দুস্থানী লোকের কাছে 'বন্দোবস্ত' দিয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ঐ লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে বঙ্কিমবাবুর শখের বাগানখানি ঋষি বঙ্কিম কলেজকে দান করবার কথা ছোট ভাইকে বলি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, বাগানের ঐ পৌনে তিন বিঘাব্যাপী বিস্তীর্ণ জমির উপর পিতা ও মাতার নামে ঋষি বঙ্কিম কলেজের হোস্টেল বা ছাত্রাবাস স্থাপিত হবে। কিন্তু ভাই কোনমতেই আমার এই প্রস্তাবে রাজি হয় নি। শেষ পর্যন্ত আমাকে হতাশ হতে হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার আত্মীয়স্বজনও ছোট ভাইয়ের পক্ষে ছিলেন এবং তার আনুকূল্যও করেছেন। সকলের চাপে পড়ে উত্যক্ত হয়ে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-সুলভ ঔদার্যবশতঃ সমস্ত কিছু আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু এইখানেই বৈষয়িক সমস্ত ঝামেলার শেষ নয়। আমি বহু অনুনয়-বিনয় করেও আমার স্বনির্মিত কলিকাতার বাড়ির অর্ধেকভাগ তার হাত থেকে আদায় করতে পারি নি। অবশেষে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পুত্রদের কল্যাণ কামনায় বাড়ির পশ্চাৎবর্তী ঐ অংশের জন্য পূর্ণ মূল্য দিয়েই তার সঙ্গে আপোস রফা করতে হয়েছে।

আমি জানি ভ্রাতৃদ্রোহ, স্বজনদ্রোহ—এই সকলই মহাপাপ। ত্যাগ বৈরাগ্য মানুষকে মহত্ত্বের দিকে নিয়ে যায়। ভগবানের কৃপায় আমার অর্থাভাব নেই, আমি স্বনির্ভর—কাজেই বিষয়সম্পত্তি ইত্যাদি ছোটভাইকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেও আমার মনে কোনো ক্ষোভ বা গ্লানি নেই।

নূতন বাটীতে টেলিফোন আনয়ন

আমি সব সময়ই পরম মঙ্গলময়ী ত্রাণকর্ত্রী মহীয়সী গুরুর উপর নির্ভর করে থাকি। তিনি বিপদে-আপদে প্রসন্নাস্তে পরমদাক্ষিণ্যে রক্ষা তো করেই আসছেন, বহু অভাবিত সৌভাগ্য সুযোগও তাঁর কৃপায় আমার লাভ হয়েছে। এখানে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করছি উদাহরণ স্বরূপ। আমার বাড়ির কাজ এখনও অনেকটা অবশিষ্ট আছে,—তবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে বেশ নামডাক হয়েছে। এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশিষ্ট ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে চিকিৎসা

করতে যাই। স্বর্গত রামকান্ত বসুর চতুর্থ কন্যার মাস দেড়েকের ছেলে এটর্নী সনৎকুমার দের প্রথম পুত্র ডবল নিউমোনিয়ায় মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পৌঁছে ছিল। তাকে Oxygen দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছিল—ঔষধ খাওয়ান সম্ভব হচ্ছিল না। বিখ্যাত অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার মণি সরকার তার জীবনের আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি গিয়ে দেখি—তাকে বাড়ির বাহির মহলে সাধুদের তীর্থতুল্য বাসস্থানে বের করে রাখা হয়েছে। শিশুটির মুখ দিয়ে নাল্ গড়িয়ে পড়ছিল, গলা দিয়ে ঔষধ বা জলও ঢুকছিল না। আমি বহুকষ্টে অনেকক্ষণের প্রচেষ্টায় তার মুখের ভিতর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সামান্য করে দিয়ে ঘসতে থাকি—এইভাবে প্রায় ১০।১৫ মিনিট ধরে এই প্রক্রিয়া চালানোর পর শিশুটি ঢোঁক গিলে ফেলে। তার মুখ দিয়ে নাল্পড়া ক্রমশঃ কমে আসে। এটা লক্ষ্য করে আমি আশ্বস্ত হই ও বলি, মনে হয় বিপদ কেটে গেছে। আমাকে রাত্রি বারটা নাগাদ একবার ডাকলে ভাল হয়, সে সময় রোগীর অবস্থা দেখে আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারব। এই বলে আমি বাড়ি ফিরে আসি। তার পর আমি শুতে না গিয়ে প্রায় রাত্রি বারটা পর্যন্ত ডাক্তারী বই খুলে পাতা ওল্টোতে ওল্টোতে চলি আর ঐ বিশেষ রোগের বিষয়ে মনোনিবেশ করতে থাকি। এমন সময় বাড়ির দরজার কাছে মোটরের হর্ন বেজে ওঠে। ঐ আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম যে, রামকান্তবাবুর বাড়ি থেকে এখন লোক এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে। আমি তাড়াতাড়ি উপর তলা থেকে নেমে এসে গাড়িতে উঠে বসে বোস-মশাইদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছি। গিয়ে দেখি—শিশুটি একরকম ষোল আনা আরোগ্যের পথে এসেছে, তাকে বাড়ির বহির্ভাগ থেকে অন্দর মহলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দিদিমা, মা, মাসী, আত্মীয়স্বজন সকলের মুখ আশার আলোয় প্রসন্ন হাসির উচ্ছ্বাসে ভরা,—বাড়িময় যেন আনন্দ উল্লাসের ফোয়ারা ছুটছে। এই সহর্ষ দৃশ্য দেখে আমার প্রাণও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। বলা বাহুল্য, সকলেই আমাকে সাদর অভিনন্দনে আপ্যায়িত করলেন।

তখন রামকান্তবাবুদের বাড়িতে আত্মীয়দের মধ্যে ছিলেন কমিশনর বি, কে, বোসের স্ত্রী। আমার চিকিৎসার অদ্ভুত সাফল্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। মহিলাটি ছিলেন একটু আবেগপ্রবণ। তিনি আমাকে সেই আনন্দ উচ্ছলতার মধ্যে হঠাৎ বলে উঠলেন—‘ডাক্তারবাবু ভাল কথা

মনে পড়েছে, আপনার বাড়িতে টেলিফোন আছে? না থাকে তো, এখনই এর বন্দোবস্ত করুন। আমার কর্তা প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকেন, ছেলেপিলে নিয়ে আমি একা থাকি। প্রয়োজনের সময় আপনাকে খবর দেবো কি ভাবে।' তাঁর কথা শুনে আমারও যেন চমক ভাঙে— সত্যই তো চিকিৎসার কাজে সুবিধার জন্য এখন আমার একটি টেলি-ফোনের দরকার। আমি উত্তর দিই, 'না, আমি এখনো টেলিফোন আনি নি। নূতন বাটী পুরোপুরি তৈরি হতে সামান্য কিছু বাকি আছে,—শীঘ্রই আনবো ভাবছি। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'আজই আপনি এরজন্য দরখাস্ত করুন।' পরদিন সকালে আবার আমি রামকান্তবাবুর দৌহিত্রকে দেখতে যাই তাঁদের বাড়িতে। টেলিফোনের ব্যাপারে আমার গড়িমসি দেখে উক্ত মহিলাটি ঐ দিনই নিজে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমার বাড়িতে টেলিফোন আনবার জন্য 'বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানি'-র কাছে দরখাস্ত লিখে পাঠালেন এবং করণীয় আর সবকিছুও করলেন। তাঁর সহৃদয়তার জন্য 'টেলিফোন' আনার ব্যাপারে আমাকে কিছুমাত্র খাটতে বা হয়রানি হতে হয় নি,—টেলিফোন যেন আপনা-আপনিই হাতে এসে পড়লো। আমি এরজন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহণ করে-ছিলাম মাত্র।

বারিদবরণ বাবুর ইহলীলা সংবরণ ও আমার শোক

শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের আমি অতিশয় স্নেহভাজন হয়ে উঠেছি দেখে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যুৎবরণ মুখোপাধ্যায় আমার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেন। তিনি আমার ও শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবুর মধ্যে বিরোধ ও মনোমালিন্য সৃষ্টির নানারকম প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন। ছোটভাইকে বারিদবরণ বাবু প্রাণ ভরে ভালবাসতেন বলে স্নেহান্ধতাপ্রযুক্ত বিদ্যুৎবাবুর দোষ তাঁর নজরে একেবারেই পড়ত না। বিদ্যুৎবরণবাবুর অশিষ্ট আচরণে আমি বহুবার অপদস্থ এবং মর্মাহত হয়েছি। উকিল হলেও বিদ্যুৎবাবুর আয় বিশেষ একটা ছিল না। দাদাকে সব কথা খুলে বলে ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে গেলে পাছে বিদ্যুৎবাবুর বৈষয়িক ক্ষতি হয়, স্ত্রীপুত্রসহ তিনি অসহায় হয়ে পড়েন – এই ভেবে আমামে নিরস্ত হতে হয়েছে। আমি ও ইঞ্জিনীয়ার চারুবাবু এই ব্যাপারে একবার বারিদবরণবাবুর বাড়িতে যাই।

সর্বপ্রথমেই দেখা হয় বিদ্যুৎবাবুর সঙ্গে। তিনি ভয় পেয়ে নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে অনুনয়-বিনয় করে আমাদিগকে থামিয়ে দিলেন। বারিদবরণবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব কিছুর মুকাবিলা আর করা হল না। সুতরাং অনিবার্যভাবেই শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবুর জীবনের শেষ কয়েক মাস আমার সহিত ভুল বোঝাবুঝি চলেছিল। বিদ্যুৎবরণ বাবুর দাদার প্রতি কোনদিনই এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধও ছিল না। ছোট ভায়ের দুষ্ট আচরণে বৃদ্ধ বয়সে জীবনের প্রান্ত সীমানায় এসে শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবু মনে বহু বড় বড় আঘাত পেয়েছিলেন। একেই পূর্ব থেকে তাঁর বড় মেয়ে-জামাই ও জ্যেষ্ঠপুত্রের অকাল মৃত্যুতে তাঁর প্রাণটি শোকে-তাপে জর্জরিত হয়েছিল। তাঁর মনের অবস্থা আমি অনুভব করতে পারতাম, কিন্তু বিদ্যুৎবরণ বাবু প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানর ফলে আমি তাঁর কাছে যেতে পাবতাম না। আমি নিশ্চয় জানতাম যে, আমাকে দেখলে তিনি প্রভূত সান্ত্বনা ও আনন্দ উদ্দীপনা অনুভব করেন। তাঁর প্রাচীন রোগী পূর্ণচন্দ্র উদ্ভট্‌সাগর প্রমুখ ব্যক্তির কাছে আমার দেখা না পাওয়ার বিষয় নিয়ে আপসোস্ করতেন। পূর্ণবাবু আমাকে এবিষয়ে বহুবার বলেছেন। তবুও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটানোর ভয়ে আমি তাঁর কাছে সাহস করে উপনীত হ'তে পারিনি। এই ব্যাপারে মর্ম্মবেদনায় আমারও অন্তর দগ্ধ হত। কিন্তু করব কি ? আমি নাচার !

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে অন্তিম-দশায় শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবু 'Coronary Thrombosis'-এ আক্রান্ত হন। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর এই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে অর্ধ্বচৈতন্য অবস্থায়ও কিছুক্ষণ পরে পরে 'গৌর ! গৌর !' বলে চিৎকার করে ডাক্‌তে থাকেন। বিদ্যুৎবরণ বাবু বাগড়া দেওয়ায় বাড়ির কেউই আমাকে ডেকে নিতে সাহসী হননি। অসুখের তৃতীয়দিনে আমাদের পাড়ারই বাসিন্দা ও আমাদের রোগী 'ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন্-জজ' ক্ষিতিপতিনাথ মিত্র সকালবেলা দেখা হলো বলে উঠেন "গৌরবাবু আপনার গুরুদেব যে ভয়ানক অসুস্থ, আজ তিন দিন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন, আর মধ্যে গৌর ! গৌর ! করছেন, তাকি আপনি জানেন না ?" আমি হতচকিত হই, আর উত্তর দেই "না, কেউই তো আমাকে এ-সংবাদ দেয় নি।" আমি অবিলম্বে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। সেজভাই ব্রহ্মবরণ মুখোপাধ্যায় আমাকে দেখামাত্র দাদার অবস্থার বিষয় বর্ণনা দিতে দিতে আমাকে জাপটে ধরে দাদার কাছে নিয়ে হাজির করেন আর প্রাণপণে চেঁচিয়ে দাদাকে বলতে থাকেন "দাদা গৌরবাবু এসেছেন—দেখুন।" বহু ডাকাডাকিতে

অল্প-কিছু চৈতন্য পেয়ে 'লাল্-করম্চার' মতো চোখ দুটো বড় বড় ক'রে মেলে তিনি যেন আমাকে একটুখানি চিন্‌তে পারলেন। আর অমনি আবেগভরে "কে গৌর! বাবা এসেছ?" এই ব'লে দুই হাত বাড়িয়ে আমাকে সবলে গলাজড়িয়ে ধরলেন এবং সজোরে টান মারলেন। আমি টাল্ সামলাতে না পারায় তাঁর বুকের উপর হুমড়িখেয়ে পড়ে গেলাম। ব্রহ্মরবণবাবু সামলিয়ে ছিলেন ব'লে আমার মাথার চাপ্ কেবল তাঁর বুকের উপর গিয়ে প'ড়ে ছিল। যখন ব্রহ্মবরণ বাবু অনেক টানাটানি করে আমাকে ছাড়িয়ে আনলেন তখন তাঁর মর্তলীলা শেষ হয়ে গেছে,—তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমি আর সেখানে না দাঁড়িয়ে বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে একটিও কথা না বলে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে বাড়ি ফিরে এলাম।

শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ বাবু ছিলেন ইংরাজ আমলের শেষ দিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথদের অন্যতম। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে নেটিভস্টেট (Native State) গুলিতে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু তিনি আমার কাছে ছিলেন পিতৃতুল্য—শুধু চিকিৎসা বিষয়ে গুরুরূপেই নয়—প্রগাঢ় স্নেহে আর আন্তরিক হিতৈষণায়ও। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁর সহৃদয়তায় আমি যেমন হ্যোমিওপ্যাধিক চিকিৎসার ব্যাপকক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও শারদর্শিতা লাভের বড়রকম সুযোগ পেয়েছিলাম তেমনি তাঁর অপরিসীম স্নেহে ও সহানুভূতিতে আমি ধন্য হয়েছি। তিনি গুরুরূপে আমার শ্রদ্ধেয় প্রণম্য আর মঙ্গলকামী স্নেহশীল পিতৃ-সম গরিষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে পরমাত্মীয়—পরম পূজনীয়। ইহলোক পরলোকে স্নেহের বন্ধন যে অটুট থেকে যায়, এ বিশ্বাস আমার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয়েছে—সূক্ষ্মদেহী বারিদ-বরণ বাবুকে স্বপ্নে বহুবার প্রত্যক্ষ করার ফলে। এমনকি দুই-একবার স্বপ্নে আর্বিভূত হয়ে আমাকে কঠিন রোগের ঔষধও বলে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের করুণা

এর পর বলছি—পূর্ববঙ্গের বহু খ্যাত তান্ত্রিকযোগী শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীরাম-ঠাকুরের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোধ হয় ১৯৪২।১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হবে—স্পিকার (Speaker) সত্যেন্দ্রনাথ মিত্রের স্ত্রীর উদরে 'Tumour' হয়ে ছিল। তাঁর বাড়িতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে আমি আহূত হই। আমি অবশ্য ভদ্রমহিলার চিকিৎসার ভার নেই নি। কারণ, আগে

থেকে শল্যচিকিৎসার (Surgical operation-এর) সব আয়োজন হয়ে গিয়েছিল। আমি চলে আসার সময় সত্যেনবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন, 'এ রোগীকে না হয় নাই দেখলেন; তবে দয়া করে আপনি যদি একবার আমার গুরুদেবকে দেখে যান—তাহলে আমি খুব খুশি হবো। উনি অনেকদিন যাবৎ চোখের রোগে ভুগছেন।' ভবানীপুরে আমি সত্যেন মিত্রের গুরুদেবকে দেখতে যাই। দোতলায় উঠে দেখি—শিষ্য, ভক্ত, অনুরাগী সমেত একঘর লোক নিয়ে—কী কারণে জানি না—ঠাকুর রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন। সমবেত ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি আমার পূর্বপরিচিত ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত পূজনীয় ঠাকুর রামচন্দ্রের পরমভক্ত শিষ্য। তিনি আমাকে দেখে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'ভাই ডাক্তার, তুমি এসেছ—খুব ভাল হয়েছে। আমার গুরুদেব চোখের পীড়ায় খুব কষ্ট পাচ্ছেন। এখন তোমার চিকিৎসার গুণে তাঁকে ভাল কবে তুলতে পার কিনা দেখ তো।' পরনের কাপড়ের একপ্রান্ত গলায় ঝুলিযে ছোটখাট অতি বিনীত রোগাটে অতিশিষ্ট নিরীহ মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বয়ং পূজ্যপাদ ঠাকুর রামচন্দ্র। বহুকাল ধরে আমি তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষী ছিলাম। অনেকদিন ধরেই আমি শ্রীশ্রীরামঠাকুরের কথা শুনে আসছিলাম উত্তরপাড়ার জমিদার প্রবর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রামদাস মুখোপাধ্যায় ও বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ কালীকানন্দ ব্রহ্মচারীর মুখ থেকে। তাঁরা বলেছিলেন, 'শ্রদ্ধেয় রামঠাকুর এখনকার দিনের খুব বড সাধু এবং খুব অমায়িক সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে খুব আনন্দ পাবেন।' শ্রদ্ধেয় রামঠাকুরকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ আমার প্রাণে খুবই প্রবল ছিল। কিন্তু বৈষয়িক অসুবিধা হেতু এতদিন তাঁকে গিয়ে দর্শন করার সৌভাগ্য হয় নি। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রাণে সুপ্ত রয়েছিল। সত্যেনবাবুর মারফত সে শুভ সুযোগ এখন এসে গেল। আর আমার প্রাণ আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। আমি পূজনীয় শ্রীশ্রীরামঠাকুরের কিছু চিকিৎসা করেছিলাম। তখন তিনি দিনে মাত্র ১টি ডাব খেয়েই থাকতেন। আমার ঔষধ খেয়ে তিনি অনেকখানি নিরোগ হয়েছিলেন। চিকিৎসার সুবিধার জন্য পরে তাঁকে নারিকেলডাঙ্গায় ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ঝড় বৃষ্টিতে 'টেলিফোন' বিপর্যস্ত হওয়ায় ওখান থেকে কোন সংবাদ আমার কাছে এসে পৌঁছতে পারে নি।

এই কারণে কিঞ্চিৎ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে আমার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীশ্রীরামঠাকুরের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল একটি বিশেষ কারণে। তখন কলিকাতার আশে পাশের অঞ্চলে, বলতে গেলে সমগ্র দেশজুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। দুই একবার ডালহৌসীতে (B. B. D. Bag.) বোমা পড়ায় বহুলোক ত্রাসে কলিকাতা ছেড়ে চলে যায়। এই দেখে সত্যই আমি মনে মনে বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে করলাম কাশী গেলে হয়ত কিছুটা নিরাপদ হতে পারব। কিছুকাল কাশীতে বাস করে দেশে শান্তি এলে কলিকাতায় আবার ফিরে আসব। পিতা অপ্রকট হবার পূর্ব থেকেই ঐখানকার স্থানীয় পুরোহিত নিশীকান্ত ভট্টাচার্যের উপর আমাদের কাশীর বাড়ি তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। তারাই বাড়ির দেখাশোনা করে ভাড়াটে বসায়, টাকা আদায় করে, ভাড়াটে বিদায় করে। আর আমরা অবরে-সবরে বিশেষ প্রয়োজনে কিংবা হাওয়া বদলের উদ্দেশ্যে মাত্র দু-দশদিনের জন্য গিয়ে অবস্থান করি। এখন আমি কিছুকাল কাশীবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে নিশীকান্তর নিকট পত্র লিখি—আমার অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় সব আয়োজন করে রাখতে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হলো না। আমার পত্রের উত্তরে নিশীকান্তর বড় ছেলে সরল মনে লিখল,—'চলে আসুন, ঘর খালি আছে এবং খাওয়াদাওয়ার দিক দিয়েও সুবিধা—জিনিসপত্র বেশ সস্তা।' ছেলের চিঠি পেয়ে মনে মনে খুশী হলাম। কিন্তু পরের দিনই নিশীকান্তরও একখানি পত্র হাতে এল। এ-পত্রে নানা অসুবিধার কথা তুলে আমাকে কাশী যেতে কড়া রকমের নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। এতে বুঝলাম—এর পিছনে রয়েছে আমার ছোট ভাইয়ের দুরভিসন্ধি। নিশীকান্ত তারই প্ররোচনায় আমার সঙ্গে এই রকম অভদ্র ব্যবহার করেছে। মনে ব্যথা পেলাম। আমার মনের দুঃখ গোপন রেখে আমি কলিকাতায়ই খুব সাবধানে দিন কাটাতে থাকি। এমন সময় একদিন ভোররাত্রে ৪টা নাগাদ দরজায় খট্ খট্ শব্দ হয়। বোমার ভয়ে তখন নীচ-তলার ঘরে ছেলেমেয়ে—পরিবার নিয়ে থাকতাম। আওয়াজ শুনতে পেয়ে দরজার কপাট খুলেই দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়। তিনি শ্রীশ্রীরামঠাকুরের বার্তা নিয়ে এসেছেন আমার কাছে। শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী মহাশয় বললেন,—'রামঠাকুর আপনার মনের কথা জানতে পেরেছেন—আপনি বড় ভয় পেয়ে গিয়েছেন। ঠাকুর আপনাকে

'অভয়' দিয়েছেন। আপনার কোন বিপদ হবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন।' আমি বিস্মিত হলাম—পূজনীয় রামঠাকুরের অভয় বাণী শুনে। খুব উঁচু দরের সাধু না হলে তো এ রকম পরের মনের কথা জানা কারোপক্ষে সম্ভব-পর হয় না। তিনি কি দেবতা যে—এত সদয় হৃদয়ে সময়োপযোগী অভয় বাণী পাঠিয়ে আমায় সান্ত্বনা দিলেন।

নলিনী মহারাজ ও রাজেন্দ্র দেব

কিশোর বয়সে সংসার ত্যাগের ইচ্ছায় মামার বাড়ি থেকে কাউকেও না জানিয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা বেলুড় মঠে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তখন একজন মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী আমাকে প্রভূত সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন—আমার প্রতি সস্নেহ সদয় ব্যবহার করেছিলেন, একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাঁকে মঠের সকলে গৃহস্থাশ্রমের নামে নলিনী মহারাজ বলেই ডাকতেন। তাঁর সন্ন্যাস আশ্রমের নাম অমৃতানন্দস্বামী। কৃতজ্ঞচিত্তে আজও স্মরণ করি—ত্যাগ-বৈরাগ্য-সত্য ও পরমার্থ অন্বেষণের পথে তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণাদানের কথা! নলিনী মহারাজের উপদেশ মতো চলেই বেলুড় মঠের বড় বড় সাধু মহাত্মাদের কাছে যাওয়ার সুযোগ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নলিনী মহারাজ আমার হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টা ছিলেন বটে, তাছাড়াও তিনি ছিলেন আমার প্রকৃত বন্ধু, ভালোবাসা দিয়ে আমার অন্তর জয় করেছিলেন। নলিনী মহারাজ আমার শাস্ত্র শিক্ষাদাতা গুরু ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন আমার প্রকৃত আত্মীয়। কিছুকাল বেলুড়মঠে যাতায়াত করতে করতে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। তখন জানতে পারি তিনি মধ্যকলিকাতার ঠনঠনের বিখ্যাত 'দেবপরিবারের' লোক; প্রথম যৌবনে সংসার বৈরাগ্য মনে উদয় হওয়ায় বেলুড়মঠে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নলিনী মহারাজ তাঁর অগ্রজ গৃহী-সন্ন্যাসী রাজেন্দ্র দেবের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করে দিয়েছিলেন। মাননীয় রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গেও আমার হৃদ্যতা হয়েছিল। আমি বহুবার তাঁদের ঠনঠনের বাড়িতে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে বৈঠকী আলাপ-আলোচনায় বেশ আমোদ আনন্দও পেয়েছি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে আমার প্রতি রাজেন্দ্রবাবুর বিশেষ আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। যে-সময় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন সেই সময় রংপুর জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট গাইবাঁধার

সুপ্রসিদ্ধ উকিল বেণীমাধব দাস ইংরাজের জেলে দারুণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। রোগীর অবস্থা সংকটজনক বুঝে বৃটিশ সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। সে সময় তাঁকে রাজেন্দ্রবাবু নিজ বাড়িতে নিয়ে এসে আমার উপরই তাঁর চিকিৎসার ভার অর্পণ করেন। এতেই প্রমাণিত হয়—আমার উপর তাঁর কত গভীর বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল।

হোমিওপ্যাথিকের প্রতি সর্ব্বসাধারণের শোচনীয় ঔদাসীন্য

অনেক ক্ষেত্রে ভাল মন্দর বিচার গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না। যে বিষয়ে যতবেশী প্রচার, লোকের দৃষ্টি ততই সেদিকে আকৃষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনের জোরে অনেক নিকৃষ্ট বস্তুও বাজারে সমাদর পায়। শিক্ষিত ব্যক্তিরাও যে, সত্যকার গুণ বিচারে সক্ষম হন—এমন কথাও বলা চলে না। অনেক অসার বস্তুও কেবল চটক্‌দার বিজ্ঞাপনের জোরে তাঁদের প্রিয় হয়ে উঠে। উন্মত্ত প্রচার ও বিজ্ঞাপনের সহায়তায় আজিকার দিনে স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীরা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন। চিকিৎসাক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় আমার মনে এই বোধ দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে যে, অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বহুলোক যথার্থ উপকারী ঔষধ ও চিকিৎসা অগ্রাহ্য করে ঢাক্ পিটিয়ে নামকরা বাজার-চলতি ঔষধ ও চিকিৎসার সহায়তা গ্রহণ করেন। এই মূর্খতা ও অবিবেচনার ফলে বহু মূল্যবান জীবন অকালে বিনষ্ট হয়েছে। খ্যাতির ঔজ্জ্বল্যহীন চিকিৎসাও যে মঙ্গলকর হতে পারে আমাদের শিক্ষিত মহল আর জনসাধারণের মধ্যে সেই উদার দৃষ্টির একান্ত অভাব। বাজার চলতি চাকচিক্যময় আসুরিক চিকিৎসা এবং ঔষধের দিকেই জ্ঞানী, মূর্খ—সকল লোকেরই একচোখা নজর। একটি উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করে বলছি। ডক্টর রাধাবিনোদ পাল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়টা ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল। ঐ সময় যুদ্ধাপরাধী জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর বিচার চলছিল—টোকিও নগরে সাময়িক ভাবে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে। রাধাবিনোদ পাল মহাশয় জাতিপুঞ্জ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ঐ আদালতে যোগ দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের পক্ষ হতে বিচারক রূপে। তখন বোধহয় ইংরাজী ১৯৪৮ কি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হবে। তাঁর পত্নী অনেক বৎসর যাবৎ দারুণ হৃদ্‌রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন।

তিনি রুগ্না পত্নীকে কলিকাতার বাড়িতে রেখেই বিচারকের কর্তব্য পালনের জন্য জাপানে চলে যান। পত্নীর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক জেনে ইংরাজী ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছুটি নিয়ে কলিকাতায় আসেন। তাঁর জামাতা ডাক্তার অমর পালের তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী রাধাবিনোদবাবুর পত্নীর অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু এই ১৭।১৮ বৎসরের চিকিৎসায়ও কোনরূপ ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। রোগিনীর অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকেই চলছিল। রাধাবিনোদবাবু হতাশায় ভেঙে পড়ে ছিলেন। এই সময় একদিন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। বার-লাইব্রেরীতে বসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খুব করুণ ভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন পত্নীর অতিশয় সংকটজনক অসুস্থতার বিষয় নিয়ে। তখন বিচারপতি বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায় পরামর্শ দেন পাল মশাইকে—"হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাটা একবার করিয়ে দেখুন না কেন?" তাঁর কথা শুনে পাল মহাশয় যেন আকাশ থেকে পড়লেন।—বললেন "হোমিওপ্যাথিক আবার কী রকম? আমি তো এর কিছুই জানি না! আর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ভালো কেই বা আছেন—তাও তো জানি না। আপনারা যদি বন্দোবস্ত করে দেন তাহলে আমার কোন আপত্তি নাই।" তারপর বিজনবাবুরপরামর্শ মতো বেলা ২টা নাগাদ হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরী থেকে আমাকে ফোনে ডাকা হয়। বিজনবাবু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন; তিনি আমার নাম শুনেছিলেন দক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে এবং আমার গুণগ্রাহীও ছিলেন। আমি চিকিৎসা করতে রাজী হই। পরদিন বেলা ১১টায় রোগী দেখার সময় ঠিক হয়। এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে আমি গিয়ে হাজির হই। রোগিনীর অবস্থা ছিল সত্যই আতংককর। দোতলার ঘরে ঢুকে রোগিনীর দিকে নজর পড়তেই দেখি—তিনি খাটের উপর শুয়ে আছেন, বিছানার উপর অয়েল ক্লথ পাতা—আর তার উপরে একখানা পাতলা কাপড় বিছানো। হৃৎপিণ্ডের বিকলতার জন্য জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন, আর পেটটাও সব সময় ফেঁপে ফুলে থাকত। মাথার চুল একেবারেই ছিল না বলা যায়—দু-চার গাছি চুল সামনের দিকে দেখা যাচ্ছিল। তাছাড়া **Bedsore**-এ তাঁর শরীরের সমস্ত পিছন ভাগ ছেয়ে ফেলেছিল। মাথা থেকে আরম্ভ করে সারা পিঠ, পাছা, কোমর সব যায়গায় দগদগে ঘা হয়েছিল। তিনি কঙ্কালসার হয়ে পড়েছিলেন। আহারে বিতৃষ্ণা উৎকট হয়ে উঠেছিল—কেউ খাবার কথা

বলতে এলে তিনি উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে কটুক্তি বর্ষণ করতেন। এজন্য কন্যাদের কেউ তাঁকে খাবার কথা বলতে সাহসী হত না। শ্রীমতী পালের হার্ট (Heart) পরীক্ষা করে দেখি হার্টটি বায়ুর চাপে ঠেলে উপরের দিকে উঠে স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়েছে। তখন হার্টের কোনরূপ যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে কিনা বুঝা সম্ভবপর ছিল না কাজেই সবদিক বিবেচনা করে আমি তাঁকে ৮ মাত্রা ঔষধ দেই। এবং ঔষধ খাবার নির্দেশ ও আনুষঙ্গিক কতকগুলি নিয়ম পালনের উপদেশ দেই। এরপর প্রায় ছয় মাস কাল আমি তাঁর কোন খবরাখবর পাই নি। কী হল না হল ভেবে মনটা সংশয় দোলায় দুলছিল; কিন্তু বিধাতা সুপ্রসন্ন ছিলেন—আমার কয়েক মাত্রা ঔষধ তাঁর ক্ষেত্রে মৃত সঞ্জীবনীর কাজ করেছিল—দৈবানুগ্রহে পরে এ সুখবর জানতে পেরেছিলাম। সে কথাই এখন বলছি।

ডঃ পাল, পত্নীর চিকিৎসার ভার আমার উপর দিয়েই বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। রোগিনী অবিলম্বে সুস্থ হয়ে উঠায় এবং পাল মহাশয়ও সত্ত্বর বিদেশে চলে যাওয়ার দরুণ বাড়ির কেউ আর খেয়াল করে রোগিনীর কথা আমাকে জানান নি। রাধাবিনোদ পালের জামাতা ডাঃ অমর পাল তাঁর শাশুড়ী মাকে 'এক্সরে' ইত্যাদির সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে দেখে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পালগিন্নি সত্য সত্যই সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠেছেন। এরপর আর রোগিনী সম্পর্কে দুর্ভাবনা রইল না; কাজেই আমাকে খবর দেবার গরজও কিছু ছিল না। ইংরাজী ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষদিকে ভারত-সভার (Indian Association) সভ্যবৃন্দের এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে আসেন ডঃ রাধাবিনোদ পাল। আমি তাঁর পূর্বে গিয়েই আসন গ্রহণ করেছিলাম। একটু পরেই তিনি সভাগৃহে প্রবেশ করেন। আর সেই মুহূর্তে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। তিনি আসন গ্রহণ করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে এমন ভাব প্রকাশ করলেন যে, মনে হল তিনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান। তাঁর মনোভাব বুঝে আমি নিজেই তাঁর সন্নিকটে চলে যাই। আমাকে দেখে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠেন। পাল মহাশয় আমাকে দুই হাত ধরে খুব বিনীতভাবে সলজ্জ ভঙ্গিতে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে তাঁর নিজের অজ্ঞতার জন্য দারুণ খেদ করেন। আমি তাঁর পত্নীর কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি রোগিনীর পরিপূর্ণ আরোগ্যলাভের সুসমাচার দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হোমিওপ্যাথিকের প্রশংসা করেন এবং আমার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাল মহাশয়ের মুখে এই সুখবর শুনে

আমার প্রাণটাও স্বস্তি ও আনন্দে ভরে উঠল। রাধাবিনোদ পাল মহাশয় শিষ্ট ও মধুর সম্ভাষণে আমাকে আপ্যায়িত করে একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর পুনর্জীবনপ্রাপ্তা প্রাকব্যাধি-দশার সৌষ্ঠবযুক্তা পত্নীকে দেখে আসতে সাদরে আমন্ত্রণ করেন। আমি আপাততঃ নিমন্ত্রণটি এড়িয়ে যাই।

মহাপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী

ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী বাঙালী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন একটি উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় যখন তিনি All Bengal Physicalculture Association-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। পূর্বে বলেছি, আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন বিশেষ সদস্য। ইংরাজী ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গার কালে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই সময় তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তাঁকে আমি কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করি ও সান্ত্বনা দেই। ইংরাজী ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Constituent Assembly-র Vice President ছিলেন—এবং নূতন দিল্লীর Windsor Place অঞ্চলে ১৬ নং বাটীতে থাকতেন। তাঁর এ-সময় অর্শ (Piles) রোগ খুব যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠে। Operation করায়ও কোন উপকার দেখা গেল না। তখন শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় নিরুপায় হয়ে অতি কাতর ভাবে আমাকে সাহায্যের জন্য লেখেন। তাঁর ছিল হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধা ও আমার প্রতি গভীর বিশ্বাস। আমি উত্তরে সম্মতি জানিয়ে চিঠি লেখার পর তিনি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় চলে আসেন। আমি তাঁর চিকিৎসা করি। এই সময় থেকেই প্রকৃত পক্ষে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। প্রথম প্রথম শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্রবাবু আমাকে লেখা চিঠিতে, "with best regards" কথাটি ব্যবহার করতেন, এখন থেকে তিনি আমাকে Nephew সম্বোধন করতে থাকেন। মাসাধিককাল আমার চিকিৎসাধীনে থাকার পর হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুস্থ হয়ে উঠেন—তাঁর অর্শের জ্বালাযন্ত্রণা সম্পূর্ণ উপশম হয়েছিল—আরোগ্যলাভ করে তিনি দিল্লী চলে যান। কয়েক মাস পরে আবার Sciatica-র চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। এই সময় আমাদের খুব দুর্দিন চলছিল। আমি নিজে 'পুনরাবর্তক' জ্বরে খুব অসুস্থ ছিলাম—চলা-ফেরা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠে ছিল। এ ছাড়া আমার সংসারে পর পর দুটি মর্মান্তিক দুর্দৈব দেখা দেয়। আমার তৃতীয় কন্যাটি আকস্মিক

ভাবে মারা যায়। আমি অসুস্থ থাকায় তার প্রতি যথাযথ নজর দেওয়া সম্ভব হয় নি। এ কারণে সেকথা স্মরণে আসলে এখনও মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়। তারপর বড় ছেলে দেবীকে নিয়ে ঘটে এক আকস্মিক দুর্দৈব। তখন সে মিত্রস্কুলে পড়ত। স্কুলে যাওয়ার পথে ইং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি একদিন দুর্বৃত্তেরা তাকে প্রায় বেলা দশটার সময় choloroform মাখা রুমাল শুঁকিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাতেও মর্মবেদনায় ও দুর্ভাবনায় আমার প্রাণে জ্বালার উদ্ভব হয়। এই দুর্দিনে শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরম সুহৃদের কাজ করেছিলেন। আমার বিপদাপদের সংবাদ পেয়ে গভীর সমবেদনায় তিনি এগিয়ে এসেছিলেন আমাকে সাহায্য করার জন্য। গুণ্ডারা দেবীকে আহেরীটোলায় তাদের নিভৃত গুপ্ত আড্ডায় লুকিয়ে রেখেছিল। শত চেষ্টায় আমি তাকে খুঁজে বার করতে পারছিলাম না। হরেন্দ্রবাবুই উদ্যোগী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মাধ্যমে—অন্বেষণের কাজে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ নিযুক্ত করেছিলেন। ২৫।২৬ দিন পর গুণ্ডাদেরই একজন তার নাম অসীম ভট্টাচার্য দেবীর সন্ধান দিয়ে বলে যায়, 'গুণ্ডারা আহেরীটোলার ঘাটের সন্নিকটস্থ পাইস হোটেলে সন্ধ্যা ছয়টায় আজ দেবীকে খাওয়াতে আনবে।' খবর পাবামাত্র আমি দেবীর ছোট মামা সোমনাথকে ডেকে আনিয়ে সব জানিয়ে বলি, 'হৈ চৈ না করে দেবীকে ধরে Taxi করে নিয়ে আসবে। আর গুণ্ডারা হাঙ্গামা বাধাতে সাহস না পায় এমন ভাবে তৈরি হয়ে যাবে।' ২৬ দিনের দিন আমার উপদেশমতো সোমনাথ সদলবলে গিয়ে কৌশলে দেবীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। পুলিশের সাহায্য ফলপ্রদ না হলেও শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্রবাবুর বিপুল সহৃদয়তা আমার কাছে অশোধ্য ঋণ স্বরূপ। তিনি ছিলেন যথার্থই মহাপ্রাণ ব্যক্তি—আমার প্রতিব্যবহারে নানা প্রকারে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। ঐ সময় তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রয়োজন বোধে 'Government House'-এ আমাকে সময় সময় আহ্বান করতেন। আর আমিও তাঁর অনেক চিকিৎসা করেছি। তিনি আমার 'প্রবুদ্ধ ভারতসন্তান' প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভাপতিও হয়েছিলেন গোড়া থেকেই। দিল্লীতে থাকাকালীন ও কলিকাতায় রাজ্যপাল রূপে তিনি এই ব্যাপারে আগ্রহ উদ্দীপনা দেখিয়েছেন—উদারচিত্তে সহযোগিতা ও সহায়তাও করেছেন। আন্তরিক প্রীতির দৃঢ় বন্ধনে তিনি আমাকে বেঁধেছিলেন—তাঁকে আমি নিজ আত্মীয়ের মতোই মনে করতাম।

আমি তাঁর দুঃখে সুখে আপন অন্তরে দুঃখ সুখ অনুভব করতাম। এই মিতাচারী নির্বিলাস বাহ্যাড়ম্বরহীন দানশীল সদাশয় পুরুষ আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি ছোট ছেলের মতো অকপট সারল্যে ও উৎফুল্ল মেজাজে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। আমাদের বাড়িতে এসে আমোদ আহ্লাদের সঙ্গে ভাজাভুজি তৈরি করিয়ে খেতেন। শ্রীমতী বঙ্গবালাও সঙ্গে থাকতেন। তাতে আমাদের খুব আনন্দ হত।

আমার প্রতি অটল বিশ্বাস বশতঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দরিদ্র আত্মীয়স্বজন বা প্রিয়পাত্রের রোগ হলে নিজে খরচ দিতে প্রস্তুত হয়ে তাদের চিকিৎসা করবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানাতেন। এতে তাঁর সুকোমল প্রাণের পরিচয় পাওয়া যেত। আমি তাঁর শ্যালক মিস্টার মুখার্জীকে চিকিৎসা করি যখন তাঁর পেটের ভিতর Tumour হয়েছিল মাঝারি আকারের বেলের মতো। তাঁর বাড়ি ছিল বেহালার খ্রীষ্টান পল্লীতে। আমার ঔষধ খাওয়ার পর ১৫।১৬ দিনের মধ্যে টিউমারটি হ্রাস পেয়ে আকৃতিতে সুপারির মতো ছোট হয়েছিল। পক্ষকালান্তে মিস্টার মুখার্জীকে পরীক্ষা করে দেখে আবার একই ঔষধ দেই। আমার দ্বিতীয় বারের ঔষধ খাওয়া মাত্র তাঁর দীর্ঘকালের চাপা পোষা ম্যালেরিয়া জ্বর প্রচণ্ড দাপটে পুনরায় প্রকাশ পায়। তাঁর স্ত্রী ছিলেন শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মাড়োয়ারী হাসপাতালের বিখ্যাত Gynoecologist শ্রীমতী বি, মুখার্জী এম, বি। স্বামীকে ম্যালেরিয়াব প্রকোপে অতিশয় কাতর দেখে তিনি রাত্রি গভীর থাকাতে আমার কোনোরূপ পরামর্শ না নিয়ে একটি কুইনাইন ইনজেক্সন দিয়ে দেন। এই ইনজেক্সনের হয় মারাত্মক পরিণাম—এটাই হয় মিস্টার মুখার্জীর কাল। হঠকারিতার সঙ্গে শ্রীমতী মুখার্জী এই Injection দিয়েই প্রচণ্ড ভুল করলেন। তিনি যদি নিজের বিদ্যা ফলাতে নিরস্ত থাকতেন এবং আমার নির্দেশ মতো চিকিৎসা চালিয়ে যেতেন, তবে নিশ্চয়ই Mr. Mukerjee অকালে প্রাণ হারাতেন না। এই ছোট অথচ মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করে আমি একথাই বোঝাতে চাইছি যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সামান্য নয়—এটাকে নিয়ে ছেলেখেলা চলে না। এই ঔষধ প্রকৃষ্ট ব্যবহারে যেমন সুহৃদের কাজ করে, তেমনি অবিবেচকের হাতে অপপ্রয়োগে এ আবার দারুণ শত্রু হয়ে উঠে।

আসল কথা, হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন সোনার মানুষ,—রাজ্যপাল হিসাবেও তিনি প্রশংসনীয় নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়ে সকলের শ্রদ্ধা ও

প্রশংসালাভ করেছিলেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ব্যারাকপুরের বাড়িতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বিয়োগ বেদনা আমার কাছে মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল।

হোমিওপ্যাথির প্রসার এযুগে খুবই কাম্য

আমি প্রথমে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক হয়েছিলাম। পুরাতন L. M. S ডাক্তারী ডিগ্রী পেয়েছি। তার কিছু আগে হোমিওপ্যাথিক M. D ডিগ্রী অর্জন করেছিলাম। কাজেই এই উভয়বিধ শাস্ত্রে আমার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। আমি কেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে বেশি পছন্দ করি এবং কেনই বা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করলাম সে বিষয় এখানে দু-চারটি কথা বলতে চাই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় হাত দিয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, এ চিকিৎসা অ্যালোপাথিক চিকিৎসা থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট। এ কথা স্বীকার্য যে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা একিউট Acute রোগে আশু প্রয়োজন মেটাতে খুবই সহায়ক, কিন্তু সাময়িক ভাবে রোগ সারলেও স্থায়ীভাবে রোগ নির্মূল করা এর সাধ্য নয়। অ্যালোপাথিক চিকিৎসায় রোগী সুস্থ হয়ে উঠার পর আবার ঐ রোগেই আক্রান্ত হয়েছে—এটা দেখা গেছে। ক্রনিক রোগে এর কার্যকারিতা খুবই কম, নাই বল্লেও চলে। আর আমি এমনও দেখেছি যে একিউট (Acute) রোগেও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ চমৎকার ফল দেয়, অ্যালোপ্যাথিকের চেয়ে অনেক বেশি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার একটি মস্তবড় গুণ এই যে, এ নিঃশেষে রোগ নাশ করে ঐ রোগের আর পুনরাগম হয় না। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ইংরেজ আমলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রাজা, জমিদার, পণ্ডিত, মূর্খ, চাষিভুষি, সকলেই এই চিকিৎসার পক্ষপাতী। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষার ব্যপক ব্যবস্থা এদেশে আছে। বহু প্রতিভাবান সুদক্ষ ঔষধ প্রয়োগকারী চিকিৎসক ও শল্য চিকিৎসক অ্যালোপ্যাথিক ক্ষেত্রে আছেন এ সমস্ত স্বীকার্য কিন্তু আমার বিশ্বাস হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দেশের জনসাধারণের যে কল্যাণ হতে পারে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় তার অনেক কম হতে বাধ্য। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আমরা কেবল (Symptoms) লক্ষণ দেখে করে থাকি। এটা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই চিকিৎসার

ক্ষেত্রে আমরা প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানের 'বিষস্য বিষম্ওষধম্' এই নীতি নূতন প্রণালীতে কালোপযোগী করে ব্যবহার করি। অ্যালোপ্যাথিকের মতো আমাদের রোগনির্ণয়ের নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতী নেই। আমরা কোনো নির্দিষ্ট রোগের নাম করি না বটে কিন্তু রোগলক্ষণ দেখে আমরা যে রোগীর চিকিৎসা করি তা অব্যর্থ হয়। তাই এ কথা বলতে পারিনা যে, আমাদের রোগলক্ষণ দেখে নির্ণয় পুরোপুরি অ্যালোপ্যাথিক ধরণের ডায়েগোনসিস না হলেও এটা কোন অংশে নিকৃষ্ট। এও দেখেছি যে, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগনির্ণয়ে মাত্রাতিরিক্ত কাল বিলম্বের জন্য এবং ভ্রান্তির ফলে দারুণ চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটেছে। রোগীর পথ্য, গতিবিধি এবং চাল চলনের দিকে আমরা বিশেষ নজর দিয়ে থাকি মানসিক অবস্থা বা মনের দিকটা বাদ দিয়ে এ চিকিৎসা একেবারেই চলতে পারে না। পথ্যের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। এই কারণে যে, রোগলক্ষণগুলিকে ঝাপসা করে দেয় এমন খাদ্য ও পানীয় এছাড়া পেন্ট এবং মালিস চিকিৎসার বিঘ্নকর। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পদ্ধতি স্নিগ্ধ এবং সব রকম উগ্রতা বর্জিত; এতে ভয় বা আতঙ্কের কিছু নাই। আজকের দিনে আমাদের এই দরিদ্রদেশে সুলভ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বহুল প্রচার খুব কাম্য, এর ফলে দীনদরিদ্র অসহায়ের যথেষ্ট উপকার হতে পারে।

১৯৭৬ সাল নাগাদ আমি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, তাঁরা যেন 'টনিক জাতীয় পথ্যে' অকারণ আসক্তি ধরিয়ে দিয়ে রোগীর অনিষ্ট সাধন না করেন নিজের স্বার্থবুদ্ধি বশতঃ। আর একটা জিনিষ আমার নজরে পড়েছে যে, হোমিওপ্যাথিক ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যাপক ব্যাবস্থা নেই। বিনা লাইসেন্সে আরও কিছুকাল আগে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা চলতো এই কারণে বহু কোয়াক হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। এর কুফল কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। সরকারের দৃষ্টি এদিকে সম্যক আকৃষ্ট হলে দেশের মঙ্গল। এই জন্য সরকারী সাহায্যে ব্যাপক হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিশেষ প্রচার আমি আকাঙ্ক্ষা করি—এটা যুগোপযোগিও বটে এবং সাধারণের পক্ষে মঙ্গলকরও বটে। সুস্থদেহ ও সুস্থমন কে না চায়?

শ্রদ্ধেয় বারিদবরণবাবুও আমি বহুক্ষেত্রে এটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুপ্রযুক্ত হলে যেমন মৃতসঞ্জীবনীর মতো কাজ

করে, তেমনই এর অপপ্রয়োগে এবং রোগীগণ কর্তৃক অসাবধানতা বশতঃ এর অনিয়মিত ব্যবহারে কী বিষম ফল ফলে। সংযম এবং ধৈর্য অবলম্বন করে রোগীকে উপযুক্ত অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নির্দেশ ও উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়, তবেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ফলপ্রসূ হয় ও রোগনিরাময় করে। অনেকে গায়ের জোরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-মিশ্রিত কয়েকটি দানা বা জলেঢালা এক আধ ফোঁটা অতি সূক্ষ্ম মাত্রা দেখে হোমিওপ্যাথিক ঔষধকে তাচ্ছিল্য করেন, এটা মূর্খতা। আমি বহু ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে পারি যে, সামান্য এক আধ ফোঁটা হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বা দু-চারটি দানা ঔষধ চক্ষের নিমেষে আশ্চর্য ফল দেয়।

গার্হস্থ্যধর্ম

কিছুকাল দাম্পত্যজীবন যাপন করার পর বোধহল যে, আমি ভুল করিনি। বিবাহের পূর্বে আমি ভয় পেয়েছিলাম এই চিন্তা করে যে, পত্নী সংসার ঈপ্সীত সমাজসেবার আদর্শের বিঘ্ন স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এ ভুল কিছুদিনের মধ্যেই ভেঙে গেল। বিবাহের পর স্ত্রীকে বলে-ছিলাম এই কথা—'আমাদের মা নাই, তোমাকে তাঁর আসন গ্রহণ করতে হবে। বৃদ্ধ রুগ্ন পিতা চলচ্ছক্তিহীন হয়ে রয়েছেন, তুমি যথাসাধ্য তাঁর সেবাযত্ন করবে। ভাইবোনেরা সকলেই তোমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও সম্মানে ছোট; তুমি তাদের এমন সস্নেহ ও সহনশীল ব্যবহার করবে যাতে তারা না মনে করতে পারে যে, মাতৃহীন বলে তারা অনাদৃত অবহেলিত।' গর্বের সঙ্গে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে যে, তিনি অক্ষরে অক্ষরে সর্বদা আমার উপদেশ পালন করেছেন। তাঁর সহনশীলতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তিনি আমার সেবাব্রতের আদর্শ কখনও অবহেলা করেন নি এবং আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে প্রকৃত সহধর্মিনী বললে বাগাড়ম্বর হয় না। আমাদের সাংসারিক জীবনে বহু দুর্দিন, বহু দুঃখকষ্ট এসেছে কিন্তু তিনি ধৈর্যের সঙ্গে সকল দুর্ভোগ দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন। ক্ষোভে অভিমানে ক্ষিপ্তা হয়ে উঠে কখনও কটুবাক্য প্রয়োগ করেন নি। তাঁর সেবাযত্নে ও সুবিবেচনার ফলে আমি সংসারী-বিষয়ী হয়েও নির্লিপ্ত থাকতে সক্ষম হয়েছি। আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস না নিলেও সন্ন্যাসের মূল উদ্দেশ্য আমার জীবনে সফল হয়েছে। এ বড়

সামান্য কথা নয়। এছাড়া সাংসারিক ছোট বড় খুঁটিনাটি বিষয়েও 'আমাকে মাথা ঘামাতে দেননি। এমনকি টাকাকড়ি বিষয়ে এবং বিবাহাদির মত বৃহৎ কাজেও তিনি আমাকে নির্লিপ্ত রেখেছেন—খরচপত্রাদি থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যাপারই তিনি নিজের হাতেই সম্পন্ন করে, ছেলে মেয়েদের তিনি সাধ্যমত নিজেই মানুষ করেছেন। যেটুকু আমি ছাড়া হতে পারত না সেইটুকুই আমাকে করতে হয়েছে। এককথায় এ পর্যন্ত সবরকম সাংসারিক ঝামেলা পোহান থেকে আমাকে রেহাই দিয়ে এসেছেন, অধিকন্তু সকল কাজের মধ্যে আমার ভাল-মন্দ ও সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখায় অবহেলাও কখনও করেন নি। এমন-কি বৃদ্ধ বয়সে রোগে শোকতাপে জর্জরিত হয়ে পড়েছেন, তথাপি তাঁর লক্ষ্য আমাদের পরিতৃপ্ত করা। আমি এসবের প্রতিদানে তাঁর মনোমত কিছুই করতে পারি নি, এজন্য আমার মনে গভীর ক্ষোভও রয়েছে।

পুত্রকন্যার কথা

এখন আমার নিজের সংসারের কথায় চলে আসি। বাংলা ১৩৪৪ সালের ভাদ্রমাস অমাবস্যায় আমার বড় ছেলে দেবীপ্রসন্নর জন্ম হয়—সেদিনটি ছিল শনিবার। তিথি লগ্ন কিছুই তার অনুকূল ছিল না। সকালে আমি কাজে বার হয়ে গিয়েছিলাম। দুপুরবেলা সংবাদ পেয়ে খুশিমনে নবজাত সন্তানকে দেখতে হরিপাল লেনে শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা হই, —কিন্তু বন্ধু হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যে সরাসরি বাগবাজার স্ট্রীটে তাঁর আত্মীয় এক জ্যোতিষীর কাছে চলে যাই। প্রাজ্ঞ জ্যোতিষী-মহাশয় আমাকে উল্লসিত দেখে বলে উঠেন, 'আপনি আনন্দ করছেন কিসের জন্য? এ-ছেলে আপনার দুঃখের কারণ হবে নিশ্চিত। সাত বছর বয়সে তার ফাঁড়া ও জীবন সংশয় আছে; তারপর এটা এড়িয়ে বাঁচলেও ১৪ বৎসর, ২১ বৎসর ও ২৮ বৎসর বয়সে যথাক্রমে সাত বৎসরের ব্যবধানে তাঁর ফাঁড়া ও মৃত্যুযোগ আছে,—এ-ছেলে ২৮ বৎসরের বেশী আয়ু পেতে পারে না'। তাঁর কথা শুনে আমি বিমর্ষ হয়ে পড়ি। ছেলের শুভ কামনায় জ্যোতিষীর উপদেশমতো প্রথম ছয়মাস কাল ছেলেটির মুখ দেখেনি। তারপর বিশেষ বিবেচনা করে ছেলের মঙ্গল হবে ভেবে পরমারাধ্যা গুরু শ্রীশ্রীসারদামায়ের পায়ে তাকে নিবেদন করে দেই।

যাহোক, আমি যথাসাধ্য স্নেহ ও যত্নে অথচ নির্লিপ্তভাবে পরের দ্রব্য বোধে দেবীকে মানুষ করতে থাকি। তার লালনপালনে আমার আগ্রহ ও আন্তরিকতার অন্ত ছিল না। তার শিক্ষার ব্যাপারে আমি মুক্ত হস্তে বহু অর্থ ব্যয় করেছি। প্রায় ১৩ বৎসর বয়সে **Matriculation** পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় এবং ১৫ বৎসর পূর্ণ হতে না হতে সে **I.Sc.** পরীক্ষা পাশ করে, আর এবারও প্রথম বিভাগে স্থান পায়। **I.Sc.** পাশ করার পর প্রায় ১৯৫১ কিংবা ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের (Central Govt. Defence Department) অধীনে বড় পদের জন্য সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসে ছিল; এই পরীক্ষা বম্বেতে অম্বরনাথে হয়েছিল। বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণও হয়েছিল এবং কাজে যোগ দেবার জন্য সরকারের আহ্বান এসেছিল। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি সর্বদাই আমার বড়রকমের পক্ষপাত ও ঝোঁক, কাজেই দেবীকে চাকুরি নিতে বারণ করি। বহু অর্থব্যয়ের ঝুঁকি নিয়ে আমি তাকে N. R. Sarkar Medical College-এ চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার জন্য ভর্তি করে দেই। উৎসাহের সঙ্গে সে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে।

এম. বি. বি. এস (M.B.B.S.) পরীক্ষার মাসচারেক পূর্বে ঐ কলেজের সমপাঠীদের সঙ্গে এন. সি. সি. (N.C.C) দলের সভ্য হিসাবে আগ্রায় বেড়াতে যায়। এদের মধ্যে তিনজন ডাক্তারও ছিলেন। সেবার আগ্রায় এই দলের ১২০ জনের জন্য camp পড়ে। সেখানে দেবী নিদারুণ Typhoid রোগে আক্রান্ত হয়। আগ্রার Medical College-এর Medicine-এর Professor-এর চিকিৎসাধীনে কিছুটা সুস্থ হ'লে আমার ভাই রামজীবন ভট্টাচার্য তার নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে সপ্তাহখানেক কাছে রেখে চিকিৎসকের উপদেশ মতো সেবাযত্ন করে। চিকিৎসক অনুমতি দিলে সে দেবীকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে মনে করে কলিকাতায় পাঠিয়ে দেয়। কলিকাতায় ফিরে এসে দৈবের দুর্বিপাকে দেবী পুনরায় Typhoid-এ পীড়িত ও শয্যাশায়ী হয়। আমি তার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করি এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে। তারপর ইংরাজী ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে M.B.B.S. Final পরীক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্নে পড়াশুনায় মনোযোগী হয়। রাত্রি জাগার আগ্রহে সে তখন ঘুম না হওয়ার উগ্র ট্যাবলেট আমাকে লুকিয়ে খেতে থাকে। এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য পরিণামে তার মেণ্টাল ডিরেঞ্জমেণ্ট (Mental derangement) হয়।

Theoretical পরীক্ষার তৃতীয় দিনে তার পাগলামি সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। কাজেই ঐবার তার পরীক্ষা দেওয়া হল না। সে চার বৎসর সাড়ে-চার বৎসর কাল উন্মাদ রোগে ও Nervous disorder-এ ভুগে তারপর অনেকটা রোগ মুক্ত হয়ে ইং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে M.B.B.S পরীক্ষা দেয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে N.R.S. Medical College-এ Interneeship period-এর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য শেষ করে। সে ঐ সময় Dengue জ্বরে ভুগতে থাকে। দেশময় তখন সাধারণ ধর্মঘট চলছে। তাতে তার ঔষধ এবং পথ্য দুয়েরই অভাব বেশী হয়। তার উপর তাকে সাধ্যাতীত পরিশ্রমও করতে হয়েছে। এই ভাবে বহুদিন শরীরে জ্বর নিয়ে হাসপাতালের কাজ করার জন্য সে অত্যন্ত দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার Liver এবং Heart খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এই কালে আমি একদিন কোন জরুরী কারণে বাড়ি থেকে বাইরে গিয়েছি কিন্তু এসে শুনি যে, High fever-এ অত্যন্ত ছট্‌ফট্‌ করছে। আর কেবলই 'বাবা কোথায় ? বাবা কোথায় ?' বলে আমার খোঁজ করেছে। এই কথা শোনা মাত্র আমি জামা কাপড় না ছেড়ে আগে উপর তলায় উঠে দেবীর ঘরে ঢুকি। আমাকে দেখেই আমার ৪র্থ কন্যা বীরা ধড়ে প্রাণ পেয়ে বলে উঠে 'বাবা এসেছ! দেখ দাদা কেমন করছে!" তাড়াতাড়ি গিয়ে আমি দেবীর নাড়ির অবস্থা লক্ষ্য করার জন্য কব্জির কাছে হাত লাগাই আর সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ-সড়াৎ করে তার পূর্ণ-বেগ নাড়ি চিরতরে নেমে চলে গেল, বুঝলাম যে Heart fail করল। এইভাবে দেবী হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রাণ ত্যাগ করে। তার মৃত্যুর পর University certificateখানা আমার হাতে আসে। দেবী গৌরবের সংগে M.B.B.S পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

দেবী খুব মাতৃভক্ত ছিল—মাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। আমাকেও কম ভালবাসত না। দায়িত্ববোধ প্রবল থাকায়, তাকে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যেত। খুব ছোট বয়স থেকে তার মাঝে এই গুণ প্রস্ফুটিত হতে থাকে। দেবীর কাব্যসাহিত্যের দিকে প্রবণতা ছিল। তার লেখার হাতও ভালই ছিল। N. R. Sarkar Medical College ছাত্রদের সম্পাদিত Magazine-এ তার রচিত অনেকগুলি গল্প, কবিতা, কথিকা বাহির হয়েছিল। অপ্রকাশিত বহু রচনা বাড়িতে এখনও পড়ে রয়েছে। বলা বাহুল্য সকল পিতাই পুত্রশোকে মর্মবেদনা অনুভব করেন। আমি দেবীকে হারিয়ে শোকে অভিভূত হয়ে ছিলাম। তবে গুরুই ভরসা! পরম শ্রদ্ধেয়া মাতাঠাকুরাণীর মহামূল্য উপদেশ স্মরণ করে সান্ত্বনা পেয়েছিলাম।

সংক্ষেপে আমার অন্যান্য পুত্রকন্যার বিষয় বলছি; বলে বিবরণ শেষ করছি। বর্তমানে আমার পাঁচ কন্যা ও দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা মায়া, মেজ মেয়ে রমা, সেজ মেয়ে পূর্ণা, চতুর্থ কন্যা বীরা আর সর্বকনিষ্ঠা চন্দ্রাবতী। বয়সের হিসাবে পূর্ণার পর শিবা ও শুভা; আর দুই ভায়ের পর বীরা ও চন্দ্রা। পাঁচ কন্যাকে যথাসাধ্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়ে যোগ্য পাত্রেই বিবাহ দিয়েছি। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা অনাবশ্যক। সত্য কথা বলা ভালো যুগ ধর্মের প্রতিকূল হলেও আমরা আর্য ব্রাহ্মণ, সনাতন ব্রাহ্মণ ধর্মের ভাব আমাদের মজ্জাগত। বিলাস-মত্ত আধুনিকতা বা সাহেবিয়ানার চঞ্চল স্রোতে গা-ভাসানো আমাদের স্বভাব নয়। সনাতন ধর্মাদর্শ অম্লান রাখাই আমরা পুণ্যের কাজ ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করি। সুতরাং আর্য ধর্মানুমোদিত গৃহশ্রী কল্যাণীর আদর্শেই আমি আমার পাঁচ মেয়েকেই মানুষ করেছি। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সামান্য হলেও ধর্মগত ও নৈতিক শিক্ষা তারা যথেষ্ট পেয়েছে। তাদের চরিত্রে দৃঢ়তা, আত্মমর্যাদা, সেবাপরায়ণতা ও ত্যাগের উদ্দীপনা প্রভৃতি মহৎগুণ উজ্জ্বল রূপে পরিস্ফুট হয়েছে। তারা সকলের শ্রদ্ধা ও প্রসংশা অর্জন করেছে। সেজমেয়ে পূর্ণার পড়ার খুব ঝোঁক। আমার চতুর্থ মেয়ে বীরার সাহিত্যে বেশ রুচি আছে। কৈশোরে বাংলা গল্প কবিতা ইত্যাদি লেখার হাত তার ভালোই খুলেছিল। স্কুলে পড়ার সময় সে অবসর মতো ঘরে বসে সুন্দর সুন্দর অনেক গল্প ও কয়েক শত কবিতা রচনা করেছে। নিকট সম্পর্কের ভাই-বোনদের বিবাহ উপলক্ষে স্বরচিত কবিতাও প্রীতি উপহার দিয়েছে। পিতৃহৃদয় এতে আনন্দে ভরে উঠে। মেয়েদের বিষয়ে আমি সত্য-সত্যই সুখী। সন্তানদের মধ্যে চতুর্থ কন্যা বীরা জন্মায় আশ্বিন মাসে মহাষ্টমীর দিন, আর সর্বকনিষ্ঠা চন্দ্রা রাসপূর্ণিমার দিন ভূমিষ্ঠ হয়। এরা দুজনেই হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় বসার অনুমতিপত্র পাবার কয়েক দিন পরেই এদের বিবাহ হয়ে যায়—সেজন্য এদের পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। আমার তৃতীয় কন্যা পূর্ণারও অনুরূপ কারণে পরীক্ষায় বসতে না পারায় তারও স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। বীরা উদ্যম হারায় নি। লখনৌয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বেসরকারী ভাবে মাধ্যমিক ও ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে, বি. এ পরীক্ষায় ডিস্টিংসন্ পেয়েছে। পড়াশুনায় তার আগ্রহ ও উদ্যম সত্যই প্রসংশনীয়। এটা মোটেই পিতৃস্নেহের অতিভাষণ নয়। আর চন্দ্রা জামসেদপুরে পড়াশুনা চালানর অসুবিধা দেখে সুচীশিল্পে ডিপ্লোমা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। পূর্ণা ছেলের অসুখের

জন্য পড়াশুনায় আর অগ্রসর হতে পারে নি। তবে সে নৈহাটি সঙ্গীত বিদ্যালয় থেকে গিটার বাজনায় রবীন্দ্রভারতীর ডিপ্লোমা পেয়েছে।

শিবাপ্রসন্ন

বলতে গেলে, শিবাপ্রসন্ন এখন আমার বড়ছেলে। বাংলা ১৩৫১ সালে ১১ই কার্তিক রবিবার সে ভূমিষ্ঠ হয়। ১৪ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে সে R. G. Kar Medical College থেকে ভাল-ভাবেই I.Sc. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়। তারপর Physiology Honours নিয়ে B. Sc. পরীক্ষা দিয়ে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাশ করে। দেবীর মতো তাকেও আমি চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার জন্য N. R. Sarkar Medical College-এ ভর্তি করে দেই। আমার মনে ছিল সেবাব্রতের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য। Medical Student হিসাবে শিক্ষক ও সহপাঠী মহলে সে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সে সগৌরবে সসম্মানে M.B.B.S পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়। পাশ করার পর N. R. Sarkar Medical College Hospital-এর Neurological Dept.-এ House Surgeon-এর পদে নিযুক্ত হয়ে তিন বৎসর কাল কাজ করে। কলিকাতায় রাজনৈতিক নকশালপন্থী গণ্ডগোল থাকার দরুণ M. D. Course পড়ার অসুবিধা ঘটে। সুতরাং শিবা ঐ উদ্দেশ্যে দিল্লী চলে যায়। সেখানে গিয়ে All India Institute of Medical Science-এ জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার আনন্দের তত্ত্বাবধানে সে M. D. Course অধ্যয়ন করে এবং প্রথম সুযোগে দু বছর সময়ের মধ্যেই সাফল্য লাভ করে M.D. Degree-তে ভূষিত হয়। M.D. পড়তে পড়তে ঐ Institute-এ Demonstrator-এর পদে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। Scholarship ছেড়ে দিয়ে তখন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে শিবাপ্রসন্ন দুই বৎসর কাল All India Institute of Medical Science -এ কাজ করেছিল। দিল্লির All India Institute'-এ Demonstrator-এর পদ থেকে ছাড়া পাওয়ার পূর্ব থেকেই শিবা বিদেশে—আমেরিকায় গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে P.H.D. Degree লাভের জন্য আগ্রহশীল ও সচেষ্ট হয়েছিল। আমারও তাকে বিদেশে পাঠাতে অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাকে বিবাহ না দিয়ে পাশ্চাত্য প্রবাসী করতে আমার মন সায় দিল না। আগেই মেয়ে দেখে রাখা হয়েছিল। সুতরাং বিদেশ যাবার পূর্বেই তার বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হয়। বিবাহের পরেও শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সব বন্দোবস্ত করে বিদেশে যাত্রার জন্য

প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বার্ধক্যে আমার হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে বিদেশ যাত্রা বন্ধ রাখে। এর বদলে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী দূর প্রাচ্যের সিঙ্গাপুর বিশ্ববিত্যালয়ের Faculty of Medicine প্রতিষ্ঠানে Physiology-র অধ্যাপকের পদ লাভ করে চলে যায়।

বৌমা আমাদের ভাটপাড়া গ্রামের মেয়ে। তার পিতা হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় বিহারে জেলাশাসক (District Magistrate) ছিলেন। আমার বৌমা পিতামাতার একমাত্র মেয়ে। তাঁদের ছেলেও একটিমাত্র। কাজেই ছেলেমেয়ে ছুটিকে মানুষ করার জন্য মাতাপিতা বিশেষ উৎসাহী ও যত্নবান ছিলেন। B. Sc. পাশ করার পর স্নেহের কন্যাকে রাঁচি রাজেন্দ্র মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দেন। বিবাহের সময় Third year-এর পড়া শেষ করে Fourth year-এ তার উত্তীর্ণ হবার সময় হয়ে এসে-ছিল। বিবাহের পর তিনি Fourth year class-এ উঠেছিলেন। আমি যতদূর শুনেছি চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর খুবই অনুরাগ ছিল এবং পড়াশুনাতে আগ্রহ উত্যমও কম ছিল না। শ্রীমান শিবাপ্রসন্ন চাকুরি নিয়ে সিঙ্গাপুর চলে যাবার পরও বৌমা রাঁচীতে তাঁর পিতামাতার কাছে থেকে রাঁচী মেডিকেল কলেজে পড়ছিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ, দেশের পরিস্থিতি ক্রমশঃ বেশী সংকটজনক হয়ে পড়ে; তাই চিকিৎসাশাস্ত্র পড়া তাঁর পক্ষে সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ল। যতই দিন যেতে লাগল রাজনৈতিক গণ্ডগোল ততই ঘোরাল হয়ে উঠল। স্থানে স্থানে বিভিন্নদলের মধ্যে খুনখারাপি চরম আকার ধারণ করেছিল।

উগ্রপন্থীদের নাশকতামূলক কার্যকলাপে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তেরা ভাঙাচুরার কাজে ও লুটতরাজে উন্মত্ত হয়ে উঠে-ছিল। তারা খাত্ত সামগ্রীরও অঢেল ক্ষতি করছিল। এই অরাজকতা নিবারণ কল্পে শাসকগোষ্ঠীর অবলম্বিত দমননীতির জন্য দেশের প্রবীণ রাজনীতিবিদদের মনে গভীর অসন্তোষ জন্মে ছিল। সেই সময় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা দেশবাসীর দারুণ উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটির পর একটি পত্র লিখেও এই অশুভ সময়ে আমার বড়ছেলে ও বৌমা কেউই কারো কাছ থেকে কোন উত্তর পাচ্ছিলেন না। তখন বৌমা হতাশায় ভেঙে পড়ে পড়াশুনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। মেডিকেল কলেজের লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে সিঙ্গাপুরে যাবার জন্য উন্মুখ অস্থির হয়ে উঠেন। কোনো এক বিশেষ কাজে রাঁচী গিয়ে তাঁর অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে পড়ি, আর তাঁকে সিঙ্গাপুরে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসি।

পরিশেষে শ্রীমান শিবাপ্রসন্ন এখানকার সঠিক অবস্থা অবগত হবার জন্য একপক্ষ কালের ছুটি নিয়ে তাড়াহুড়া করে সিঙ্গাপুর থেকে কলিকাতায় চলে আসে। নভেম্বর মাসে যখন শিবা ও নন্দিতার মধ্যে পুনরায় সাক্ষাৎ হয় তখনো দুজনই পত্র বিনিময়ের ব্যর্থতার জন্য পরস্পরেব প্রতি অপ্রসন্ন ও মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। যেদিন ডাক-পিওন তাঁদের পরস্পরকে লিখিত পত্রগুলি বিলি না হওয়ায় ফিরিয়ে দিতে এসে জানাল যে, সারা অক্টোবর মাস ধর্মঘট চলেছে, তখন উভয়েই আসল ব্যাপাবটা বুঝে নিয়ে শান্ত হলেন। কিন্তু বৌমা কিছুতেই এখানে থেকে পড়াশুনা চালাতে রাজী হলেন না। কাজেই বাধ্য হয়ে শিবাপ্রসন্ন বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গাপুবে চলে গেল। ১৯৭৫ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে মেডিকেল কলেজে বৌমার 4th year class-এর বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হবে, কিন্তু তিনি এর দুইদিন আগেই ১০ তারিখে বিদেশে চলে গেলেন। সুতরাং তাঁর আর পরীক্ষায় বসা হল না। পরে সিঙ্গাপুর মেডিকেল কলেজে বৌমাকে ভর্তি করে দিতে শ্রীমান শিবা চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুব-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন এবং ঐখানকার মেডিকেল কলেজের পাঠক্রম ভিন্ন প্রকার হওয়ায় তার সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি।

শিবার বিবাহের কথা একরকম পাকাপাকি হলে আমি একদিন যোটকবিচারের জন্য সূর্য সেন ষ্ট্রীটের একজন নামকরা জ্যোতিষীকে পাত্র-পাত্রীর ছক দেখাই। বিচার কবে দেখে জ্যোতিষীমশাই বলেন—'এ বিবাহে বরকনের মিল সুন্দর হবাব যোগই রয়েছে তাদের দাম্পত্যজীবন সুখের হবে। কিন্তু দুজনেরই রাহুর অবস্থান একই ভাবের হওয়ায় আপনাদের দিক দিয়ে দেখলে এর ফল কিছুটা দুঃখজনক হবে। এদের ভক্তি শ্রদ্ধা আপনাদের উপর অটুট থাকা সত্ত্বেও এরা উভয়ে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াতে আগ্রহী ও উৎসুক হবে।' সন্তানের পরিপূর্ণ মঙ্গলই পিতা-মাতার একান্ত কাম্য, নিজের স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করা নিশ্চয়ই গৌরবজনক। এই কথা ভেবে শ্রীমান শিবার এই বিবাহে আমি মত দেই। কল্যাণী বধূমাতা এইভাবে তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের এবং আমার ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে ডাক্তারী পড়া শেষ না-করে শিবার সঙ্গে চলে যাওয়ার ঘটনায় আমার মনে হল জ্যোতিষী যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের গণনার ফল ফলতে শুরু করেছে। মনে ব্যথা পেলেও একে আমল না দিয়ে ধর্মচিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেই।

শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ শিরোধার্য করে বেলুড় মঠ ছেড়ে যখন সংসারে ফিরে আসি তখন আমি আমার পরমারাধ্যাগুরু মাতাঠাকুরাণীর কাছে আশীর্বাদ নিয়েছিলাম চিকিৎসক হিসাবে মানুষের সেবার অধিকার চেয়ে। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার দিকে আমার মনের বড়রকম ঝোঁক। গ্রহবৈগুণ্যে জীবনের উপর দিয়ে দারুণ ঝড় চলে যাওয়ায় আমার সেবার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। তাই ভেবে ছিলাম বৌমা **M.B.B.S.** পাস করে হোমিওপ্যাথিক গ্রাজুয়েট হন। তাহলে, পরে তিনি আমার চেম্বারে বসে অ্যালোপ্যাথিক-হোমিওপ্যাথিক দুই শাস্ত্রে জ্ঞান থাকার দরুণ ভদ্রসমাজের সমাগত রোগীদের **children** ও **female diseases**-এর চিকিৎসা করতে পারবেন সেবাব্রত হিসাবে। আর শ্রীমান শিবা অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার হিসাবে রোগীদের চিকিৎসা করবে কিংবা কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যাপনা করবে আর অর্থোপার্জন করবে। আমি আমার মনের কথা শিবাকে বলেছিলাম। কিন্তু আমার এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল না। বৌমাকে সিঙ্গাপুরে সঙ্গে নিয়ে শিবাকে চলে যেতেই হল। এখন আমি নিজের মনকে প্রবোধ দেই এই ভেবে যে, এই ব্যর্থতার পশ্চাতে হয়তো মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কোন গূঢ় মঙ্গলেচ্ছা কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন-বদ্ধ জীব আমরা সর্বনিয়ন্তা পরম দয়াবান জগদীশ্বরেব অভিপ্রায় ধারণা করব কিরূপ ?

প্রায় ছয় বৎসর সিঙ্গাপুরের চিকিৎসা বিভাগের উচ্চপদেস্থিত হয়ে অধ্যাপনার কাজ করার পর আমার ও তার মায়ের বিশেষ পীড়াপীড়িতে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে শিবাপ্রসন্ন ১৯৮১ সালে কলিকাতায় চলে আসে। ঐসময় ঈশ্বরের কৃপায় বৌমার আবার অসম্পূর্ণ চিকিৎসাবিদ্যা অর্জনের আগ্রহ জাগে। শিবাও তাঁর ইচ্ছাপূরণে তৎপর হয়। ১৯৮১ সালে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে বৌমাকে নিয়ে শিবা রাচীতে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। ঐখানে রাজেন্দ্র মেমোরিয়াল কলেজে আবার তাঁকে **4th year class**-এ ভর্তি করে দেয়। বৌমার চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার ব্যাপারে বাধা পড়ায় আমার মনে পূর্বে যে ক্ষোভ ও বেদনার উৎপত্তি হয়েছিল, নূতন আশার আলোকে তা এখন অন্তর্হিত হয়েছে। বৌমাকে রাঁচীতে রেখে শিবা কালকাতায় ফিরে এসে সিঙ্গাপুর মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি থেকে আসা পুনর্নিয়োগের পত্রখানি পেয়ে সে পুরাতন কাজে যোগ দিতে সিঙ্গাপুর চলে যায়। আমরা তাতে আপত্তি জানাইনি এই ভেবে যে, যদি বৌমা এক

চান্সে পাশ করতে পারেন তাহলে তাঁর ইণ্টারনিশিপ শেষ করে কলিকাতায় ফিরে আসার সময়ে ১৯৮৩ সালে সেপ্টেম্বর নাগাদ শিবার চাকুরির মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে। ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে যে ফাইনাল এম.-বি.-বি.-এস পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষায় বসে বৌমা মঙ্গলময়ের অশেষ করুণায় সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর 'ইণ্টারনিশিপ' শ্রীমান শিবাপ্রসন্নর চাকুরির মেয়াদ শেষ হবার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে, সেই সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে। আশা রাখি মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় যখন অনুকূল বাতাস বইতে শুরু হয়েছে তখন শিবাও চাকুরির মায়া ত্যাগ করবে আর আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণে কলিকাতায় ফিরে এসে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আমার চেম্বারে বসবে।

সিঙ্গাপুর

শ্রীমান শিবপ্রসন্ন সিঙ্গাপুরে অবস্থানের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে আমি ও আমার স্ত্রী দু'জনে শিবার বিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকালে সিঙ্গাপুরে বেড়াতে যাই। কলিকাতার দমদম এয়ারপোর্টে আকাশ যানে আরোহণ করে ৭।৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছলাম। পথে ব্যাঙ্ককে ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করে আবার সিঙ্গাপুরগামী নূতন বিমানে উঠতে হয়েছিল। তবু যাত্রা মোটামুটি সুখেরই হয়েছিল। রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ আমরা শিবার বাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। রাত্রে সামান্য কিছু আহারান্তে সেদিনকার মতো শুয়ে পড়লাম। শিবা আদরযত্ন আপ্যায়ণে ও সেবায় কোনরূপ ত্রুটি করে নি। প্রাণপণে সে আমাদের খুশি করতে চেয়েছে। প্রায় দুই মাস কাল আমরা শিবার কাছে ছিলাম।

সিঙ্গাপুর একটি বিশাল সহর এবং বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র (Worldtrade Centre)। সিঙ্গাপুরে কোনরূপ ফসল উৎপন্ন করা হয় না। সেখানে আমি রাস্তার ধারে বনের ভিতর বহু ফলে-ভরা অজস্র কাঁঠাল গাছ দেখেছি। এঁচড় অবস্থায় ফলগুলি স্থানীয় লোকদের কাছে অরুচিকর বলে—অনাদরে এগুলি নষ্ট হচ্ছে বলে মনে হয়েছিল। তাছাড়া লোকেদের বাড়িতে বড় বড় ফলধরা পেঁপেগাছ কিছু কিছু দেখেছি এবং সরকারী ভবনের চারিধারে মেহেদি গাছের পরিবর্তে বহু রকমের রঙিন ফুলে ভরা জবাগাছের বেড়া দেখা যায়।

সিঙ্গাপুর ভারতমহাসাগর ও প্রশান্তমহাসাগরে ঘেরা মালয় উপদ্বীপের একেবারে শেষপ্রান্তে অবস্থিত মাঝারি আকারের একটি দ্বীপে অবস্থিত। এর পূর্বপাশে প্রশান্তমহাসাগর ও পশ্চিমপাশে ভারতমহাসাগর। সিঙ্গাপুর পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন, কেবল মালয় উপদ্বীপের সঙ্গে এর ভূমিভাগের যোগ রয়েছে সামান্য কয়েক ফার্লং প্রশস্ত সংযোজন ভূমির দ্বারা। সিংঙ্গাপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত সামুদ্রিক আবহাওয়া আমার খুবই ভাল লেগেছিল। তেমনই ভাল লেগেছিল দেশ-বিদেশের নানা জাতির সমাগমে ও মিলনে সমৃদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন পরিপাটি শহরটিকে। এর সুশৃঙ্খলা ও শিষ্ট ব্যবহারের রীতি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। সিঙ্গাপুর একটি আন্তর্জাতিক শহর বলেই বোধহয় উন্নত সুমার্জিত সভ্য জীবনের মান এখানে প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলেরই ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ও ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে। প্রায় চৌদ্দ-পনেরো হাজার ভারতবাসী নানা কার্যোপলক্ষে সিঙ্গাপুরে বাস করে। সিঙ্গাপুরে শিক্ষাদীক্ষারও বেশ উন্নত ব্যবস্থা আছে। সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও অনেকগুলি স্কুল কলেজ বর্তমান। কোন বিশেষ জাতির বাসভূমি নয় বলেই এই স্থানে আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে নানা বিদ্যাচর্চা হয়ে থাকে এবং শিক্ষাদান করা হয়।

সিঙ্গাপুর বন্দর আন্তর্জাতিক শাসনাধীন। আমি যতটুকু জানি কোন বিশেষ জাতি এই স্থানটির স্বত্বাধিকারী নয়। বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিগণের দ্বারা এর শাসন কার্য্য পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এর উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। সিঙ্গাপুর সত্যই একটি সুরম্য ও চিত্তাকর্ষক এবং প্রশংসনীয় আন্তর্জাতিক বন্দর। এখানকার দোকান বাজার বিশেষতঃ সুপার মার্কেটগুলি দেখার মত সুরম্য শোভাময়। এবং এর সুপরিচালনা দর্শককে ও ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে। সিঙ্গাপুরে বিপণন ব্যবস্থা আশ্চর্য রকম সুন্দর। বিভিন্ন জাতির লোকেরা এখানে আট-দশতলা উঁচু বিচিত্র আকারের হট্টশালা তৈরি করে নানারকম দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। দোকান বাড়িগুলির ভিতরে মোটরগাড়ি উপরে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বৃহৎ ঢালু পথ আছে, এই কারিগরী অদ্ভুত বটে। যে কোন তলায় ইচ্ছামত মোটর থামিয়ে রেখে জিনিস পত্র কেনা যায়। অবশ্য যে সকল ক্রেতা দোকান বাড়ির বাইরে গাড়ি রাখেন তাঁরা লিফ্‌টে উপরে যেতে পারেন। ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্য দোকান ঘরগুলির সব তলাতে নানান রকমের খেলনা ও রঙ্গীন দোলনা আছে। হট্টশালাগুলির

বাইরে বড় বড় প্রাঙ্গণ আছে। এই সকল প্রাঙ্গণে মাঝারি আকারের অগভীর কৃত্রিম জলাশয় আছে। ঐ জলাশয়গুলির তলা শ্বেতপাথরে বাঁধান এবং সমস্ত পাড় বিচিত্র রংয়ের সৌখীন ও চকচকে পাথর বসান। ঐ সকল জলাশয়ে নানান রংয়ের বিভিন্ন আকারের, দৃষ্টি আকর্ষণকারী মাছ পোষা হয়; আর জলের উপর রাজহাঁস, পাতিহাঁস সাঁতার কাটে ও খেলা করে।

সিঙ্গাপুরের বাসভবনগুলির চেহারা ও ধরণ এখন বদলে যাচ্ছে। আগেকার আমলের বাড়িগুলির সংলগ্নভূমিতে ছোটখাট ফুলের বাগান ও লেবু, করমচা, নারিকেল ইত্যাদি ধরনের প্রয়োজনীয় গাছপালা থাকত কিন্তু বর্তমানে রুচির আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে ব্যবসা-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কাজেই বাড়িগুলির সংলগ্ন বাগানগুলিকে উঠিয়ে দিয়ে মোটর গাড়ি পার্কিং এর জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পার্কিং এর জন্য গাড়ির মালিককে যথাবিহিত নির্দিষ্ট 'ফি' দিতে হয়। এখন যে সকল বাড়ি তৈরি হচ্ছে আগেকার বাড়ির চেয়ে সেগুলি অনেক বড় এবং অনেক উঁচু।

সিঙ্গাপুরের চারিধারের বেলাভূমিতে জাহাজ মেরামতের কারখানা আছে। বিদেশ থেকে আগত সামগ্রীবাহী জাহাজাদি ফিরে যাবার আগে এখানে প্রয়োজনীয় মেরামতাদি কাজ করিয়ে নেয়।

সিঙ্গাপুরের রাস্তা খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও বেশ চওড়া। গাড়ির চালক যদি গন্তব্য স্থান ছেড়ে কিছুদূর এগিয়ে যায় তখন তাকে গাড়ি ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পুনরায় ফিরে আসতে দেওয়া হয় না। পথের নিয়ম এইরূপ যে, গাড়ির চালককে আরও কিছুদূর ঐ পথে অগ্রসর হয়ে যেখানে যাতায়াতের পথের মাঝে ব্যবধান রক্ষার্থ উঁচু ফালি জমি আড়াআড়ি ভাবে কেটে গাড়ি ঘোরানোর পথ করা আছে সেই পথে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে হয়। তারপর বিপরীত মুখো গাড়ি চালিয়ে চালককে গন্তব্য স্থানে যেতে হয়।

পথচারীদের জন্য কিয়দ্দূর অন্তর অন্তর রাস্তা পার হবার ওভারব্রিজ রয়েছে। এই কারণে রাস্তায় কখনও ট্র্যাফিকজ্যাম হয় না। চলাফেরা গাড়ি চালনা সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে করা যায়, কোন রকম অসুবিধা হয় না। এ ছাড়াও গাড়িতে গাড়িতে ধাক্কা বা কোনরকম বিশৃঙ্খলায় আকস্মিক দুর্ঘটনা বা অপমৃত্যুর কথা শোনা যায় না বললেও চলে। সুসভ্য মানুষের এটিও একটা কৃতিত্ব।

সিঙ্গাপুর বন্দরে সর্বত্র মোটরগাড়ি দাঁড় করানোর বা পার্কিংয়ের সরকারি

সুব্যবস্থা আছে। এজন্য নির্দিষ্ট 'ফি' মোটরগাড়ির মালিকের কাছ থেকে আদায় করা হয়। ঐ 'ফি' থেকে সিঙ্গাপুর সরকারের বড়রকম আয় হয়।

সিঙ্গাপুরে বহু চিত্তাকর্ষক বস্তু আছে এর মধ্যে বার্ডস্কোয়ার একটি। একদিন আমরা সকলে মিলে বার্ডস্কোয়ার দেখতে যাই। সেখানে প্রবেশ করতেই কানে এল খুব বড় আকারের এক ময়না পাখীর সবাক সাদর অভ্যর্থনার সুর। গন্তব্যস্থানের পথের ধারে ছিল আর একটি বৃহৎ আকারের কাকাতুয়া। তার কথা শুনতে আমাদের কিছু সময় অপেক্ষা করতেই হল। তারপর আমরা সামুদ্রিক জীবজন্তু দেখতে যাদুঘরে গেলাম। এই যাদুঘরে আশ্চর্য একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। এখানে এক অভিনব পদ্ধতিতে অপূর্ব নৈপুণ্যে অসংখ্য প্রকার সামুদ্রিক জীবজন্তু— সমুদ্রের তলদেশবাসী ও সমুদ্রজলের উপরিস্তরে বিচরণশীল চমৎকার বৈচিত্রময় ছোট বড় নানা আকৃতির প্রাণী জীবন্ত অবস্থায় রক্ষিত হয়েছে। জীবন্ত প্রবালকীটের ছত্রাক, সমুদ্রের জলে সব সময় প্লাবিত একখানি চতুষ্কোণ কাঁচের ঘেরাও এর মধ্যে সজীব রাখা হয়েছে। দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। তিমি মাছ, শঙ্কর মাছ, কুমীর, হাঙ্গর প্রভৃতি সামুদ্রিক জীবকে যন্ত্র সাহায্যে সমুদ্রের জল সরবরাহ করে যেন স্বাভাবিক অবস্থায়ই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। অবশ্য মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি দিয়ে যত্নে পালন পোষণ করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমুদ্রের গভীর তলদেশ-জাত ক্ষুদ্রাকৃতি নানা রকম সামুদ্রিক গাছ ও বিবিধবর্ণের রকমারী মাছ কাঁচের ঘেরাও-এর মধ্যে প্রাণবন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় সুরক্ষিত। জীবন্ত অক্টোপাস হাত, পা ও সর্বাঙ্গ প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করেই চলেছে, এও দেখলাম। সন্নিহিত এই স্কোয়ারের পাহাড় ঘিরে একটি বিশাল চিড়িয়াখানা রয়েছে। এটি সাধারণ চিড়িয়াখানার মত নয়, এর বৈচিত্র আছে। ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত বিচিত্র ধরণের বনচর, স্থলচর, জলচর, উভচর ও অশেষ প্রকার সামুদ্রিক জীবজন্তু এবং দেশ বিদেশের মনোরম বর্ণ শোভাময় অসংখ্য পাখী দেখতে পাওয়া যায়। এখানে পাখীগুলিকে পৃথক ভাবে খাঁচায় পুরে রাখা হয় না। সংরক্ষণের এক অভিনব উপায় এখানে অবলম্বন করা হয়েছে। পাহাড়ের মাথার একটি অঞ্চল নিপুণভাবে সুন্দর কৌশলে জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ঐ পরিবেষ্টিত এলাকায় একরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে যেন জলচর, বৃক্ষবাসী, ভূচর পাখীগুলির বাসস্থান করে দেওয়া হয়েছে। ঐ সকল পাখীদের খাদ্য ও পানীয় যোগাতে হয় না। এক-

রকম স্বাধীন ভাবেই তারা উড়াউড়ি ও বিচরণ করে, নিজেদের বাসা বাঁধে এবং নিজেদের খাদ্যও সংগ্রহ করে নেয়। এখানকার অদ্ভুত আকৃতির বিরাট 'ইমু' পাখী আমাকে চমৎকৃত করে ছিল। বহুজাতীয় চিল, শকুনী ও বাদুড় দেখেছি। এশিয়ার আর কোথাও এই ধরণের চিড়িয়াখানা আছে বলে আমার জানা নেই। এটি দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি।

একদিন দুপুরে ঘরে ফিরেই শিবা আমাদের 'জেডহাউস' দেখাতে নিয়ে যায়। চৈনিক দুই সহোদরের প্রতিষ্ঠিত 'জেডহাউস' এই শহরে একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। নিরলস উদ্যমে ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকে আনা বিবিধ ধরণের জেড পাথর এবং তা হতে নির্মিত বিবিধ রকমের দ্রব্যাদি এখানে সংগৃহীত রয়েছে। পরিব্রাজকদের কাছে এই জেডহাউস অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য হয়ে আছ।

সিঙ্গাপুরে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও মঠ পাহাড়ের উপর একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। এখানে শাস্ত্রাদি পাঠ এবং বিভিন্ন ঋতুতে হিন্দুদের দেবদেবীগণের পূজা ও অর্চনাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অনাথ বালকদের থাকার ও শিক্ষা পাবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সিঙ্গাপুরবাসী ভারতীয়েরা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি খুব শ্রদ্ধা সম্পন্ন। এজন্য এর ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা অগণ্য। ধর্মার্থীরা এই পুণ্য প্রতিষ্ঠান থেকে আত্মিক প্রেরণা ও সাধন ভজনের উদ্দীপনা লাভ করেন।

প্রসঙ্গত, বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই যে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে বরেণ্য নেতা দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্র বোসের স্মৃতী জড়িত আছে। আমরা বাঙালীরা এই নিয়ে গর্ববোধ করতে পারি। মাতৃভূমির এই সর্বত্যাগী সন্তান স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের জীবনপণে ইংরাজদের কবল থেকে স্বদেশের উদ্ধার কল্পে আজাদহিন্দ্ সেনাবাহিনী গঠনের ব্যাপারে ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে একবার সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন। ঐ সময় সিঙ্গাপুরবাসী ভারতীয়গণ একজোটে তাঁকে উচ্ছসিত প্রাণে বিপুল সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করেছিলেন, এবং একান্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে তাঁরা সর্বান্তঃকরণে তাঁর ইচ্ছা পুরণ করতে আগ্রহী ও উৎসাহী হয়েছিলেন। মুক্ত হস্তে প্রাণখুলে প্রভূত অর্থ ও অলঙ্কারাদি মহৎ উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। অনেক তরুণ তরুণী মাতৃভূমির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বশতঃ স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দিয়েছিলেন, যুবক বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই তাঁর আদেশ পালনে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। এমন অভাবিত সম্বর্দ্ধনা ও আনুগত্য নিশ্চয়ই এক আশ্চর্য ব্যাপার। মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রের

প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। সিঙ্গাপুরে যে স্থানে ইংরাজেরা সর্বপ্রথমে জাহাজ থেকে নেমে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তার নিকটবর্তী ময়দানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীদের এক জন-সভায় দেশাত্মবোধক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ইংরাজদের অত্যাচার উৎপীড়ন ও সাম্রাজ্য-লোলুপতার বিরুদ্ধে বীরের মত দাঁড়াতে তাঁদের আহ্বান জানান। দেশ-মাতৃকার মুক্তিই যে ভারতবাসীদের একান্ত কাম্য ও পরম মঙ্গলকর একথার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সান্তে যাদ্বীপ

সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন একদিন সান্তোষাদ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলাম। 'কেবল্‌কারে' ওখানে যেতে হয়। সময় লাগে মিনিট বিশ-পঁচিশের মত। সন্নিহিত ঐ দ্বীপের পাহাড় ঘিরে যাদুঘর আছে। এটিও সাধারণ যাদুঘরের মত নয়। এরও বৈচিত্র আছে। যাদুঘরের নির্দিষ্ট বাসে চড়ে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত বিচিত্র ধরণের সামুদ্রিক জলযান যা আদিযুগে ব্যবহৃত হত। তার নমুনা এবং কালক্রমে কিভাবে তার আকার আকৃতি ও গঠন নৈপুন্যের উন্নতি ও বিকাশ হয়েছে, সে নমুনাও দেখতে পাওয়া যায়। এবং যে সকল দ্রব্যাদি কালের কবলে পড়ে ধ্বংস বা লুপ্ত হয়েছে তারও ফটো তুলে সযত্নে অন্য স্থানে রাখা আছে তাও দেখা যেতে পারে। প্রাচীন কালের বহু রকমের অধুনালুপ্ত দ্রব্যাদির ফটোও ঐসঙ্গে একই ঘরে রক্ষিত আছে। ঐ স্থানে যেতে আলাদা বাস ভাড়া লাগে না। ঐ যাদুঘরের ঢালু জায়গায় কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে ছোট বড় বহু রকমের জীবন্ত শঙ্খ, ঝিনুক, শামুক, কড়ি ইত্যাদি রাখা হয়েছে। ঠিক এই রকম যাদুঘর আর আমরা দেখি নি। এটি দেখে আমরা সবাই আশ্চর্য হয়েছি।

এখানকার বেলাভূমিতে সমুদ্রস্নানের সুব্যবস্থা আছে। বেলাভূমিও সুন্দর। বিভিন্ন দেশের পর্যটকেরা সমুদ্রে প্রাণের আনন্দে সাঁতার কাটেন এবং স্নানের শেষে তীরে বালুর উপর শয়ন করে ঘণ্টার উপর ঘণ্টা রৌদ্র-তাপ উপভোগ করেন। এ দৃশ্যটি দেখার মত।

এই দ্বীপের সমুদ্র তীরবর্তী বেলাভূমিতে ছোটদের খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম ও যুবকদের জন্য ব্যায়ামাগারে বহু রকমের প্রয়োজনীয় ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি রাখা আছে। দর্শক বা পর্যটকদের জন্য রেস্তোঁরা ও হোটেলের

বিশেষ ব্যবস্থা এই দ্বীপের চতুর্দিকে রয়েছে। আনন্দে ও আরামে দর্শক-মণ্ডলীর সারাদিন এখানে কাটিয়ে যেতে কোন অসুবিধা নেই।

এই দ্বীপের পুরাতাত্ত্বিক যাদুঘরটি প্রথম শ্রেণীর ত বটেই এরূপ যাদুঘর আমি অন্য কোথাও দেখিনি। এই যাদুঘরটি অতি দুষ্প্রাপ্য বিচিত্র সামগ্রীতে ঐশ্বর্যবান। জীবসৃষ্টির আদিযুগের রহস্য এখানে সুন্দররূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই যাদুঘর দেখে আমি খুবই প্রীত হয়েছিলাম। মহানন্দে আরামে আয়াসে প্রায় দুই মাস শ্রীমান শিবার বাসায় থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম ভাগে দেশে ফিরে আসি।

মালয় উপদ্বীপে কালীপূজা দর্শন

শ্রীমান শিবার উৎসাহে একবার সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন মালয় উপদ্বীপ ভ্রমণে যাই। তার নিজস্ব মোটর গাড়িতে করে ভোরে বেরিয়ে আমরা মালয় উপদ্বীপে ঢুকে এক বাড়ির বারান্দায় বসে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ফল মূলাদি খেয়ে আমাদের প্রাতঃরাশ সেরে নেই। সামান্য বিশ্রামের পর গন্তব্য স্থান অভিমুখে রওনা হই। আমাদের গাড়িতে ঐ উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল কিছু ছোট বড় শহর ও আর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যদিয়ে প্রায় দেড়শত মাইল পথ ঘুরে ঘুরে আমাদের গন্তব্য 'পোর্টডিক্সন্' বাঙালি উপনিবেশে এসে উপস্থিত হলাম। তখন রাঙাসূর্য অস্তগমনোন্মুখ। দৃশ্যটি সমুদ্রতীর থেকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেদিন আমরা স্থানীয় একটি চীনাহোটেলে সিটভাড়া করে রাত্রিযাপন করি। ঐ হোটেল থেকে সমুদ্র বেশ সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। ঐখানকার বাঙ্গালিরা আমাদের বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করেছেন। ঐদিন বাঙ্গালি ক্লাবে শ্রীশ্রীদীপান্বিতা কালীপূজার অনুষ্ঠান হয়। বাঙ্গালিরা প্রায় দেড়শতাধিক বর্ষ মালেশিয়ার এই অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছেন। তাঁদের মধ্যে হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃভাব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান দেখে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম।

মালয় উপদ্বীপটি পাহাড়ে জায়গা। অবশ্য স্থানে স্থানে সমতল ভূমিও আছে। এখানে অনেক নদীনালা রয়েছে এবং ঐগুলির উপরে ছোট বড় অনেকগুলি সেতু আছে। এখানে যান-বাহন চলাচল ও যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে। যাত্রীদের কোন রকম হয়রানি হতে হয় না।

চড়াইউৎরাই পথে যেতে অবিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মন আনন্দে ভরে উঠে। ঐ উপদ্বীপে অজস্র নারিকেল গাছ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আশ্চর্যের বিষয় আমাদের দেশের নারিকেল গাছের মতো ওখানকার গাছগুলি অত উঁচু হয় না। মালয় উপদ্বীপের নারিকেল গাছগুলি স্বভাবতঃ ৭।৮ ফিট লম্বা হয়। গাছগুলি সব সময়েই অজস্র ফলে ভর্তি থাকে, ফলের ঋতু বা অকাল বলে কোন কথা নেই। দিগন্ত জোড়া নারিকেল গাছগুলির চিক্কন হরিৎ শোভায় আমার মন খুশিতে ভরে উঠেছিল।

মালয় উপদ্বীপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিতে রবার ও পামের চাষ হয়। রবার ও পামের ক্ষেত্রগুলি সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত গাছের অবস্থানে খুবই সুদৃশ্য ও মনোরম দেখায়। রবার ও পাম মালয়েশিয়ার জাতীয় আয়ের একটি প্রধান উৎস। ঐ উপদ্বীপের সমতল ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ধানের চাষ হয়। চাউল, সমুদ্রের মাছ, ছাগল, ভেড়া, মোরগ ইত্যাদির মাংস মালয়বাসী বিভিন্ন জাতির প্রধান খাদ্য। ফলের মধ্যে নারিকেলই প্রধান। আম ছাড়া কাঁঠাল জাতীয় 'ডুডিয়ান' নামক এক প্রকার ফলও ওখানে জন্মায়। দু-চারটি আমগাছ ও অদ্ভুত রকমের ছোট ছোট সরু বেত বা বাঁশ গাছের মতো এক রকম গাছ নজরে পড়ে। এই উপদ্বীপটির আবহাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল। এখান থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সিঙ্গাপুর সহরে প্রত্যহ সরবরাহ করা হয়। মালয় উপদ্বীপে এক ধরনের কুটিরশিল্প বর্তমান। ছোট বড় নারিকেলের মালা দিয়ে বিচিত্র আকারের খেলনা ও সৌখীন সুদৃশ্য দ্রব্যাদি তৈরি হয়। পর্যটকদের কাছে ঐ সব মনভোলান শখের সুন্দর সুন্দর জিনিস খুবই আকর্ষণের বস্তু। এ ছাড়া চিক্কণ সরু বাঁশের ও বেতের তৈরি নানা ঢংয়ের সাজি, ডালা ও অন্যান্য গৃহস্থালরি প্রয়োজনীয় জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। তাতে আবার নানা রকমের ঝিনুক বসানর জন্য ক্রেতাদের মন আকর্ণণ করে। পর্যটকদের কাছে এই ফ্যান্সি জিনিসগুলি বিক্রয় করে মালয় উপদ্বীপবাসী লোকেরা প্রচুর লাভবান হয়। মালয় উপদ্বীপের ধারে এবং সহরগুলিতে পর্যটকদের জন্য সুন্দর সুন্দর আরামদায়ক হোটেলের ছড়াছড়ি। তাছাড়া সমুদ্র তীরবর্তী পার্কগুলিতে গিয়ে বসলে আর উঠে আসতে ইচ্ছা হয় না।

এখানকার অধিবাসী শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন মুসলমান, বাকি পঞ্চান্নভাগ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। সামান্য কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করেই এই দ্বীপটিকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। মুক্ত আলো বাতাসে এখানে প্রাণ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে।

শুভাপ্রসন্ন

শুভাপ্রসন্ন আমার ছোট ছেলে। বাংলা ১৩৫৪ সালের ২রা কার্তিক সোমবার মহাসপ্তমী তিথিতে তার জন্ম হয়। সে স্বভাব-শিল্পী। অতি শিশুকাল হতেই চিত্রকলার প্রতি তার জন্মগত রুচি ও প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়। চার-পাঁচ বৎসর বয়স থেকেই রঙীন খড়ি পেন্সিল যা-কিছু হাতের কাছে পেত তাই দিয়ে সে মেঝেতে বা দেওয়ালে ছবি এঁকে ফেলত। ছোট বয়সে আমি তাকে চিত্রাঙ্কণের কাজে উৎসাহ মোটেই দিইনি, বরং পড়াশুনায় অমনযোগী হলে তাড়নাই করেছি। কিন্তু জন্মগত স্বাভাবিক ক্ষমতা বা শক্তি আত্মপ্রকাশ করবেই করবে। আট বৎসর বয়সেই শুভার মধ্যে চিত্রাঙ্কণ শক্তির আশ্চর্যরকম স্ফুরণ হয়েছিল। চিত্রে পরিমিতি বোধ, আলোছায়ার জ্ঞান যেন জন্ম হতেই তার আয়ত্ত ছিল। শুভা দুষ্টু ও মিষ্ট-স্বভাবের ছেলে ছিল, আর বেশ চালাক-চতুরও ছিল। এজন্য ছোট বড সকলেরই সে প্রিয়পাত্র হয়েছিল। যাঁরা আমার বাড়িতে আসতেন শুভাব সঙ্গে দেখা হলে তাকে তাঁরা ভালো না বেসে পারতেন না। আট বৎসর বয়সে আমি তাকে হিন্দুস্কুলে ভর্তি করে দেই।

সেখানেও তার ছবি আঁকার ক্ষমতা তাব শিক্ষকদের নজরে পড়ে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে আদর করে বাড়ি নিয়ে যেতেন শখের ছবি আঁকাবার উদ্দেশ্যে। দেশ স্বাধীন হওযার পর রুশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভরসিলভ আমন্ত্রণ রক্ষায় ভারতভ্রমণে আসেন। তখন শুভার বয়স বড়জোর দশ বছর—এর বেশি হবে না। কাউন্সিলার ধীরেন্দ্রনাথ ধর শুভাকে খুব ভালো-বাসতেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ ভবনে উঠেছিলেন রুশ-রাষ্ট্রপতি ভরসিলভ। শুভা নিজ উদ্যোগে ও চেষ্টায় ভরসিলভ মহাশয়ের নিকট একা গিয়ে সাক্ষাৎ ও পরিচয় করে। ধীরেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্রনাথ ধর তাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। শুভা সঙ্গে নিয়ে যায় নিজের হাতে আঁকা একখানি চিত্র। চিত্রখানি দেখে রুশ-রাষ্ট্রপতি খুব খুশি হন এবং শুভাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরেন। শুভা রাষ্ট্রপতি ভরসিলভকে স্বহস্তে চিত্রিত লেনিনের একখানা ছবিও উপহার দিয়েছিল। দেশ-বিদেশের পত্রিকায় ছবিসহ এই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। আর শুভারও সুনাম ব্যাপক ছড়িয়ে পড়েছিল।

আর একটু বড় হয়ে বছর এগার বয়সে শুভা স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করেছিল। তিনি কলিকাতায় এসেছিলেন সংস্কৃত

সহাসম্মেলনের আমন্ত্রণে।—সে নিজের হাতে তৈরি রাজেন্দ্রবাবুর একখানা তৈলচিত্র তাঁকে উপহার দিয়েছিল সরাসরি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে। ছবিখানি উপহার পেয়ে রাজেন্দ্রবাবু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি শুভাকে বহু স্নেহ সমাদর করেছিলেন। আর কী পেলে সে আনন্দ পায় জিজ্ঞাসা করায়, শুভা তাঁর আশীর্বাদ পেতে চেয়েছিল। তাতে তিনি খুশি হন—আর মিষ্টি খাওয়ার জন্য তাকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে তাঁর দেহরক্ষীর সঙ্গে গাড়ি করে শুভাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

এরপর একদিন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত Mr. Galbraith কলিকাতায় U.S.I.S.-এ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর শুভা শ্রোতাদের সারিতে বসে তাঁর বক্তৃতায় তেমন মনোযোগী না হয়ে একটু আড়ালে থেকে তাঁর একখানি ছবি আঁকছিল যত্নের সঙ্গে। হঠাৎ Mr. Galbraith-এর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি তাকে কাছে ডাকেন এবং শুভা তাঁরই ছবি এঁকেছে দেখে যুগপথ বিস্মিত ও উৎফুল্ল হন। Mr. Galbraith শুভাকে খুব স্নেহ দেখিয়েছিলেন আর উচ্চ প্রশংসাও করেছিলেন। আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে President Eisenhwar-এর সঙ্গেও তাব পরিচয় করিয়ে দেবেন—এরূপ প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সে-প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভবপর হইনি।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু শেষবারের মতো পশ্চিম বাংলায় তথা কলিকাতায় আসেন। এইখানে প্রসঙ্গেব সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগ না থাকা সত্ত্বেও একটি কথার উল্লেখ বোধহয় শোভনীয় হবে। আমার ছোট মেয়ে শিশু চন্দ্রা দেখতে ফুটফুটে ও ধীর শিষ্ট ছিল। শুভার সঙ্গে পরিচয় সূত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের পক্ষ থেকে তখনকার রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু চন্দ্রাকে দমদম্ বিমান বন্দরে নিয়ে যান। উদ্দেশ্য ছিল, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে অভ্যর্থনা করা। সুন্দর ভঙ্গিতে চন্দ্রা পণ্ডিতজীকে মাল্যভূষিত করে। তখন ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করার আয়োজন হয়। এই উপলক্ষে শুভা নিজেই সভায় গিয়ে তাঁব সঙ্গে দেখা করে। সে সঙ্গে সঙ্গে হাতে এঁকে নেহেরুর একখানা প্রতিকৃতি তাঁকেই উপহার দেয়। তাতে জওহরলাল খুব পরিতুষ্ট হন। তাঁর সস্নেহ ব্যবহারে শুভা মুগ্ধ হয়েছিল। এই সমস্তই হল শুভার বাল্যকালের সুখকর ঘটনা।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল বের হবার পর সাধারণ শিক্ষা বেশী পেতে অনিচ্ছুক শুভা আর ঐ সাধারণ পড়ায় অগ্রসর হয় নি—এতে তার আগ্রহ

ছিল কম। বাংলা ১৩৭২ সালে শুভাকে কলিকাতায় Indian College of Art and Draftmanship শিক্ষালয়ে চিত্রকলা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করি। Art College-এ (চিত্রকলা বিদ্যালয়ে) পাঁচ বৎসরকাল অনুশীলনরত থেকে বাংলা ১৩৭৬ সনে শুভা চিত্রবিদ্যায় Graduate হয়েছে। এরপর দুই একটি প্রতিষ্ঠানে সাময়িক ভাবে কাজ করে। এখন St. Paul School-এ স্থায়ী ভাবে সে চিত্রাঙ্কন-শিক্ষকের কাজ পেয়েছে। গুণী চিত্রশিল্পী হিসাবে শুভার নাম প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে চিত্রের সমজদার মহলে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সে সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাতসহর জেনেভার C.I.R.C.A. চিত্রানুশীলন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়েছে। ১৩৭৭ সন থেকে কয়েক বৎসরের মধ্যে নয়াদিল্লী, বম্বে, কলিকাতা ইত্যাদি মহানগরীতে যত চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছে তার প্রায় সব-গুলিতে শুভা তার নিজের অবদান নিয়ে যোগ দিয়েছে। বাংলা ১৩৭৮ সালে শুভা সর্বভারতীয় ললিতকলা ও হস্তশিল্প-সঙ্ঘের প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেছে। National Gallery of Modern Art প্রতিষ্ঠানে, Birla Academy Galleryতে, কলিকাতার বৃটিশ কাউন্সিলে, American Embassyতে শুভার অঙ্কিত চিত্রাবলী স্থান পেয়েছে। অতি আধুনিক আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য তার চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জেনেভা, জার্মানী ও প্যারী নগরের কতিপয় ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যেও শুভাব আঁকা ছবি সমাদরে সংরক্ষিত হয়েছে। গুণীজনের চোখে শুভা উদীয়মান চিত্রশিল্পী, বয়স তার অল্প, প্রতিভার মধ্যগগনে এখনও সে পৌঁছায় নি। বিশিষ্ট সমজদারেরা আশা পোষণ করেন যে, ভারতের কীর্তিমান মহান শিল্পীদের মধ্যে তারও আসনলাভ হবে।

ভগবান শ্রীমান শুভাকে চিত্রকলার মাধ্যমে নিজের ভাব, কল্পনা, অনুভূতি প্রকাশের শক্তি দিয়েছেন উদার হস্তে। এছাডা লিপিচাতুর্য—রচনাশক্তি ভাষার উপর দখল তার কম নয়। ইতিমধ্যে সে কিছু পরিমাণ কবিতা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করে কলিকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক ও মাসিকে প্রকাশপূর্বক সুনাম অর্জন করেছে। এদিকেও তার প্রতিভা বিকাশেব উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে মনে হয়। শুভা নিজ কর্মক্ষেত্রে খুব উৎসাহী ও উদ্যমী। এতে আশা হয়, নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে সে নিজের জীবন গৌরবময় করে তুলতে পারবে

নবযুগের চিত্রশিল্প বিকাশে ও প্রসারে শ্রীমান শুভাপ্রসন্নর প্রভাব ও উদ্যম

প্রাচীন ভারতের শিল্পকীর্তি অতুলনীয় ও আশ্চর্য। বৌদ্ধযুগের চিত্রশিল্প জগৎজোড়া খ্যাতির অধিকারী। পৌরাণিক যুগের চিত্রশিল্প রূপ-গরিমায় ও কল্পনার ঐশ্বর্যে অনুপম। ঐ সকল যুগের রাজামহারাজ ও বিত্তবান সৌখিন লোকের আগ্রহে ও আনুকূল্যে চিত্রশিল্প সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। সভ্য সমাজের বাইরে ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যেও চিত্রাঙ্কন প্রশংসনীয় রূপেও আশ্চর্য সুষমায় বিকাশলাভ করেছিল। মোগলযুগের চিত্রাবলী ও খুব উন্নতস্তরের, এর সৌন্দর্যের লাবণ্যে মন মুগ্ধ করে।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতেই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিভার মহত্তম বিকাশ ঘটেছে। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে কখন াবশাল প্রতিভাধর শিল্পীর আবির্ভাবে নবযুগের সৃষ্টি হয়েছে,—সাধারণ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও চিত্ররসানুভূতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তারপর কিছুকাল স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিভাবান শিল্পীর অভাবে শিল্পরুচি অনেকটা ম্লান হয়েছে এবং জনসাধারণের অনুরাগও হ্রাস পেয়েছে। বিংশশতাব্দীর সূচনায় ইংরাজযুগে দীর্ঘকালেব অবসাদ ঝেড়েমুছে ফেলে দিয়ে চিত্রভারতী আবার নব কলেবরে আবির্ভূতা হন। ঐ সময়ে দেশের কয়েকজন প্রতিভা-বান জগৎবিখ্যাত চিত্রশিল্পী চিত্রে নূতনরূপে সৌষ্ঠব ও কল্পনার গৌরবে মহৎ কীর্তির অধিকারী হন। এইকালে চিত্রাঙ্কন চর্চার জন্য কলিকাতা ও অন্যান্য বড় বড় সহরে অনেকগুলি আর্ট স্কুল স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল—দেশের প্রতিভাবান কিশোর তরুণেরা প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় এবং চিত্রশিল্পে রুচির মান উন্নত হয়, জনসাধারণের মধ্যে চিত্রানুরাগ বৃদ্ধি পায়।

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের জাতীয় জীবনে নবজাগরণের এক বিপুল সাড়া পড়ে যায়। ঐ সময় শ্রীমান শুভাপ্রসন্ন অল্পবয়স্ক বালক মাত্র। কিন্তু সে জন্মগত চিত্র প্রতিভার অধিকারী ; শিশু বয়সে তার খেলাচ্ছলে আঁকা ছবিতেও সৌন্দর্য রেখা—নৈপুণ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এতে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমার পরিচিত কয়েকজন চিত্ররসিকও বেশ প্রশংসাও করেছেন। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমান শুভার প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। আজ সে নবযুগের চিত্রশিল্পে অগ্রগণ্যদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে, বিদেশেও গুণীমহলে তার প্রচুর সমাদর। কিন্তু এখানে আমার বক্তব্য এই যে, শ্রীমান শুভা কেবল ব্যক্তিগত সাধনায় নিমগ্ন নয়। দেশের চিত্রবিদ্যার নবরূপে

উদ্বোধনের আন্দোলনে সে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তার দৃষ্টান্তে ও উৎসাহ উদ্দীপনায় দেশের কিশোর তরুণতরুণীরা চিত্রশিল্পের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হচ্ছে। আপন স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখেও সে বহু উদীয়মান কিশোর তরুণ-তরুণীকে স্বীয় প্রতিভা বিকাশে পথ প্রদর্শণ করছে। তাই বলি, চিত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে সে কেবল মহাগুণী শিল্পীই নহে, আচার্যও বটে।

শুভপ্রসন্নর বিবাহ প্রসঙ্গে

আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ব্যতীত অপর চারিটিই বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বিবাহ যোগ্যা হয়ে উঠেছিল। পরমাবাধ্যা গুরু—মা সারদামণির অসীম কৃপায় আমি প্রতিটি মেয়ের ক্ষেত্রে সু-পাত্র ও শুভকার্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় সকল রকম দ্রব্যাদি অনায়াসে পেয়ে ছিলাম। আর সৎপাত্রে দান করে আমি কন্যাদায় মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত ও শান্ত হতে পেরেছিলাম।

ইতিমধ্যে আমার এখনকার বড় ছেলে শ্রীমান শিবাপ্রসন্ন এম, ডি, পরীক্ষা দিয়ে পাশের খবর পেয়ে বিদেশে যাবার জন্য উদ্যোগী হল। তার মনের ইচ্ছা আমার পূর্ব থেকেই জানা ছিল, তাই আমি শ্রীমানকে বিবাহ দিয়ে বিদেশে পাঠাবার উদ্দেশ্যে মনোমত পাত্রী দেখে রেখেছিলাম। যথাকালে সেই পাত্রীটির সঙ্গে শিবার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। শিবাপ্রসন্নকে গার্হস্থ্য ধর্মে ব্রতী করে দিয়ে আমার সাংসারিক দায়দায়িত্ব অনেকটা লাঘব হয়ে এল। এখন ভাবলাম ছোট ছেলে শুভাপ্রসন্নর বিবাহ দিতে পারলে আমি সংসার বন্ধন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারব আর পরোপকার ব্রতে মাতৃ-উপদেশ পালনে সক্ষম হব।

এরই মধ্যে শিবাপ্রসন্নর বিদেশ বাস তিন বৎসর পূর্ণ হ'তে চলল। এই সময়ের মধ্যে আমার ছোট ছেলে শ্রীমান শুভাপ্রসন্ন দুবার জেনিভা, জার্মানী ও ফ্রান্স ঘুরে এসেছে। সেখানে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে স্থানীয় শিল্পী মহলে ও শিল্পানুরাগীদের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। শুভাপ্রসন্নর সুনাম ও যশঃ দেশবিদেশে এখন পরিব্যাপ্ত।

ঐ সময়ে আমাদের দূর সম্পর্কে কুটুম্ব এক প্রবাসী ভদ্রলোকের কাছ থেকে একখানি পত্র পাই। তিনি তাঁর একমাত্র কনিষ্ঠা কন্যাকে শ্রীমান শুভা-প্রসন্নর সঙ্গে বিবাহ দিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করে রোগশয্যা থেকে আমাকে পত্র লেখেন। তাঁর কন্যা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির অনুসন্ধানে আমি জানতে

পারি যে, ঐ মেয়ে উচ্চশিক্ষিত হলেও আমাদের ঘরে এলে আমাদের সঙ্গে খুবই মিল হবে। এই কারণে আমি মেয়েটিকে আমার পুত্রবধূ করে ঘরে আনতে আগ্রহী হই।

হিতৈষীদের অনুমোদন লাভের পর আমার কোন একান্ত বিশ্বাসী জ্যোতিষীকে দিয়ে যোটক বিচার করাই। জ্যোতিষী পণ্ডিত যোটক বিচার করে পাত্রপাত্রীর মধ্যে খুব ভাল মিল দেখতে পান, আর সোৎসাহে বলেন—'এ বিবাহ সুখের হবে। রাজ-যোটক্ যোগও রয়েছে।' পরদিন প্রভাত নামে শুভার এক জ্যোতিষী বন্ধু আমাদের বাড়িতে এসে পড়ে, আমি তাকে দিয়েও যোটক বিচার করাই। সে পাশ্চাত্য মতে ভবিষ্যৎ গণনা করে থাকে। শ্রীমান শুভার ঠিকুজী বিচার করে উৎকৃষ্ট ভালো মিল লক্ষ্য করে সে উল্লসিত হয়ে বিচারপত্রে লিখে দেয়—"এ বিবাহ দেওয়া উচিত"।

এই দুইজন জ্যোতিষীর অভিমত আমি কন্যাপক্ষকে জানিয়ে দেই। পাত্রপাত্রীর প্রাক্‌বিবাহ সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটাবার অভিপ্রায়ে আমি কন্যাপক্ষকে সত্বর কলিকাতায় কন্যাকে নিয়ে আসতে লিখি। পাত্রীর পিতা আমার এই প্রস্তাবে রাজী হন এবং সেইমতো ব্যবস্থা করেন। এসময় শ্রীমান শুভার জ্যোতিষী বন্ধুটি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসে। সে তার অভিজ্ঞ শিক্ষাগুরুকে দিয়ে নূতন করে ছক বিচার করায়। দক্ষ জ্যোতিষী পণ্ডিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে পাত্রের পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে এক ফাঁড়া আছে দেখতে পান। তিনি এই বিচার ফল আমার নিকট প্রেরণ করেন। আর বলে পাঠান যে, আমি যেন কোন মতেই পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শুভার বিবাহ না দেই।

বিজ্ঞ জ্যোতিষী মহাশয়ের এই নিষেধ বাণী পেয়ে আমি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়ি। পাত্রী দেখার পরও শ্রীমান শুভা বিবাহে অরাজি হওয়ার জন্য আমি যে গভীর মনোবেদনা ভোগ করছিলাম, মা-মঙ্গলময়ীর অসীম কৃপায় অনুভব করলাম নিমেষের মধ্যে তার উপশম হয়ে গেল। অকল্পনীয় ভাবে স্বস্তি পেয়ে আমার মনে এই ভাবের উদয় হল,—"হে ভগবান। তুমি সত্যই মঙ্গলময়! সংসারে যা কিছু ঘটে সে সবই তুমি জীবের মঙ্গল উদ্দেশেই করে থাক।" আমি দৈবজ্ঞ পণ্ডিতের সাবধান বাণীকে ভগবৎ প্রেরিত নির্দেশ মনে করে শ্রীমান শুভার বিবাহ ব্যাপারে আর উদ্যোগী হলাম না।

পূর্ব থেকেই আমি ভেবে রেখেছিলাম যে, শুভাপ্রসন্নর বিবাহেব পর ছোট বৌমার সাহায্যে পাঠশালা খুলে শিশু পড়ুয়াদের বিদ্যাদানের সঙ্গে

নীতি শিক্ষা দিয়ে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী, শিষ্টাচারী ও দৃঢ়চেতা করে তুলব। তাতে তারা হীনম্মন্য ও আত্মঘাতী বুদ্ধিসম্পন্ন না হয়ে আত্মরক্ষা-মূলক কাজের যথার্থ উপযোগী, স্বভাবচরিত্রে সৎ, জনকল্যাণকামী হতে পারবে, আর এরূপ উদ্যোগে আমি আমার স্বর্গতাঃ মায়ের ইচ্ছা পূরণে সম্যক যত্নবান হব। পরমারাধ্য গুরু মা সারদামণি করুণা বশে ঠিক সময়ে যথোচিত সমাধান করে দিলেন।

১৩৮৭ সনে শ্রাবণ মাসে অভাবনীয়রূপে শ্রীমান শুভাপ্রসন্নর বিবাহ হয়। বিস্তৃত বিবরণ দেবার এখানে আবশ্যক দেখি না, -তাই সংক্ষেপে বললাম। মেয়েটির নাম শিপ্রা বি. এস.-সি. পাশ। চিত্রশিল্পী হিসাবে এখনও সে কর্মরত আছে। তার পৈতৃক বাসভূমি পাবনা জেলায় ছিল। তার পিতামাতা বর্তমানে কলিকাতার লেকটাউনে বসবাস করেন। ঐখানেই বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। এই বিবাহে শ্রীমান সুখী হয়েছে দেখে আমিও স্বস্তি পেলাম।

সম্পদে বিপদে গুরুর কৃপা

পরম পূজ্যা গুরুমাতা আমাকে বারবার কল্যাণ হস্তে বিঘ্ন-বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। ছোট একটি ঘটনার উল্লেখ করে এই সত্য প্রতিপন্ন করছি। দৃষ্টান্তটি এইরূপ—

আমার ছেলেমেয়েদের হাতে খড়ি দিয়ে পাঠশালায় যখন পাঠাবার সময় হল, তখন আমি চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে আছি। সেই সময় আমার কোন আত্মীয় ও তার চেলা-চামুণ্ডারা সতর্ক দৃষ্টিতে দারুণ বাধা সৃষ্টি করত যাতে কোন রোগীই আমার চিকিৎসাগারে এসে চিকিৎসাধীন না হতে পারে। একারণে রোগী দেখা তখন প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। টেলিফোন যোগে আমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যারা আমার চিকিৎসাধীনে আসতেন তখন কেবলমাত্র তাঁদের চিকিৎসা করে যে সামান্য আয় হত তাতেই আমাকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হত। এইরূপ দারুণ আর্থিক কষ্টের মধ্যে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার সমস্যা গুরুতর রূপে দেখা দিয়েছিল। পরম পূজ্যা গুরুমা সারদামণি দেবীর এখন শরণাপন্ন হলাম ও পথনির্দেশের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালাম।

একদিন রাত্রে শয়নের একটু পরে আমি তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছি। আর

সেই মুহূর্তে ঐ তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেই স্বপ্নে ভেসে ওঠে শৈশবের এক বাস্তব ঘটনা, যা আমার মনে বিস্মৃতির অন্ধকারেও অক্ষুণ্ণভাবে জাগ্রত ছিল।

এই স্বপ্নের মধ্যে আমার পূজ্যপাদ পিতামহের সগর্ব উক্তিপূর্ণ গম্ভীর গলার আওয়াজ ফুটে উঠল, আর শোনা মাত্র আমার তন্দ্রাঘোর কেটে গেল। পিতামহের যে উক্তির নিগূঢ়ার্থ ছোট বয়সে আমার বোধগম্য হয়নি, পুনরাবৃত্তি ঘটায় সেই জটিল উক্তি সহজ ও সুখবোধ্য হয়ে গেল। পিতামহের ঐ কথার মর্মার্থ উপলব্ধি হওয়াতে আমি তখনই স্থির করে ফেললাম যে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার গোড়াপত্তন আমি নিজেই করব। এইভাবে আমার মুস্কিলও আসান হয়ে গেল।

স্বপ্নের বিষয়বস্তু ছিল এই যে—

যখন শিশু ছিলাম সেই সময় একদা গ্রীষ্মের ছুটিতে দুপুরে আমার পিতামহ আহারান্তে বিশ্রাম নিতে অগ্রসর হয়ে আমাকেও তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাশে শোয়ালেন। তাঁর কাছে নানারকম মজার গল্প শুনতে শুনতে আমি এক সময় কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করে বসলাম,—সারা জীবনে তিনি কত মুদ্রা জমাতে পেরেছেন। পিতামহ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে সপ্রতিভ উত্তর দিলেন,—"আমার বাড়ির সেভিংস ব্যাঙ্কে তিন লক্ষ মুদ্রা জমা আছে; তোমার বাবা এক লক্ষ মুদ্রা, আর তোমার দুই কাকা দুই লক্ষ মুদ্রা; একি কম হল?" স্বপ্নে-শ্রুত তাঁর গম্ভীর গলার এই সগর্ব আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ উক্তিটি অতীতের যবনিকা ভেদ করে আমার প্রাণে পুত্রকন্যা সম্পর্কে এক নূতন প্রেরণা ও উৎসাহ জাগাল। এখন নিশ্চিন্ত হলাম।

পুত্র কন্যা এবং সংসার জীবন সম্পর্কে যা কিছু অনুভব করেছি তা সংক্ষেপে এই ক্ষুদ্র জীবনকথায় ব্যক্ত করা হল।

সমাজ কল্যাণের উদ্যম সংক্রান্ত শেষ কথা

অবশেষে আমার সমাজমঙ্গল সূচক কাজের শেষ কথা দু-একটি বলে এ 'জীবন কথার' সীমা রেখা টানি। উপযুক্ত কর্মীর অভাব ও অর্থাভাব উগ্র হয়ে ওঠায় 'সম্বুদ্ধ ভারত সন্তান' গঠনের কাজ পরিচালনা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, আর এর গণ্ডীও সংকীর্ণ হতে থাকে। আমি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নাগরিক তৈরির যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তা তাঁরা গ্রহণ করেন নি। স্বাধীন ভারতে যাতে হীনম্মন্যতা দেখা না দেয়, বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মঘাতী

বুদ্ধি-সম্পন্ন দুর্বলচেতা ও অসচ্চরিত্র নাগরিক সৃষ্টি না হয়, আর জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়ে পড়ে, সে বিষয় প্রতিকারকল্পে আমি নবলব্ধ স্বাধীনতার আবির্ভাব কালেই প্রাণপণ প্রয়াস পাই। অল্পকালের মধ্যে তরুণদের ভিতর উচ্ছৃঙ্খলতা, অনাচার, হীনম্মন্যতা ও আত্মঘাতী বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমি সত্যই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম।

পূর্বেকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে দেশের আন্তরিক কল্যাণকামনায় আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে আমার নাগরিক গঠনের আদর্শ সম্বলিত পরিকল্পনা ও নিয়মাবলী প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় মোরারজি দেশাইয়েব কাছে প্রেরণ করি। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজকল্যাণ মূলক বিভাগে তা প্রেরণ করেছেন এখবর তিনি পত্রোত্তরে জানিয়ে ছিলেন।

ভারতবর্ষ এক সুবিশাল দেশ। আর্য, দ্রাবিড়, মুসলমান, পার্শী, ক্রিশ্চান এবং সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি উপজাতি ও আধুনিক যুগে ইংরাজদের পূর্বাগত পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির লোকেরা সকলেই এদেশের অধিবাসী। স্বভাবতঃই বিভিন্ন ভাবধারা-সম্পন্ন, নানা ধর্মাবলম্বী, বিচিত্র আচার-আচরণশীল লোক বাস করে। দেশ এবং জাতির কল্যাণের জন্য এক অখণ্ড ভারত বোধ এবং মহৎ স্বদেশপ্রেম সকলের মধ্যে জাগ্রত করা বর্তমান যুগে একান্ত আবশ্যক হযে পড়েছে। এই কারণে সমগ্র সমাজের কল্যাণ এবং উন্নতির কথা ভেবে সমাজসেবাব্রতী হিসাবে আমি সকল ব্যক্তির মধ্যে আত্মশক্তি জাগরণের জন্য নূতন ভাবে শিক্ষা পরিকল্পনার কথা ভাবি। এই কারণে আমার মনে প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা হ্রাস পায়। দলবদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মশক্তির জাগরণ সহজে সম্ভব হয় না। শিক্ষার ধরণ এমনই হওয়া চাই যে, প্রত্যেক ব্যষ্টিমানুষ আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়ে নিজের দেশকে ভাল বাসবে এবং কল্যাণ ব্রতে নিরত থাকবে। এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করে 'প্রবুদ্ধ-ভারত-সন্তান' প্রতিষ্ঠানটি উঠিয়ে দিয়ে নূতন শিক্ষাদর্শ সংবলিত 'সবুদ্ধ-ভারত-সন্তান' গঠনে ব্রতী হই। এখন পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণের দ্বারা আমার শিক্ষাদর্শ প্রচারে অগ্রসর হই। এই পুস্তিকা প্রচারের মাধ্যমেই আমি নূতন যুগের মহান নাগরিক-চরিত্র গঠনের চেষ্টা করি। কর্মক্ষেত্রে বয়সের অভিজ্ঞতার ফলে বুঝেছি ভগবৎ কৃপা ছাড়া কোন সমাজ বা জাতিকে মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। কর্মক্ষেত্রে সকলেই সক্ষম স্বাবলম্বী এবং সম্পূর্ণরূপে দেশহিতৈষী হয় এই ছিল আমার মনের আকাঙ্ক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দের জাতি গঠনের উদার মহৎ আদর্শ আমাকে প্রভূত প্রেরণা

জুগিয়েছে। আমার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর আদর্শ অনুসরণে ভারত একদিন জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হবে। আমি এখন বয়োভারে অবনত হয়ে পড়েছি, কাজেই কর্মযোগে আমি আর সক্ষম নই। সুতরাং আমার অসমাপ্ত কর্মের দায়িত্ব 'রামকৃষ্ণ মিশনের' নবীন কর্মীদের হস্তে অর্পণ করে আমি স্বস্তি বোধ করছি।

এখন জীবনের যা কিছু করণীয়, গ্রহণীয় ও শিক্ষণীয় তার প্রায় সমস্তই শেষ করে এনেছি। এখনকার ছোটখাট কোন ব্যাপারই জীবনকাহিনীর উপজীব্য নয়। এও সত্য যে, কোন আত্মজীবনীকারই আপন মনের মতন করে স্বীয় প্রাণলীলাকে ভাষায় অভিব্যক্ত করে যেতে পারেন না। সময় সুযোগ ও সামর্থ্যের অভাব প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সকলেরই আত্মজীবন কথা কিছুটা অপূর্ণ থেকে যায়। আমিও যে আমার জীবনের সব উল্লেখযোগ্য কথা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করে বলতে সমর্থ হয়েছি এমন নয়। আর জীবনের অবশিষ্টাংশের সম্ভাব্য ঘটনা ও ব্যাপার লিপিবদ্ধ করে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপরও নয়। কাজেই অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বাভাবিক ভাবেই রয়ে গেছে। পূর্বেই বলেছি, আমি 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। পরে ইহার নাম পরিবর্তন করে 'সম্বুদ্ধ ভারত' নাম রাখি। কয়েক বৎসর বহু যত্ন ও শ্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করতে পেরেছিলাম। ইহার মূলগত ও কর্মপন্থা সংবলিত কতকগুলি সুচিন্তিত নিয়ম ও বিধি তৈরি করেছিলাম। কিন্তু কাহারও একার আগ্রহে ও উদ্যমে কোন কার্য সফল হতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি খুব অল্প সংখ্যক সাহায্যকারী পেয়েছিলাম, আর তাঁদের উৎসাহ ও উদ্যম মোটেই ছিল না। পরিশেষে বাধ্য হয়ে আমাকে এই শুভ প্রচেষ্টা থেকে বিরত হতে হয়।

বিবেকানন্দ রক সোসাইটির হস্তে আমার স্বদেশমঙ্গলসূচক পরিকল্পনা সমর্পণ

কিন্তু তবু আমি একেবারে আশা ছাড়িনি। ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করে কিছুকাল পরে আমার মনে হল যে, রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে আমার আরব্ধ কর্ম সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করলে কেমন হয়। এই উদ্দেশ্যে আমি ১৯৮০ সালের শেষের দিকে বেলুড়মঠে গিয়ে মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বন্দনা মহারাজের সঙ্গে দেখা করি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিকল্পিত

নৈতিক শিক্ষাদর্শ ও নৈতিক আচরণ বিধি সম্পর্কে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। স্বামীজির আদর্শে নাগরিক জীবন উন্নত ও মহৎ করে গড়ে তুলবার আকাঙ্ক্ষায়। তিনি আমাকে আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়ে আমার কার্যভার মিশনের হাতে তুলে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু নানারকম অসুবিধা থাকার দরুণ তা সম্ভবপর হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধেয় বন্দনা মহারাজ আমাকে বলেছিলেন যে, বিবেকানন্দ রক সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীর প্রধান শ্রীএকনাথরানাডে এই কাজ সহজেই সম্পাদন করতে পারবেন। তিনি কলিকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে আমাকে অলোপ পরিচয় করিয়ে দেবেন। ঈশ্বরের কৃপায় কিছুকাল পরে ইং ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপে যাবার সুযোগ ঘটে যায়। শ্রীমান শিবাপ্রসন্ন আমাকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে গিয়েছিল। তখন বিবেকানন্দ-রক-সোসাইটির পরিচালনা-সম্পাদক শ্রীবাসুদেবজি এই সময়ে খবর পেয়ে একদিন সন্ধ্যার পর বিবেকানন্দ কেন্দ্রের যাত্রী আবাসে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত শিক্ষার আদর্শ ও নৈতিক আচরণ বিধি নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। তিনি খুবই খুশি হয়ে আমার নির্দেশিত পন্থা ও কর্মসূচী অনুমোদন করেন এবং আমার অসমাপ্ত কার্যভার রক সোসাইটির কর্মীমণ্ডলীর হাতে তুলে দিতে সম্মত হন। আমি সানন্দে আমার প্রবুদ্ধ ভারত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, কর্মাদর্শ ও বিধি-বিধান সংবলিত পুস্তিকাটি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র তাঁর হাতে তুলে দিই। এখন নৈরাশ্য কেটে গিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমার প্রাণ খুশিতে ভরে উঠেছে।

উপসংহার

ঈশ্বর মানবজীবনকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। বিচিত্র দ্বন্দ্ব কোলাহল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষকে জীবন পথে অগ্রসর হতে হয়। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে ঃ— 'Life is not a bed of roses'— 'জীবন গোলাপ কেয়ারির মত বর্ণ-সৌরভময় নয়।' ধনী দরিদ্র ছোট বড় সকল মানুষকেই দুঃখ-যন্ত্রণা, রোগ-শোক, দৈন্য-দুশ্চিন্তা, অল্প বিস্তর সহ্য করতেই হয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কারও ক্ষেত্রে হয় না। আমিও জীবনে বহু সংকট ও দুর্দিনের সম্মুখীন হয়েছি—কর্মক্ষেত্রে বরাবরই আমার উপর অজস্র ঝড় ঝাপটা এসেছে স্বাভাবিক নিয়মেই। এর একটা কারণ হয়তো এই যে,

সাধারণ মানুষের মতো সংসারজীবনের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আমি আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাই নি। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে আমি সন্ন্যাসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরমার্থ লাভের আশায় সংসার ত্যাগ করে আশ্রম-বাসী হতে চেয়েছিলাম—বেলুড়মঠে যোগও দিয়েছিলাম। আশ্রম ছেড়ে আসার জন্য ব্যর্থতার ক্ষোভ মনকে ভারাক্রান্ত করেছিল বৈকি। তাছাড়া দেশমাতৃকার মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তরুণ মনের উদ্দীপনা নিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দিয়েছিলাম। দেশের জন্য কিছু কাজও করেছিলাম। কিন্তু তাতেও নিশ্চয়ই অনেকখানি যন্ত্রণা দুর্ভোগ হয়েছিল। তবুও বলি,—এই সমস্ত ব্যাপার মনের উপর স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সত্য; কিন্তু মূলজীবন প্রবাহের সুখদুঃখের কারণ হিসাবে এসবের গুরুত্ব অল্প। চিকিৎসা আমার বৃত্তি, আমি সেবাব্রতধারী গৃহস্থ। চিকিৎসা দ্বারা এবং জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমি জীবসেবায় আত্মনিয়োগ করেছি। অসীম ধৈর্য ও তিতিক্ষার সঙ্গে আমাকে লোকের অত্যাচার অবিচার নির্বিকার চিত্তে সহ্য করতে হয়েছে। আমার এই জীবন-বৃত্তান্ত যাঁরা পড়বেন তাঁরাই অন্ততঃ কিছুটা বুঝতে পারবেন—নৈরাশ্য, ব্যথা বেদনা, দুঃখ-যন্ত্রণা কিরকমে আমাকে সমস্ত জীবন নিষ্ঠুর পীড়ন করেছে। পঁচিশ বৎসর বয়সে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মক্ষেত্রে—জীবনযুদ্ধে নেমেছি। আমার আজ বয়স ৮২ বৎসর পূর্ণ হয়ে ৮৩ বৎসরে পদার্পণ করতে চলেছে। আমার এই দীর্ঘকালের কর্মময় সামাজিক জীবন ও সংসারজীবনের গতিপথে নানা ধরণের তিক্ত উপাদেয় বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভ করেছি—বিপদ-আপদ সঙ্কট দুর্ভোগ, সম্পদ্ সাফল্যের মধ্য দিয়ে। এই সব অভিজ্ঞতার ফলে আমি পেয়েছি অপূর্ব মহামূল্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা। বিত্ত, সাফল্য, প্রতিষ্ঠা যশ লাভ করে যাঁরা জীবনে গৌরবান্বিত ও সুখী হতে চান তাঁরা আমার বিবেচনায় মহা মূর্খ। বিষয় ভোগের দ্বারা তৃপ্তিলাভ আমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটলে আত্মবিড়ম্বনাই হয় মাত্র; কিন্তু একান্ত অলভ্য অসম্ভব—সম্ভবের কোঠায় এসে পড়ে না। মানুষ সংসারে পরিতৃপ্ত ও সুখী হয় সর্ব নিয়ন্তা মঙ্গলময় জগদীশ্বর ভগবানের এরূপ ইচ্ছা নয়। সুতরাং এই রূপ আকাঙ্ক্ষা মানুষের বাতুলতার পরিচয় মাত্র। বদ্ধ জীব মায়া—মোহে বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে যে, যথোচিত উদ্যম প্রচেষ্টার ফলে সে অবিমিশ্র অঢেল সুখ লাভে সক্ষম হবে। কিন্তু এই মনোভাব রোগীর বিকারজনিত প্রলাপের সামিল। যুগে যুগে মহাত্মাসাধু-পুরুষেরা বলে গেছেন,—সংসার অনিত্য, অসার; ঈশ্বর

লাভই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। এই সেদিনও দক্ষিণেশ্বরেয় মহান মাতৃসাধক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অনুরাগীভক্ত মণ্ডলীকে ঈশ্বরলাভে জীবনে ধন্য হবার উপদেশ দিয়েছেন। আমার আন্তরিক স্পৃহা—ঈশ্বর লাভ, ভগবৎ সান্নিধ্য প্রাপ্তি। সংসারে থেকেও ঈশ্বর উপাসনা করা যায়—এই সত্য জেনেই আমার পরমারাধ্যা গুরু শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণী আমাকে সন্ন্যাসী হতে না দিয়ে সংসারে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আমার গর্ভধারিণী জননী ভক্তিমতি ও মহাপ্রাণা ছিলেন। তিনিও আমাকে সেব'ব্রত ও জীবকল্যাণের উদার প্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল নরনাবায়ণের সেবা পরম ধর্ম। নিস্পৃহ নিরাসক্ত গৃহীর আদর্শ অবলম্বন করে আমি সমাজ সংসারে কাজ করে চলেছি। সম্পূর্ণ বিশ্বাসশীল আমি সর্ব কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণের চেষ্টা করি অবিচলিত ভক্তি ভরে।

অর্জুন কর্মবীব ছিলেন। তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় শরণাপন্ন অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন—সর্বভূতে অদ্বেষ্টা এবং লাভে-অলাভে, জয়ে-অজয়ে সমত্ব-বুদ্ধি যুক্ত হয়ে ঈশ্বরে একান্ত নিষ্ঠার সহিত মনঃস্থির রেখে কর্মযোগের সাধনা করে যেতে। আমার স্বভাব কর্মীর স্বভাব। এটা বুঝেই আমাব পরম পূজনীয়া দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না গুরু আমাকে গৃহে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সংসাব জীবনের আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে কর্মযোগের পথে ঈশ্বর উপাসনা করতে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় পাকাল-মাছের মতো সংসারে থাকার নির্দেশ আমি গভীর বিশ্বাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায় নিয়েছি। কল্যাণ ময়ীগুরুর উপদেশ আমি যথাশক্তি পালন করে চলেছি। পরম শ্রদ্ধেয়া গুরুই আমার পরম আশ্রয—একমাত্র ভরসা,—আমার অভয়দাত্রী তারিণী। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "বাবা মঠে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে যে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করবে সংসারে থেকে ধর্মনিষ্ঠ গৃহীর জীবনযাপন করে তার চেয়ে গভীরতর প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান তোমার লাভ হবে।" আমি আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পরিণত মন নিয়ে তাঁর এই কথার নিগূঢ় তাৎপর্য মনেপ্রাণে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। দয়াময়ী গুরু আমাকে ভোগ-সুখের সমস্ত উপকরণই যথেষ্ট পরিমাণেই দিয়েছেন। তবে তা শিশুর হাতের রঙিন খেলার-পুতুল দেওয়ার মতনই। ক্ষণিক আমোদই এতে লাভ হয়। এই সকল ভোগ্য বস্তুর মোহে আমি আত্মহারা বা স্বধর্মচ্যুত হয়ে বিষয় ভোগে লিপ্ত উন্মুখ হয়ে পড়ি—এরূপ অবস্থা তাঁর অসীম কৃপায় কখনও ঘটেনি। সাধারণ লোকের পক্ষে যা, যা, অতি-আদরণীয় ভোগবিলাসের সামগ্রী, সেইসব বস্তু আমি

প্রয়োজনেই ব্যবহার করেছি নিরভিমানে ও নিরাসক্ত চিত্তে। ঐশ্বর্য বা বিলাস দ্রব্যে আমার মধ্যে দম্ভ বা মদ সঞ্জাত হয়নি। আমার বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি সবই হয়েছে, কিন্তু এসমস্ত কিছুতেই এমন কিছু বিস্বাদ রয়েছে যার জন্য আমি পূর্ণ তৃপ্তি বোধ করতে পারিনি। পত্নী পুত্রকন্যা সবকিছুই গর্ব করার মতো পেয়েছি। কিন্তু রূপমুগ্ধ অন্ধকীট সম প্রেমমত্ত হবার সুযোগ জীবনে কখনও আসেনি। এদের সকলকে আমি যেমন করে পেতে চেয়েছি ঠিক সেই রকম করে পেয়েছি বললে মিথ্যা ভাষণই হবে। তাই আমার নির্লিপ্ততা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কবি বলেছেন, "আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।" কৃতজ্ঞচিত্তে আমিও বলি, করুণাময়ীগুরু আমাকে সংসার সুখ থেকে বঞ্চিত করে বাঁচিয়েছেন—পরম সত্যের পথে চলার আবেগ ও উদ্দীপনা দিয়েছেন। আমাকে ভোগবিলাসে মোহিত করে রাখা তার ইচ্ছা নয়,—এই কথা জীবনে বারবার বঞ্চিত আহত হয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। জগৎপতি বিভুর আশীর্বাদ ও করুণা ভিন্ন মানুষের জীবনে আরকিছু স্পৃহনীয় হতে পারে না। সাধক কবি কমলাকান্ত গেয়েছেন—"ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম-ভূমণ্ডলে। ভুল না দক্ষিণাকালী বদ্ধহয়ে মায়াজালে।" জীবনসর্বস্ব ধন জগদীশ্বরের পায়ে অর্পণ করেই মানুষ আত্ম চৈতন্য লাভ করে—জীবন ধন্য হয়। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি প্রিয়জনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সাময়িক ও স্বার্থদুষ্ট আর এই হেতু অসার ও দুঃখজনক। কিন্তু পরম প্রেমময় করুণানিধান শাশ্বত অনন্ত ভগবানের সঙ্গে আমরা আনন্দ ঘন নিত্য সম্পর্কে সংযুক্ত। পরমেশ্বর ও জীবের মধ্যে এই মধুময় সম্পর্ক নিত্য অবিচ্ছেদ্য অব্যয় অক্ষয়। মহীয়সী গুরুর কৃপায় শিখেছি যে, সংসার মৃগ তৃষ্ণিকার মতো ছলনায় পরিপূর্ণ। এখানে সুখ সৌভাগ্য চাইলেই পাওয়া যায় না। এবং মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটু আধটু পেলেও মানুষের অন্তরাত্মার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। কামনা বাসনার জালে জড়িয়ে পড়লে দুঃখ যন্ত্রণার অন্ত থাকে না—মুক্ত আত্মার শাশ্বত পরাশান্তি কখনও লাভ হয় না। সংসারকে ঈশ্বর আরাধনার উপায়রূপে গ্রহণ করতে পারলে সংসারের দুঃখ বেদনাকে আর পীড়াদায়ক বলে মনে হয় না। কিন্তু 'সুখের লাগিয়া' ঘর বাঁধলে, ঘরখানি অচিরে হোক বা বিলম্বে হোক পুড়ে যাবেই যাবে। প্রাজ্ঞব্যক্তি লংসারকে ঈশ্বর উপাসনার সোপান হিসাবে গ্রহণ করেন। সাধক কবি কমলাকান্ত

গেয়েছেন "সুখ দুঃখ সমান হলো, আনন্দ সাগরে উথলে।" সংসার বন্ধন মুক্ত হবার জন্যই ভগবৎ ভক্ত পুরুষেরা ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিগণকে সংসারী গৃহী হতে উপদেশ দিয়েছেন। এবং ঈশ্বরের কৃপায় যশ, খ্যাতি রাজ ঐশ্বর্য লাভ হবে, ভোগবিলাসে জীবন স্বার্থক হবে এরূপ মূঢ়ের দুরাকাঙ্ক্ষা পরিহার করতে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। দুঃখ সুখ মানঅপমানকে সমদৃষ্টিতে দেখে সঙ্গ মুক্ত সাক্ষীর মতো সংসারে থেকে ঈশ্বর উপাসনা করাই তাঁদের উপদেশের সার মর্ম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "কেল্লায় থেকে যুদ্ধ করা নিরাপদ।" তাঁর কথার গূঢ়ার্থ এই যে, সংসারে থেকে অপেক্ষাকৃত অল্প বাধার সম্মুখীন হয়ে ভগবানের পূজা উপাসনা করা যায়। সংসার আমি ত্যাগ করিনি, তবুও আমি অসংসারী ; গৃহে বাস করেও আমি অগৃহী। পরম প্রিয় পরমানন্দ ভগবানের প্রতি প্রকৃত ভক্তিমান হতে পারলে, গৃহেও মঠে তফাত বিশেষ কিছু থাকে না। আসক্তিই মায়ার বন্ধন। ভবরোগ বৈদ্য গুরুর কৃপায় সংসারের আঘাত-সংঘাত, শোক-তাপ, দৈন্য-নৈরাশ্য আমাকে নিরাসক্ত ও ঈশ্বরানুরাগী হতে শিক্ষা দিয়েছে। যাঁরা সাধনার উচ্চস্তরে উঠে পরমাত্মীয়, নিখিলের সার বস্তু আনন্দময় ভগবানের অস্তিত্ব সর্বত্র প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ তাঁদের কাছে গৃহই বা কী আর অরণ্যাশ্রম বা কী ! সমস্তই তো জগৎপতির আনন্দলীলা। ভক্তি ও কর্মসাধনার এই পথই আমার গুরু নির্দিষ্ট ভগবৎ উপাসনার পথ। পরম পূজ্যাগুরুর নির্দেশ পালনে যথাশক্তি কৃত যত্ন হয়েছি, সাধনার পথে অগ্রসর হতে সচেষ্ট হয়েছি – ভগবৎ মহিমা অন্তরে উপলব্ধির স্পৃহা সার্থক করে তুলতে চেয়েছি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে নিবেদন করে পরলোকের পথ চেয়ে বসে আছি।

আমার এই জীবন-কাহিনী সমাপ্ত হয়ে এসেছে। আত্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষায় কিংবা বঙ্গবাসীর কাছে অমর হয়ে থাকবার মিথ্যা মোহে এই আত্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করিনি। আমার বিশ্বাস এতে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক কিছু আছে। তাই মঙ্গলময় ভগবানে সকল ফলাকাঙ্ক্ষা নম্র-বিনয়ে অর্পণ করে লোকশিক্ষার মনোভাব নিয়ে এই জীবনালেখ্য রচনা করেছি। "সত্যমেব জয়তে।"

পরিশিষ্ট

"আমরা এমন শিক্ষা চাই যাহাতে চরিত্র গঠিত হয়, মনের শক্তি বর্দ্ধিত হয় ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রসারলাভ করে। আমাদের এমন শিক্ষার প্রয়োজন যাহাতে মানুষ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়।"

-স্বামী বিবেকানন্দ

ব্রাহ্মণ

হে ব্রাহ্মণ ! করেছিলে সেবাব্রত স্বেচ্ছায় বরণ,
তাহা হতে তবহৃদি কোন মতে হয়নি স্খলন ;
তবে কেন ভয় পাও এ যুগে সেবিতে,
দশের দশায় রাখ নিজেরে পিছুতে ?
বুঝেছি, বুঝেছি আজ অন্নগত প্রাণ—
হয়েছ বঞ্চিত তুমি পেতে দয়া দান !
সত্যই কি তুমি ছিলে এত দীন-হীন
যে, সিঞ্চনে বাঁচিত প্রাণ, অন্যথায় ক্ষীণ ?
না না এ বিধি হায় কেমনে সম্ভবে !
সাত্বিক ব্রাহ্মণ কারো মুখচেয়ে রবে !
সেবাছিল হৃদয়ের নহে পথ রোজগার—
এ কথাটি ভুলে কেন আজ চলো বারবার ?
আনন্দ তোমার ছিল করে প্রেম বিতরণ —
কার্পণ্য ঢুকেছে প্রাণে বল কি কারণ ?
নহে ছিলে দাস কারো ও গো ব্রহ্মদাস !
তোমার ভরষায় যেত ধীরাজের ত্রাস ।
সেই সে ব্রাহ্মণ তুমি, দশা কেন এ আজ ?
কেন,—তা কি জান না ? না, ভেবে পাও লাজ ?
উঠ, জাগো, জাগাও সবারে দিয়া সে অভয় বাণী ;
হয় নাই ভাবান্তর তব হে ভুদেব ! এই মাত্র জানি ।
ছিলে মহান, আছও মহান, থাকিবে মহান জ্ঞানী,
ঘুচাবে দেশের দুঃখ•দৈন্য দশের যতেক গ্লানি ।
তুচ্ছ দুর্বলতা, কিম্বা পেষণের ভয়,
রাজার ঐশ্বর্য লোভ,—সেতও শক্তির অপচয় !
তোমাতে কি সাজে তাহা ? তুমি বীর্য্যবান
ত্যাগের প্রতীক তুমি, অমৃত সন্তান !
উঠ, জাগো, অবহেলে কাল কাটিও না আর,
আর্য্য ঋষির সন্তানের ক্ষমতা অপার ।
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে অন্তর ছেঁকিয়া

হৌক বাহির শব্দ গুরু গম্ভীরিয়া ॥
ভুলিওনা—
আলোড়িত হবে তাতে সারা হিন্দুস্থান
বুঝিবে সকলই হিন্দু অন্নগত প্রাণ,—
স্বাধীনতা বিনা কভু মনুষ্যত্ব থাকে না
স্বার্থ ত্যাগের কার্পণ্যে মানুষও জাগে না।
তাই বহু আশে আজ আমি গো ব্রাহ্মণ
অনুরোধ করি তোমা জাগাও চেতন।
আলোড়ন তুল প্রাণে নিজ সেবা দিয়া,
আসমুদ্র হিমাচল উঠুক বাঁচিয়া,
বুঝুক সে মনে প্রাণে, এ মৃত্যুর কারণ
সজাগ হইয়া চলুক ভবিষ্য জীবন।

ইং ১৯২৪ সাল

হাল্-দুনিয়া

হায় দুনিয়া তোমার বুকে
কত খেলাই চলছে।
কেউ খেলে সাদা-সিধে খেলা
কেউ বা বেঁকে ফিরছে॥
খেলার শেষেব কথাগুলি
যখনই বসে ভাবি।
অবাক হয়ে সঙ্কোচে মন
খায় যেন গো খাবি॥
তোরা হাল্ দুনিয়ার খেলার মাঠে
আয় কতজন যাবি।
হায় দুনিয়া তোমার বুকে
কতই না দাবাদাবি॥
হেথা উরু ভেঙ্গে অচল্ জাণ্ডে—
শয্যা নিয়ে 'দ'-য়্ মজায়।
কোথাও গেলে এমন মজা,
চোখে, পড়বে নাকো হায়॥
চোখের জলে নাকের জলে
হেথায় ভাস্‌ছে কত জন।
হিসাব কিছুই রাখে নাকো
আপন বুকের ধন॥
এই হাল্-দুনিয়ায় আপন-পরের
তবুও বিচাব চলে।
গলাতে ছুবি দেবার কালে
এবা, মুখে আপন বলে॥
আপন সেজে শকুনীতে গো
মড়া পাহারা দেয়।
আমি দেখেশুনে ভেবেচিন্তে
মরি হায়-হায় গো হায়॥

ইং ১৯৪০ সাল

ভট্টপল্লী

তপোবন শুদ্ধজ্ঞান অতীতের গৌরবের স্মৃতি।
নিষ্কলুষ নিষ্ঠাবুকে হেথা মাগো! জেগেছিলে তুমি
ভট্টপল্লী পূতকণ্ঠে আজি কোথা নীতি-ধর্মী সেই সনাতন-গীতি!
অজ্ঞানের অন্ধকারে মগ্ন কেন? ওগো পিতৃভূমি!

ছিল যেথা চতুষ্পাটি দেবালয় গঙ্গার প্রাঙ্গণ,
জপ-রত-ব্রাহ্মণের উত্তরীয় গায় নামাবলী লেখা
চাতুর্বর্ণ্য শিরশোভা আছে হেথা এখনও ব্রাহ্মণ—
পল্লী পথে পথে আজও আদর্শের ক্ষীণালোক মাখা॥

আছে সবই ধ্বংস শেষ স্মিরিথির ব্যথা!
এ যেনরে পথ প্রান্তে ভয়াল শ্মশান!
মানুষ নাহিক হেথা কঙ্কালে কি কবো বলা কথা?
বোধনের মন্ত্রনাই, প্রতিষ্ঠায় কোথা পাব প্রাণ?

সৌম্যমূর্তি সমুদার প্রাণখোলা শুভ্র সুখহাসি
পূর্ণ স্বাস্থ্য ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যের গর্বের কারণ,
সব গেছে! ছেয়ে আছে পীড়া সর্বনাশী.
কলকারখানা গৃহে ধুমোদ্গারী এসেছে মরণ॥

সন্তানে ডাকিতে হবে মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথে।
হীন-বুদ্ধি-অবোধেবে দিতে হবে চৈতন্যোদ্দীপক-বোধোদয়-ভাষা।
সবারে তুলিতে হবে স্বর্ণ চূড় গৌরবের রথে,
অন্তরে জাগিয়ে পুনঃ লুপ্তপ্রায়-সত্বগুণ-জ্ঞান-পিপাসা॥

গ্রামবাসী! ফিরে চাও, মেলে দাও সান্ত্বনার আঁখি।
আমি যাচি জনে জনে পেতে শুধু কর্তব্যের টান।
শক্তির আধারে যারা হত-আশ, মুখ রাখে ঢাকি,
তাদের সবারে দেখি ঊর্ধে যেন হাসে ভগবান্॥

ইং ১৯২৩ সাল

PRABUDDHA BHARAT

(Society for building up the Nation after the ideal of Swami Vivekananda)



Office :

37-C, COLLEGE ROW, CALCUTTA-9

Phone : 34-1822

Office-bearers

General President—

DR. H. C. MOOKERJEE, the Hon'ble Vice-President, Constituent Assembly.

President of the Male Section—

DR. P. N. BANERJEE, Retired President, Indian Association.

President of the Female Section—

SHREEMATI ANURUPA DEVI, Litterateur.

SHREE CHARU CHANDRA DE, Engineer—*Member.*

SHREE BHAGIRATH MOHTA, Merchant—*Member.*

DR. GOURHARI BHATTACHARYYA—*Founder, and General Secretary.*

Humble Submissions on Behalf of

PRABUDDHA BHARAT

1. This question is likely to suggest itself to every mind why, notwithstanding various sects and Societies all over India, I am going to start another organisation. Yet I know it full well that in the minds of the Workers of the type I want such a question shall never crop up. They shall concern themselves only with their duties and shall smilingly sacrifice their lives when necessary to accomplish their avowed object. Their satisfaction shall lie alone in their performance of obligations.

2. As I am one of the ardent Workers I deem it necessary to state at least some facts of my experience in the practical field in order to acquaint these Workers with them. I also request the general public to ponder over these things, and believe that my experience will serve more or less to open everyone's eyes to some hard facts of public life. Moreover feeling it keenly that I must draw sympathy of the public for the servants of the Motherland I cherish this hope that from now on they will meet with less difficulties while going forward to the field of action for national or social cause. I am sure, people will not now, as in the days of slavery, form an ignorant and unfavourable opinion without realising what action brings what result but will co-operate with the Workers and express opinions worthy of a free people for facility of action after gaining some concrete experience of the practical affairs.

3. Everyone is well aware that our holy Motherland where appeared Lord Buddha and Sankaracharyya, Guru Govinda and Swami Vivekananda uniformly retains even to-day her glory as Mother of great self-abnegators and great Workers. Children of India are even to this day equally eager to sacrifice themselves for the sake of others. Such children can never feel a hesitancy in responding to the call for self-sacrifice for universal well-being. Taking advantage of their generous sentiments misguided pretenders with suicidal intent who play

at being great well-wishers of society and lead astray many simple-hearted educated and unlettered persons are doing things positively harmful to moral and religious ideals of India by pandering to the passion of the communalists. Over and above these, by raising hue and cry for preservation of feminine honour and by alluring them in the name of self-protection, education, progress and glossy social liberty of the West these people are bringing the softer sex of our society down to a horrible pit of degradation. In addition to these the theatre and the cinema are attracting our womanfolk in the name of female liberty and exercising a great corrupting influence upon them characteristically of the spirit of the age.

4. Owing to the meek policy of non-violence as pursued by the Indian National Congress which is a reliable political organisation even the unpardonable enemies of the country the destroyers of national peace have gained undue ascendency. With the help of some of our nationals who are inclined to take the meanest advantage of the generous outlook of the Congress as tools in hand the extremely zealous imperialists have brought into being a rampant communalist party. And this communlist party choosing the policy of destruction have not hesitated to give all freedom-loving and national-minded communities a hard hit in a most brutal manner and bring about ruin of their life, honour and wealth. But unfortunately for some reason or other no positive measures have been taken by the Congress. Because of this passivity on its part people are persuaded that old policy of appeasement is still being pursued by it. Hence the growth of discontent in various degree amongst different communities in India. But it is quite regrettable that the Congress High Command has lost all capacity for feeling the need of paying attention to this matter. Consequently bitterness is becoming glaringly manifest everywhere. And these appear to be sure signs of ruin.

5. Besides these, though today we have won our national liberty it will take generations of us to realise its full significance and enjoy it properly. And it is certain that by this time because of frantic efforts of the lovers of sham liberty our national characteristics shall untraceably be effaced and

the remnant of our being shall be lost. Seeing no way out of this juncture we are feeling quite helpless. This reminds me of helplessness of my co-villagers of the time when I lived in my native village. During that period the condition of our village was growing worse in all respects. They had no capacity for improving their position and they were perfectly reconciled to their lot. At that time owing to evil consequences of English education and English regime things turned out very bad for them. So most of my co-villagers including even the children of middle-class Pundit families were compelled in spite of pricks of conscience to forsake their principles and specific characteristics to accept any job for the sake of livelihood. Those who did not stoop to be slaves of others were not in such easy circumstances as to address themselves wholly to the task of properly bringing up their children, one of the most sacred duties of house-holders.

6. I sincerely wanted that our glorious Bhattapalli-society does not undergo eclipse and break down for lack of a little imagination on the part of these parents who suffered privations and were always busy providing themselves with food and clothes. It was also my object to make up for the diminution it sustained in course of time and hold it up in the eye of all as the seat of persons representing oriental ideals, culture and scholarship. Furthermore I wholeheartedly desired to provide for education of everyone of my co-villagers in good manners and habits, observance of continence, public-spiritedness and co-operation. With this end in view I set up in the Bengali year 1327, a Society entitled "Adarsha-Vratri-Samaj or Ideal Fraternity Society". In its germinal stage I had to be confronted with many difficulties. Those youths who joined hands with me were many a time and oft ill-treated and held up to ridicule by their kindred, teachers, and neighbours. But sometime after the Brethren's reception of training in the Institution, their amiable disposition, covetable health, gigantic physical strength, brilliant success in academical examinations and above all unity and fellow-feeling among them attracted tremendously the attention of all who lived in the village.

And gradually there grew among people so much faith in the Institution that many of them were very eager to keep connection with us.

But unfortunately the mentality of the general public was so pitiable then that they wanted to stand aloof from all kinds of organisations set up for constructive activities meant for preservation of national characteristics. For this reason the workers naturally shrank from their chosen ideal and followed the usual hap-hazard method of public service. Hence though our organisation has continued to exist since then the work of building up ideal villagers and workers stopped after a time.

7. From my varied practical experiences in the field of action I have come to realise this truth that it is desirable that activities for public welfare must not only be based on national reconstruction but that greater measure of success here is likely to be achieved by pursuing the line of work as suggested by Swami Vivekananda the great Humanitarian Idealist. My aspiration for service has grown ever since I conceived this idea. And this aspiration has been my constant inspiration to devote my abilities for the service of humanity at large. I wanted to provide proper education for children of free India so that dazzled by the intense light of newly-achieved national freedom or urged by a suicidal impulse they may not jeopardise national freedom or do things prejudicial to the national ideal and characteristics. My object here has been to make them wise and strong and dutiful by training them up to the teachings of the great Swami. The atmosphere then was different from that of now. Yet I shall plead with force that the value of sincerity and honesty, however low it may havee fallen today, has not altogether vanished. Response from the general public can surely be had if we are able to mingle the spirit of renunciation with wisdom and purity of ideal when we come forward to serve During that period the mind in the mass was in such a state that though thev were poor in all respects they were quite heedles of their wretched condition. At present even after an age no perceptible advance

has been made upon that. Moreover being highly Westernised people have lost this sense that activities calculated to shake the national foundation are harmful and blameworthy.

8. Viewing these things sometime ago I established an organisation entitled "Bharat Bhabisyat Sangha" or "Future of India Society" with the object of training up boys and girls as worthy citizens Now that national independence is almost fully achieved it is essential to make minor changes in the programme of the Association to cope with the new situation. This is why that organisation has now been renamed "Prabuddha Bharat". I appeal to all citizens of free India to ponder carefully over the matter with reference to their own condition and to co-operate with me. All will admit with me that the distressed people of the world though torn by strife and cares of life are marching forward with truth in their heart, that real happiness is in self-reliance and dependence brings nothing but misery. They are ever on the march ; they heed no difficulties in their way, nor, it seems sure, would they ever do that. The secular knowledge of the Western Savants, untinged with piousness and the spiritual lore and lessons of the Eastern Savants, absolutely free from worldliness are all one in their ultimate results, and equally undesirable from practical standpoint. That this is so is clear as day light. For this reason liberation from this utterly rotten state of things produced by ill education has to be secured by a joint effort for national reconstruction. Moreover it is expected of us to deal out fair treatment and justice to all children of the Universal Mother, and establish peace, love and co-operation in human society.

9. It is essential that the spiritual knowledge and piousness of the East and secular knowledge and activism of the West be so harmonised as to put an end to destructive instinct and base propensities of mankind. Real good can be done to people at large by drawing their attention to Indian ideals of morality and devoutness. Servants of the public should at the right moment avail themselves of this opportunity. Delay may cause irreparable loss. I am making a special

appeal in the name of Swami Vivekananda to all his admiring country-men to co-operate sincerely with the "Prabuddha Bharat" in the task of national reconstruction. In this connection I also feel that it is necessary to achieve unity and strength by means of co-operation, and enhance our national glory by adapting all that is excellent on earth to our ways of life. Let us grow up to be worthy *santans* full of patriotic feeling by shaking off the mentality caused by agelong slavery and influence of Western education, of regarding all that is our own as worthless Let us be faithful to Indian culture which is immensely capable of elevating the human race, to the well ordered old Indian social system characterised by economic equitability and to the Indian religious opinions which are notable for supreme catholicity.

10. Last of all, let us be fit to accommodate ourselves to the prevailing atmosphere of the world. And in order to hold before the eye of the world the splendid ideal of service let the *santans* drawing inspiration from Swami Vivekananda make a joint effort to materialise his dreams, to accomplish his unfinished task ; let them devote their energy to achieving mental moral, and physical excellence Let us all fervently pray with one voice to the Great Mother of the Universe, "Mother, fulfil the aspirations of our heart, remove our cowardlness, our weakness, and make us brave, impartial, and fit for service of mankind."

22nd December, 1949.
37C, College Row,
Calcutta-9.

SHRI GOURHARI BHATTACHARYYA,
Founder.

OBJECTS AND PURPOSES

OF

PRABUDDHA BHARAT

Objects and purposes of the PRABUDDHA BHARAT are the followings :

1. To bring about a brotherly union among all people specially the children of the ancient Indians and the Indian aborigines, who admire Indian culture and seek to follow the humanitarian ideal of Swami Vivekananda in and through the PRABUDDHA BHARAT for full manifestation of all the superior qualities of their personalities. And with this end in view to arrange properly for their training and education in modern cultural, scientific and technical subjects and in various arts, crafts and industries.

2. To urge every follower of the way of the PRABUDDHA BHARAT to devote himself of the sacred task of building up society and character in accordance with the teachings mentioned below :

(*i*) That freedom is real freedom which in no way blocks the road of love and peace, amity and co-operation and development of personality. Every other form of freedom is nothing but license.

(*ii*) No great thing is accomplished by means of tricks. It can only be achieved with the help of love and truthfulness and great heroic spirit.

3. To accept the following motto as the guiding principle of the PRABUDDHA BHARAT with a view to accommodating the members of the Association without forsaking any of Indian ideal, ideas or characteristics to the current atmosphere of the world by imparting to them proper education and to enable them to be forward in the practical field.

The motto is :

"Let us go onward through life modelling after our own fashion all that is excellent on earth."

4. To adopt proper method of bringing up every member of the Association as a knowledgeable, strong and dutiful *Santan,* so that being dazzled by the intense light of national freedom or blind with self-interest, or man from suicidal motive he may do nothing injurious to the national honour or may shrink from his bounden duty.

5. To keep always in view the following ideal message of Swami Vivekananda so that every one directly or indirectly connected with the Association can grow up to be a worthy *Santan* full of patriotic zeal by forsaking mentality, caused by age-long slavery and the influence of Western education, of regarding all that is our own as worthless, and by being faithful to the Indian civilisation which has immense capacity for elevating the human race, to the well-ordered Indian social system characterised by economic equitability, and to the Indian religion which is noted for its universality.

The lesson is :

"Oh India ! forget not your Sita, Sabitri, Damayanti who are the ideals of your womanhood. Forget not your all-renouncing Sankar, the consort of Uma, whom you worship. Forget not that your marriage, your wealth, your life are not for the gratification of your senses or for your personal pleasure. Forget not that since your very birth you have been offered as an oblation to the Great Mother. Forget not that your society is but a reflection of the Almighty Mother. Forget not the lowborn, the ignorant, the poor, the illiterate, the cobler, the sweeper all are your blood-brothers.

"Oh thou Valiant ! take courage and say with pride', I am an Indian and Indians are my brethren. Indians whether they are poor or illiterate, of high or low caste, are brethren. And clad in thy loin cloth thou sayest with pride, Indians are my brethren, they are dearer to me than my own heart, the deities of India are to me

my God. The Indian society is my cradle, the pleasure garden of my youth and the holy Benares of my old age.' Sayest thou brother, 'The soil of India is my heaven, India's welfare is my welfare' and pray day and night 'Oh thou Lord of the Universe, givest me manhood, takest away my weakness and cowardly fear and makest a man of me'."

6. To bring about the harmony between the Indian spiritualism and piousness and the Western materialism and secularity for affording equal opportunity to all for enjoying full human rights, for paving the way of love, peace, amity, manliness and co-operation and also for saving mankind from destruction by clearing the human mind of all ill-will and malignity. And to restore to India her lost glory and honour by upholding before the eye of the world the splendid ideal of humanism as preached by Swami Vivekananda.

7. To choose a band of ideal workers from among the competent members of the PRABUDDHA BHARAT of all lands, *i.e.*, from the members who are responsible, obedient, single-hearted in devotion, observent of discipline, pains-taking, courageous, self-sacrificing and energetic with a view to devoting their talents for all-round progress of the Indian society and nation by inspiring their confidence in the principles of the Association and by imperssing their minds with the teachings of Swami Vivekananda.

8. To fulfil the foregoing aims and objects the following points shall be borne in mind. Legal and constitutional ways and means shall be adopted if necessary, but at no time anything unconstitutional or contrary to ideal laid down or inimical to the spirit and aims of the Association or beyond or subversive of the motto laid down shall be pursued.

The points are :

(*i*) To designate every individual member of the PRABUDDHA BHARAT (P.B.) as the 'Santan" and all of them collectively as the "Santan-sampradaya".

(*ii*) To consider the vow of reaching the goal with

strenuous efforts by preserving intact the Indian ideal, ideas and characteristics as the vow to be strictly observed by a *Santan*, and to persuade him that he should be perfectly true to the path of righteousness.

(*iii*) To keep this point always in mind that all ancient customs and conventions should be duly honoured only except those which are positively against the principle of the Association.

(*iv*) To use "Bandemataram" and "Oah Guruki Fateh" as the opening slogans and the following vedic hymn as the opening chant. "Om, Sahana-babatu Saha Nau Bhunaktu Saha-biryam Karababahai ; Tejaswi Nabadhitamastu Ma Bidwisabahai."

(*v*) To arrange properly for the diffusion of the ideal and ideas of the P. B. in all parts of Indian and abroad by adopting the following means :—

(*a*) To provide for maintaining connection with other Indian and non-Indian institutions and organisations within and without India. (*b*) To see that the different types of public institutions like Schools, Toles, Pathsalas, Public Libraries, Free Reading Rooms, Debating Clubs, Co-operative Societies, Academies for Technical Education, Maternity Homes, Nursing Homes, Picture Houses, Play Houses, Children's Welfare Societies, Laboratories are brought under different specific central organisations and to make these centres act in consonance with the activities of the P. B. by maintaining proper connection with them. (*c*) To affiliate any Indian or non-Indian organisation situated inside or outside India which is favourable for the spread of the gospel of the P. B. when a written undertaking for cooperation has been obtained from the Head of that Organisation or the majority of the members has taken the vow of the Santan by signing the pledge.

(*vi*) To provide for necessary training and education of

the workers so as to qualify them for leadership, responsible offices and management of the affairs or the P. B. and also to enrol for the same purpose Worker-members similarly trained.

(*vii*) There shall be three chief types of members or *Santan, viz.* (*a*) General Members, (*b*) Special Members and (*c*) Worker-Members ; and (*d*) various other less important types of members. Members shall rank according to their education, experience and efficiency.

(*viii*) Efforts shall be made to achieve the purpose of the Association by enrolling as Members all persons who fulfil the following primary conditions. And persons interested in the activities of the P. B. but not formally attached to the Association as lawful members will be regarded as non-regular Associates (*Asadasya Santans*). These primary conditions are :— (*a*) Those persons shall be eligible for general membership, who are determined not to do anything injurious to the national and the social cause, even if they are unable to do what is positively helpful. (*b*) Those persons shall be eligible for special membership, who are always prepared to do at least indirectly what is essential for national progress and regeneration if it be not possible for them to render direct service owing to adverse circumstances. They must offer their children for enrolment as junior members of the Association. (*c*) Those persons shall be enrolld as Worker-members, who are well-disciplined, self-restrained, obedient, determined to maintain Indian principles of life at all costs and ready to work earnestly for the P. B. at all available opportunities. They must offer their children for enrolment as Junior members of the Association.

(*ix*) To provide for necessary education of the children (both male and female) of three main types of members and put them into different classes according to their age, taste and aptitude.

(*x*) To include all as members of the Association without distinction of sex, beginning from the new-born baby to the man or woman of ripe age and to adopt various appropriate methods of training them as persons capable of rendering brilliant service to the nation.

(*xi*) Having due regard to the essential difference in the nature of the male and the female separate departments shall be established to train and educate them for preserving their honour, self-respect, purity of character and health. But no distinction of sex shall be made in the case of those managing the central affairs and also in case of "Prabin Santans" of the Association.

(*xii*) Necessary provision shall be made for education of the "Shika-navis Santans" of the Association on Indian model in order to build them up as workers who are dutiful, responsible, self-disciplined, valiant, obedient, pure in mind, upright, earnest about organising, efficient, always careful to maintain unity and glad to sacrifice their personal interests for the sake of society and nation.

(*xiii*) As Science, Philosophy, Literature, Economics, Religion, Politics etc., are organically related to each other, it is essential to treat them as such, while imparting education to the *Santans ;* for this will tend to perfection of national life.

(*xiv*) As it is absolutely necessary for the Santans to possess good health, high character, a noble mind and to make good use of time, education shall be imparted to them in such a way as to promote these virtues and make their influence felt in all spheres of life.

(*xv*) *Milan Pithas* and oriental libraries stocked with religious, philosophical and ethical works of eminent authors shall be established for the facility of study and culture of them by the elderly members of the Association.

(*xvi*) Arrangements shall be made to look after all invalid,

oppressed, helpless persons and all forsaken children and to make them in all possible cases self-supporting and useful to the nation by adopting proper methods of training.

(*xvii*) Appropriate methods shall be adopted for education of women in the Indian ideal of womanhood and for training them up for works suited to their taste, health and ability. Definite rules and regulations shall operate with reference to the education and movement of women.

(*xviii*) As marriage of man and woman at the right time is essential for national welfare, parents shall be urged to settle marriage of their children (both male and female) within a year of their lowest marriageable age prescribed by the law. Moreover, necessary training and facilities shall be provided to enable them to observe continence until marrriage.

(*xix*) Certificates or token or both shall be conferred upon all regular *Santan* as in special cases in recognition of their merits for their encouragement and satisfaction to the public at large.

(*xx*) The prefixes "Sanatan" and "Shri" shall, as a rule, be in order of priorily placed before the name of every worker-member when he or she signs his or her name and his or her name is written by another member of the P.B.

(*xxi*) Institutes for moral and physical culture shall be established in various places—for teaching the following prescribed subjects in order to build up young children of India who are ardent about the ideal and activities of the P.B. as citizens worthy of a free nation. Other subjects helpful to the cause of the P.B. may also be included in the curriculum in course of time. But nothing that is contrary to the principles of Association shall ever be allowed to be taught in those Institutes. The subjects to be taught are as follows :—

(1) Faith in God ; (2) Carefulness about improvement of health and moral character ; (3) Preservation of national unity ; (4) Confidence in one's

superiors ; (5) Fear-lessness ; (6) Honesty of purpose ; (7) Sympathetic attitude towards, and training in, cottage industry ; (8) Dutifulness ; (9) Principle of disrespecting no one nor his opinion ; (10) Faith in one's religion ; (11) Self-reliance and self-dependance ; (12) Observance of discipline and obedience to laws ; (13) Justice and fair treatment to all ; (14) Sense of civic duty ; (15) Being true to one-self and keeping one's word ; (16) Worldly wisdom and practical common-sense ; (17) Duty towards one's relations —seniors and juniors ; (18) Education for prizing health, purity of the family and personal good qualities and for demanding no dowry at the time of marriage ; (19) Economic development by joint efforts ; (20) Sympathy and enthusiasm for expansion of industry and commerce ; (21) Preservation of honour and prestige of all, especially of the fair sex ; (22) Patriotism , (23) Observance of strict punctuality and proper utilisation of time ; (24) Preservation of national independence ; (25) Wholehearted allegiance to one's own state ; (26) Maintenance of decorum and decency ; (27) Training for keeping up culture and civilisation ; (28) Promotion of mutual sympathy and sympathy for the poor ; (29) Proper respect for instruction and the instructor ; (30) Service and sacrifice for national and social welfare and the sense of duty towards humanity as a whole ; (31) Carefulness about food, drink and air ; (32) Habit of co-operation ; (33) Love of innocent amusements ; (34) Training in self-restraint and tecitur-nity ; (35) Diligent effort to attain an object ; (36) Maintaining secrecy until a course of action is decided upon ; (37) The maxim that dependence is misery ; (38) The lesson that no wrong should ever be done or be tolerated ; (39) Imparting this enlightenment that the path of righteousness is the safest of all ; (40) Lesson in responsibility ; (41) Inculcation of the sense of unity in the brethren of the order : (42) Scientific outlook on life.

PRABUDDHA BHARAT

37-C, College Row. Calcutta-9

THE PLEDGE AND DECLARATION FORM

(FOR SPECIAL MALE MEMBERS)

In the name of the Supreme Lord, the Universal father, I sign the Pledge and Declaration Form of P. B. as a humble child of the Beloved Bharatmata, the Holy Homeland of Swami Vivekananda, the Great Awakener of Indian National life, and take this oath that I will devote myself heart and soul to all types of activity likely to do good or add to the Glory of Indian Society and Nation. Directly or indirectly I shall not do anything or connect myself with anything that is prejudicial to national interest and honour or will break social discipline in such a way as to obstruct the way of love, peace and co-operation. I will try my utmost to prize fully the ideal and motto of the Association and abide by its rules and regulations.

In this connection I promise to offer all my minor children (both male and female) for membership of P. B. with a view to their education in accordance with its ideal.

Signature.

Name in full..

Father's Name..

Present Address ....

Permanent Address..

PRABUDDHA BHARAT

37-C, College Row, Calcutta-9

THE PLEDGE AND DECLARATION FORM

(For General Members)

In the name of the Supreme Lord, the Universal father, I sign the Pledge and Declaration Form of P. B. as a humble servant of the Beloved Bharat-mata, the Honly Homeland of Swami Vivekananda, Great Awakener of Indian National life, and take oath that I will devote myself wholeheartedly to all types of activity likely to do good to, or add to the glory of Indian Society and Nation. I will do nothing that will be prejudicial to national interest and honour or will break social discipline in such a way as to obstruct the way of love peace, and co-operation. I shall try my best to prize fully the ideal and motto of the Association and to abide by its rules and regulations.

Signature.

Name in full....

Father's Name / *Husband's Name* ....

Present Address..

Permanent Address..

PRABUDDHA BHARAT

37-C, College Row, Calcutta-9

THE PLEDGE AND DECLARATION FORM

(For Special Female Members)

In the name of the Supreme Lord, the Universal father, I sign the Pledge and Declaration Form of of P. B. as a child of the Beloved Bharatmata, the the Holy Homeland of Swami Vivekananda, the Great Awakener of Indian National life and take this oath that I will try in every way to preserve intact the ideal and characteristics of Indian womanhood. I agree that I will do nothing in life that will go against the interest and honour of womanfolk or will break social discipline in such a way as to mar love and peace of home. I take the vow of lifelong service for the welfare of Indian Woman. I will try my level best to prize fully the ideal and motto of the P. B. and abide by its rules and regulations. I also promise to offer all my minor children for membership of the Association with a view to their education in accordance with its ideal.

Signature.

Name in full..

Fathers' Name / *Husband's Name* ....

Present Address..

Permanent Address..

শ্রীযুক্ত

------------------------------ ----------------

মহাশয়,

ইহা জানান সময়োচিত হবে যে,—

ক্ষেত্র বিশেষে সুফল ফলানর উপযুক্ত জমি তৈরিতে উদাসীন থেকে বীজ ছড়ান কোন জ্ঞানী চাষীর কাজ নয়। এভাবে কত দুর্লভ বীজ অদ্যাবধি যে ছড়ান হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। তাতে বিপরীত ফলই ফলেছে। অনভ্যস্ত ফসল গ্রহণে উপকার পাওয়া ত' দূরের কথা, ধাতস্থ না হয়ে তাতে রোগ বৃদ্ধি পেয়ে আমরা সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্থ রোগীতে পরিণত হয়েছি। সেই সুযোগে পরোক্ষে কার্যহন্তা কিন্তু প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী ধরণের বন্ধুরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির সুযোগ না ছেড়ে সর্ব্ব রকমের সুবিধা চিরকাল ভোগ করে চলার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করতে সর্ব্ব শক্তি নিয়োগ করে চাষ আবাদে মনোনিবেশ করেছে। আমরা 'ঘর জ্বালানে পরস্থিতনে'র দল তাদের প্রকৃত সুহৃদ মনে করে তাদের হাতে নিশ্চিন্ত মনে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেরা ত' কষ্ট পাচ্ছিই, অধিকন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদের চিরবিব্রত রাখার সুযোগ করে দিয়ে বাহাদুরী কিনছি। এইভাবে চললে সত্যকার স্বাধীনতার আস্বাদ উপভোগের সাধ্য কোনও পুরুষে হবে কি? তাই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন 'চাষী'দের যুক্তিপূর্ণ মতামত গ্রহণ করে জন্মের সার্থকতা আনয়নের উপযুক্ত সমাজ গঠন একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। এজন্য স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া ইঙ্গিতের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজ গঠন করতে পারলে ভবিষ্যতে যে বংশধর তৈরি হবে তাদের কখনও আলাদা দল করে 'রাজনীতি' বা ঐ ধরণের কোন 'নীতি' অনুসরণ করার প্রয়োজন হবে না। সুতরাং দলের মর্য্যাদা রক্ষায় বর্তমানের মত জনগণের সর্ব্ব রকম ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যাবে। অধিকন্তু ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ মিলবে। এ কারণেই ভারত সন্তান মাত্রকেই উক্ত বিষয়ে **সম্বুদ্ধ ভারত সন্তানে'র** জন্য ক্ষুদ্র জ্ঞান মত রচিত প্রাথমিক পুস্তিকাখানি দেশ মাতৃকার দরদী সন্তানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেছি*। আশা করি মনযোগ সহকারে পুস্তিকাখানি পাঠ করে আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করবেন ও মায়ের মর্যাদা রক্ষার প্রবৃত্তি বর্দ্ধনে সহায় হবেন। ইতি—

নিবেদক—**শ্রীগৌরহরি ভট্টাচার্য্য**

৩৭ সি, কলেজ রো কলিকাতা—৯

* উৎসুক সন্তানেরা স্বয়ং আসিয়া অথবা পুস্তিকা পাঠানর খরচা বাবদ এক আনা ষ্ট্যাম্প সহ উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র পাঠাইলে পুস্তিকাখানি পাইতে পারেন।